প্রতিচিন্তা

~~খালি পাতা ২~~

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

দ্বিতীয় বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

সেপ্টেম্বর-নভেম্বর সংখ্যা ২০১২

সম্পাদক

মতিউর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক

বিনায়ক সেন

উপদেষ্টা পর্ষদ

নুরুল ইসলাম ❑ আনিসুজ্জামান
আজিজুর রহমান খান ❑ সিরাজুল ইসলাম
রওনক জাহান ❑ আকবর আলি খান
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ❑ মাহবুব হোসেন

সম্পাদনা পর্ষদ

নজরুল ইসলাম ❑ হাসান ফেরদৌস ❑ আলী রীয়াজ
আল মাসুদ হাসানুজ্জামান ❑ সাজ্জাদ শরিফ

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

শিল্প নির্দেশক : অশোক কর্মকার

সহকারী সম্পাদক : তৈমুর রেজা

দাম : ৫০ টাকা

ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta
ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
September-November Issue, 2012; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৭

অ র্থ নী তি

আমাদের কালে বৈষম্য
আজিজুর রহমান খান ১৯

রা জ নী তি

বাংলাদেশে গণতন্ত্র : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ
আলী রীয়াজ ৪৭

নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি
নজরুল ইসলাম ৬৯

অ নু স্মৃ তি

দেশভাগের আগে
আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ১০৫

চল্লিশ বছর ধরে : স্মৃতি ও ন্যায়বিচার
ইয়ান মার্টিন ১২৭

ব ই আ লো চ না

পাকিস্তান ও জিন্নাহ : গোড়ায় গলদ
হাসান ফেরদৌস ১৩৮

আবেগ ও বিশ্বরাজনীতি
বদরুল আলম খান ১৫৮

লেখক পরিচিতি ১৭০

~~খালি পাতা ৬~~

সম্পাদকীয়

সমসাময়িক প্রসঙ্গ : কয়েকটি নতুন পাঠ

১. বৈষম্য ও উন্নয়ন

১৮৯০ সালে প্রকাশিত *প্রিন্সিপলস অব ইকোনমিকস* বইয়ে আলফ্রেড মার্শাল বলেছেন, কেন একদল লোক সুসংস্কৃত জীবন যাপন করবে আর অন্য এক দল কায়িক শ্রমে খেটে মরবে, এটা অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন। এ দেশে মার্শালের পরিচিতি নব্য-ধ্রুপদি অর্থশাস্ত্রের অন্যতম স্থপতি হিসেবে, তবে সেখানেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। উদারনৈতিক অবস্থানে থেকেই তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্রে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে, নারীশিক্ষা প্রসারে, বৃহত্তর নারীমুক্তিতে, দারিদ্র্যের অবসানে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপক হ্রাসে, এক মুক্ত সমাজের আদর্শে। যেমন গণিতবিদ ছিলেন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে অর্থশাস্ত্রকে তিনি বৃহত্তর সমাজবিদ্যার অংশ হিসেবেই দেখতেন। রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র ও সামাজিক মনস্তত্ত্বকে অর্থনৈতিক বিচারের পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। নব্য-ধ্রুপদি অর্থশাস্ত্রের 'লিবারেল' মার্শাল আর সমতাপন্থী 'র‍্যাডিক্যাল' মার্শাল—এই দুই চরিত্রের সমন্বয়ে এক নতুন ধারা গড়ে উঠেছিল প্রথাগত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মধ্যেই। চলতি সংখ্যার গোড়ার প্রবন্ধে অর্থনীতিবিদ আজিজুর রহমান খান স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে বৈষম্যবিরোধী চেতনা শুধু উদারনীতিকদের মধ্যে নয়, রক্ষণশীলদের একাংশের মধ্যেও উনিশ শতকে জাগ্রত ছিল। তিনি উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রীদের একজন বেঞ্জামিন ডিজরেলির উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। সেখানে ডিজরেলি বলেছেন, ধনী ও দরিদ্র এরা যেন দুই সামাজিক গ্রহের অধিবাসী, যাদের মধ্যে নেই কোনো যোগাযোগ, কোনো সহমর্মিতাবোধ বা পরস্পরের প্রতি কোনো সহায়-সমর্থন। দরিদ্রদের জগৎ সম্পর্কে এক বিশাল অজ্ঞতা নিয়েই ধনীরা তাদের জীবন অতিবাহিত করে। এ কথা আজকের যুগের সারকোজি-মিট রমনিদের মতো রক্ষণশীলদের কাছে আমরা আশাই করতে পারি না।

অর্থনীতিবিদ আজিজুর রহমান খানের বিভিন্নবিধ গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র সমাজের ভেতরের আয়-বৈষম্য। কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি আয়-বৈষম্যের আলোচনা করতে গিয়ে

আরও কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, যা বৃহত্তর পাঠক-সমাজের মনোযোগ দাবি করে। আমরা এখানে তেমন দু-তিনটি দিকের ওপর জোর দিতে চাই, যা তাঁর দেখা থেকে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বেরিয়ে এসেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। 'আমাদের কাল' বলতে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আয়-বৈষম্যের গতিপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তিনি তথ্য দিয়েছেন যে গত শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিশ্বজোড়াই ছিল বেশ নিচুতে, সে সময়ে আয়-বৈষম্য বেড়ে থাকলেও সেটা ঘটেছে শ্লথগতিতে। এই অবস্থাটা আশির দশকের গোড়া থেকে পরবর্তী দুই দশকে (অন্তত ২০০৫ সাল অবধি) নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। প্রায় সর্বত্রই আয়-বৈষম্য দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। লেখকের একটা প্রধান অবস্থান হচ্ছে, আয়-বৈষম্যের এতটা বৃদ্ধি অনিবার্য ছিল না, অভিপ্রেত তো নয়ই। যে হারে গত তিন দশকে চীনে, ভারতে বা এর আগে আশি-নব্বইয়ের দশকের লাতিন আমেরিকায় আয়-বৈষম্য বেড়েছিল বা বাংলাদেশেও যেভাবে বাড়ছে এখন, তার অনেকটাই ঠিকঠাক উদ্যোগ নিলে এড়ানো সম্ভব ছিল। বিকাশের মূল ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই এটা পারা যেত। তা ছাড়া এটা শুধু পারা না-পারার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক শান্তি, স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, টেকসই গণতন্ত্র এ রকম বড় বড় বিষয়ও।

বৈষম্যকে প্রতিহত করার দৃষ্টান্তমূলক অভিজ্ঞতা হিসেবে লেখক দৃষ্টি দিয়েছেন মূলত সামাজিক-গণতান্ত্রিক (সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক) ধারায় এগোনো দেশগুলোর প্রতি। এর মধ্যে থাকছে উন্নত বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যার সর্বাগ্রে রয়েছে নরডিক দেশগুলো, যেমন: নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন একটি অতিসাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাও। লাতিন মহাদেশের একটি বড় অংশ—ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া—প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছে আয়-বৈষম্যকে রাশ ধরে টানার প্রশ্নে; কোনো কোনো দেশে (যেমন ব্রাজিলে) আয়-বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে যুক্তিযুক্ত রাজস্ব ও আর্থিক নীতি এবং গরিবমুখীন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে। ইউরোপে কোন প্রেক্ষাপটে, কোন সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমতাবাদী সামাজিক-গণতান্ত্রিক ধারা গড়ে উঠতে পেরেছিল তা একটি পৃথক আলোচনার বিষয়। তবে সমতাবাদী এই ঝোঁক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি একসময় এক অর্থে গোটা পশ্চিম ইউরোপই। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হলো, খোলাবাজারসর্বস্ব অর্থনৈতিক মতাদর্শের মধ্য থেকে কীভাবে সামাজিক-গণতান্ত্রিকতার এই ধারা এখনো বহমান রয়েছে, ইউরোপের সেই প্রাণশক্তির দিকটি বোঝার চেষ্টা করা। এর থেকে আমরাও কোনো শিক্ষা নিতে পারি কি না? লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ ২০০০-এর দশকে সচেতনভাবে মোড় নিয়েছে সমতাবাদী সমাজের দিকে। সেখানে শুধু মানবাধিকারের চেতনাসমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা-ই নয়, আয়-বৈষম্যও কমে এসেছে বা বৈষম্য বাড়ার গতিকে রুখে দেওয়া হয়েছে। এর থেকেও কি আমরা কোনো শিক্ষা নিতে পারি? এসব দেশে আয়-বৈষম্যকে উন্নয়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনাকে উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে,

যা এক ভিন্ন সামাজিক পূর্বপ্রস্তুতি নির্দেশ করে। আমাদের দেশেও কি সে রকম কোনো প্রস্তুতি গড়ে উঠতে পারে—যেমনটা হয়েছে নীরবে ব্রাজিলে, চিলিতে বা আর্জেন্টিনায়? আর কতকাল আমরা বিকাশের প্রশ্নটিকে কেবল রাজনৈতিক অকার্যকরতার আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে কেবল কিছু কিছু ছাড়া ছাড়া 'সামাজিক নিরাপত্তা জাল' ফেলার অধীন করে রাখব? খান হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছেন, আমাদের দেশেও বৈষম্যকে সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য দরকার একটি আধুনিক সামাজিক-গণতান্ত্রিক চরিত্রের সরকারব্যবস্থা, যা ধারাবাহিকভাবে বৈষম্যবিরোধী পদক্ষেপ নিতে ভোটারদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

প্রথাগত সমাজতন্ত্রের আলোচনাও প্রসঙ্গক্রমে এই লেখায় উঠে এসেছে। একদা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় আমলাতন্ত্রের ওপর ভর করে যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তাতে অদক্ষতা কালক্রমে দেখা দিচ্ছিল। এটি সুবিদিত বিষয়। কিন্তু লেখক এখানে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য হাজির করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ষাট-সত্তরের দশকে এসব 'সমাজতান্ত্রিক' দেশে আয়-বৈষম্য মোটের ওপর সামাজিক-গণতান্ত্রিক ধারায় বিকাশমান নরডিক দেশগুলোর চেয়ে কম তো ছিলই না, বরং সামান্য বেশিই ছিল। অর্থাৎ দক্ষতা কম ছিল সেটাই নয়, সমতাবাদী সূচকেও এসব 'সমাজতান্ত্রিক' দেশে বেশ খানিকটা ঘাটতি দেখা গিয়েছিল।

প্রথাগত সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ভেতর 'গোড়ায় গলদ' কোথায় ছিল সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে এর পরে। অমর্ত্য সেনের মতো তিনিও মনে করেছেন যে গণতন্ত্র ও বাজার-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এসব দেশের বিকাশে একপর্যায়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও লেনিনকে দুষেছেন তিনি। আন্তোনিও গ্রামশি তো বলেই ছিলেন, ১৯১৭ সালের নভেম্বরের বিপ্লব ছিল 'রেভল্যুশন অ্যাগেইনস্ট ক্যাপিটাল'। তবে সেদিন যদি রাশিয়া বা ইউরোপ প্লেখানভ-কাউটস্কির লাইনে অগ্রসর হতো, বাম-প্রগতিশীল ধারা বিশ্বজুড়ে আরও মজবুত অবস্থানে যেতে পারত কি না সে প্রশ্নও আজ উঠতে পারে। বিষয়টা শুধু প্রথাগত সমাজতন্ত্রের দেশগুলোয় বহুদলীয় গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির সমস্যাই নয়, অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাজার-ব্যবস্থার কার্যত অবসানও একটি আদি ত্রুটি—এটা লেখক গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তবে নিউ ইকোনমিক পলিসি গ্রহণ করে লেনিন যে এই ত্রুটিটা বেশ কিছু পরিমাণে, হয়তো মৌলিকভাবেই, শুধরে নিতে চেয়েছিলেন, লেখক সে প্রসঙ্গটা কিছুটা এড়িয়েই গেছেন। সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাত্রার এক দীর্ঘ উত্তরণশীল পর্ব, যেখানে মালিকানা-সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রথাবিরোধী নানা সমাবেশ ঘটতে পারে—এ রকম ইঙ্গিত লেনিনের লেখায় পাওয়া যায়। তার পরও প্রণিধানযোগ্য লেখকের এই মন্তব্য যে মূলধারার বামপন্থীরা অতীতের ভুল-ত্রুটি থেকে প্রায় কিছুই শিখতে চাননি, এখনো চান না, এবং তাঁরা এখনো পুরোনো তত্ত্বের আরও নিখুঁত প্রয়োগের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের আদি রূপকল্পের সংকট থেকে মুক্তি খুঁজে চলেছেন। সমাজতান্ত্রিক সমতাবোধকে স্থায়িত্বশীল রূপ দেওয়ার জন্য বাজার-ব্যবস্থার প্রায়োগিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে জোরেশোরে স্বীকৃতি দিতে এখনো তাঁরা দ্বিধান্বিত।

সবশেষে লেখক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন আধুনিক পুঁজিবাদের কতগুলো পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের প্রতি। আন্তেনিও নেগরি ও মাইকেল হার্ডট্-এর *এমপায়ার* বইয়ের মতোই খানও মনে করেন যে উন্নত বিশ্বে উৎপাদনের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে; বেড়ে যাচ্ছে শ্রমশক্তিতে সেবা খাতের ক্রমবর্ধমান নিয়োজন; ক্রমেই কায়িক শ্রমের জায়গা নিচ্ছে মানসিক শ্রম; পুরোনো শিল্প-প্রলেতারিয়েতের ওপর আর এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবের চালিকাশক্তি হিসেবে নির্ভর করা যাচ্ছে না। লেখকের একটি প্রধান পর্যবেক্ষণ হলো, আশির দশক থেকে ক্রমবর্ধিষ্ণু আয়-বৈষম্যের ধারা যে অব্যাহত থাকতে পেরেছিল তার কারণ ছিল—এই পর্বে সমাজে বৈষম্য-সহিষ্ণুতাও আগের চেয়ে আরও বেড়ে গিয়েছিল—অন্তত ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি পর্যন্ত অবস্থাটা ছিল এমনই। এর পেছনে উৎপাদন খাতের একটু আগেই উল্লেখ করা 'কাঠামোগত পরিবর্তন' যেমন কাজ করেছে, তেমনি প্রথাগত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও পরে এর কার্যত বিলুপ্তিও বৈষম্য-সহিষ্ণুতাকে প্রভাবিত করে থাকবে। অর্থনৈতিক মতাদর্শের একটি নতুন স্লোগানও উন্নয়নশীল দেশের নীতিপ্রণেতাদের মধ্যে বৈষম্য প্রশ্নে বিভক্তি সৃষ্টি করে থাকবে। এ সময়ের প্রাধান্যশীল উন্নয়ন-আদর্শের একটি স্তম্ভ ছিল আয় প্রবৃদ্ধির তুলনায় আয়-বৈষম্যের প্রশ্নটিকে খাটো করে দেখা। যেমন বলা হচ্ছিল (এটা এ দেশের নীতিনির্ধারক মহলে এখনো চালু) : দারিদ্র্য যদি কমতে থাকে, তবে আয়-বৈষম্য বাড়লেও দুশ্চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। তবে এই অবস্থাটার সম্প্রতি পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে করেন লেখক। আরব-বসন্ত, চীনে বৈষম্য নিয়ে বাড়তে থাকা জন-অসন্তোষ, ভারতের আঞ্চলিক বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা, উন্নত বিশ্বে সর্বোচ্চ ১ শতাংশের হাতে জাতীয় সম্পদের উত্তরোত্তর ঘনীভবনের সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট' আন্দোলন—এসব ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জন্ম নিলেও সব মিলিয়ে তা বৈষম্য সম্পর্কে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মনে সংবেদনশীলতাকে আবার নতুন করে উসকে দিয়েছে। আশা করা যায়, আজিজুর রহমান খানের এই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি বৈষম্য বিষয়ে এ দেশেও নতুন করে মতবিনিময়কে উৎসাহিত করবে।

২. অসম্পূর্ণ গণতন্ত্র

প্রগতির রথের ঘোড়া কেবল সামনের দিকে চলে না, পেছনেও গড়ায়, গড়াতে পারে—এই বোধে রচিত হয়েছে আলী রীয়াজের লেখাটি। যাঁরা ভাবেন যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দেশ যেমন নিম্ন-আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরের দিকে এগোয়, আমাদের দেশের 'অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রও' তেমনই একসময় 'সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের' চেহারা নেবে—এ রকম মিছে আশাবাদে আস্থা নেই লেখকের। তাঁর যুক্তি, এমনও হতে পারে আমরা যাকে গণতন্ত্র বলছি তা আসলে ছদ্ম গণতন্ত্র বা ছদ্মবেশী অন্য কোনো তন্ত্র বা বড়জোর গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ, যার থেকে স্বাভাবিক উত্তরণ সম্ভব নয়। যাঁদের চোখে গণতন্ত্র মানে নির্বাচনী কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন, মন্ত্রীদের শপথ নেওয়া, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রাথমিক উপস্থিতি ও ক্রমান্বয়ে অনুপস্থিতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল, অর্থাৎ যাঁরা নির্বাচন-কেন্দ্রিকতার মধ্যেই গণতন্ত্রের ধারণাকে সীমিত করে রাখতে চান, আলী রীয়াজ সেই অভ্যস্ত পথে হাঁটেননি। নির্বাচনকেন্দ্রিক সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি গণতন্ত্রকে বড় মাপে ধরতে চেয়েছেন। এ দেশে গণতন্ত্রের মাত্রা, প্রকৃতি বা স্তর নির্ণয় করার দিকে অগ্রসর হওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য।

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার বদলের যে প্রক্রিয়া এ দেশে শুরু হয়েছে, সে পথ গোড়া থেকেই মসৃণ ছিল না। বাংলাদেশের এই গণতন্ত্র আদৌ 'গণতন্ত্র' কি না বা হয়ে থাকলে তা কোন ধরনের সংজ্ঞায় পড়ে, সেটি শুধু তত্ত্বগত কচকচির বিষয় নয়। রীয়াজ যুক্তি দিয়েছেন যে এ দেশের গণতন্ত্রের মধ্যে যেসব অগণতান্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান, তা আসলে 'একটি বিশেষ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ (ডিফেক্টিভ) গণতন্ত্রের লক্ষণ'। বিকাশের নির্দিষ্ট স্তর হিসেবে 'বিকৃত ধরনের পুঁজিবাদ' নিয়ে আমাদের দেশে সত্তর-আশির দশকে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছিল। তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখে বলা যেতে পারে যে নব্বই-পরবর্তী শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বটে, তবে তা বিষম ত্রুটিপূর্ণ। 'ত্রুটি' অবশ্য উন্নত বিশ্বের গণতন্ত্রেও পাওয়া যাবে এবং এ যুক্তিও জানা যে 'পরিপূর্ণ গণতন্ত্র' কোথাও নেই। যে গণতন্ত্র আদর্শস্থানীয়, যে গণতন্ত্র 'এখনো আসতে বাকি' (জাঁক দেরিদা ডেমোক্রেসি-টু-কাম বলতে যে ব্যবস্থাকে অনুক্ত আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন) সে অনেক দূরের স্বপ্ন, সাম্যবাদের মতোই প্রায়। রীয়াজ সেদিকে না গিয়ে শুধু বলছেন, প্রথাগত গণতন্ত্রের মধ্যেও আমাদের গণতন্ত্র বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবের, যেন অনেকটা জন্মগতভাবেই তা উত্থানরহিত, ভারসাম্যবিহীন, বিকলাঙ্গ। বিকৃত পুঁজিবাদের মতোই এটি নিজেকে কেবল ত্রুটিপূর্ণভাবেই পুনরুৎপাদিত করতে পারে বা সেই লক্ষ্যে ক্রমাগত পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে চলেছে। অর্থাৎ ধীরলয়ে কোনো একটি বা দুটি নীতির বা সংবিধানের এই ধারায় বা ওই ধারায় 'সংস্কার' করে এই ত্রুটি সহসা শুধরে নেওয়ার নয়। রীয়াজ এও বলছেন যে এই বিকৃত গণতন্ত্রের প্রশ্ন শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়। গত এক দশকে নানা দেশেই গণতন্ত্রের 'তৃতীয় ঢেউ' বলে যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, যাকে নিয়ে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল একুশ শতকের সূচনা পর্বে, তা আজ ক্রমিক হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এর কারণ, প্রত্যাশা ও অর্জনের মধ্যে বিপুল ফারাক তৈরি হয়েছে। এর ফলে, এসব দেশে এখন দেখা যাচ্ছে 'গণতন্ত্রের পিছু হটা'-র নতুন প্রবণতা।

ভূতের পা যেমন পেছনে, এই ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের পরিণতি হচ্ছে পেছন পানে চলা। আমাদের দেশেও এই পশ্চাদ্‌যাত্রার সবিশেষ লক্ষণ দেখা দিয়েছে, যা কোনো আদর্শস্থানীয় গণতন্ত্রের দিকে ক্রম-অগ্রযাত্রাকে নির্দেশ করে না। বরং ইঙ্গিত দেয় 'এক সংকর শাসনব্যবস্থার' (হাইব্রিড রেজিম) ক্রমেই গেড়ে বসার আশঙ্কার প্রতি। এই সংকর শাসনব্যবস্থার নাম নানাজন নানাভাবে দিয়েছেন—কোথাও আধা গণতন্ত্র, কোথাও ছদ্ম গণতন্ত্র, কোথাও অনুদার গণতন্ত্র, কোথাও নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ, কোথাও আধা বা প্রায় কর্তৃত্ববাদ, কোথাও অসহিষ্ণু গণতন্ত্র। এটি 'সংকর' ব্যবস্থাই, কেননা আপাতদৃষ্টিতে নিয়মিত বিরতিতে নির্বাচন হলেও এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হাতবদল হলেও নাগরিকেরা এখানে আদর্শ গণতন্ত্রের বেশির ভাগ নাগরিক অধিকার থেকেই

বঞ্চিত। গণতান্ত্রিক দেশে বাস করলেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত 'প্রজাই' থেকে যান। যেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে থাকে উচ্চবর্গের মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর হাতে। এবং যেখানে অবাধে চলে 'তস্করের শাসন' (ক্লেপটোক্রেসির রীয়াজকৃত ভাষান্তর)। এ রকম পরিস্থিতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন রিপাবলিক ভাষান্তরে হয় 'প্রজাতন্ত্র', যেখানে নাগরিকেরা পর্যবসিত হয় এক আধুনিক রায়ত শ্রেণীতে, আর ক্ষমতার অনুশীলন করে এক আধুনিক জমিদার শ্রেণী।

১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের পর অপসারিত সামরিক স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে ক্রমেই এক ছদ্ম-গণতন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে। কীভাবে এই ছদ্ম গণতন্ত্র গড়ে উঠল কয়েকটি সূচক (ইনডেক্স) ব্যবহার করে লেখক তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। সূচকের পরিমাপ বা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তর্ক তোলার অবকাশ আছে, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য ছিল রীতিসর্বস্ব (নির্বাচনকেন্দ্রিক সংজ্ঞায় আবদ্ধ) গণতন্ত্রের ও প্রকৃত গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদরেখা টানা এবং সময়ের সঙ্গে এই ব্যবধান কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি ফেরানো। তাঁর কাজ থেকে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের মাত্রা পরিমাপের বেশির ভাগ সূচকেই বাংলাদেশের অবস্থান হয় এখনো অনেক নিচুতে (যেমন দুর্নীতি ও জবাবদিহির সূচকে) অথবা লক্ষণীয়ভাবে পিছু হটছে (যেমন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসংক্রান্ত সূচকে)। এই সংখ্যাগত বিচার দেশের গণতন্ত্রের মান সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাকে আরও প্রামাণ্যতা দিয়েছে। তবে এসব সূচকে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে তুলনীয় অন্য দেশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এমনকি ভিন্ন আয়ের হলেও পার্শ্ববর্তী বিবেচনায় দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশের তুলনায়—আমাদের গণতন্ত্রের মান কেমন, সে সম্পর্কে পাঠক স্বাভাবিকভাবেই ধারণা লাভ করতে চাইবেন, যেটি আপাতত পাওয়া গেল না।

তবে এখানে একটি বাড়তি প্রসঙ্গও না উঠে পারে না। এতটা ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রে থেকেও কী করে আমাদের দেশে প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব উন্নয়নের অপেক্ষাকৃত সরল সূচকগুলোয় গত দুই দশকে এতটা উন্নতি সাধন সম্ভব হলো? লেখক এ প্রসঙ্গে তাঁর লেখায় যাননি, সেটি হয়তো তাঁর আলোচ্য বিষয়ও ছিল না। *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় বাংলাদেশ বড় আকারে শিরোনাম হয়েছে আবারও, তবে এবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে।

'অকার্যকর রাজনীতির ভেতরে উন্নয়ন' *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার এই শিরোনাম এ রকম সম্ভাবনা মনে করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্রের মানের বিচারে ত্রুটিপূর্ণ হয়েও এবং চরিত্রের দিক থেকে 'সংকর' শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকেই বাংলাদেশ আশাতীতভাবে উন্নতি করেছে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সূচকে। শত ত্রুটির মধ্যেও তাহলে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রয়ে গেছে এ রকম গণতন্ত্রেও। নাকি গণতন্ত্রের সঙ্গে এসব উন্নয়ন-অর্জনের আসলে কোনো সম্পর্কই নেই—এসব সূচকে উন্নতি এমনিতেই ঘটত তা দেশে যে প্রকারের শাসনব্যবস্থাই থাকুক না কেন? বিশ্বায়নের চাপে দেশের উৎপাদনকাঠামো ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমপরিবর্তনশীল চরিত্রের কারণেই, অসম্পূর্ণ গণতন্ত্র সত্ত্বেও, এসব অর্থনৈতিক-সামাজিক সূচকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি ঘটে থাকবে। এ নিয়ে সংগত কারণেই আরও বাড়তি যুক্তি-তর্ক-মীমাংসা বাকি রয়ে গেল। *প্রতিচিন্তার* পরবর্তী কোনো সংখ্যায় প্রায় অকার্যকর গণতন্ত্রের মধ্যে উন্নয়নের ধাঁধা নিয়ে আমরা আরও লেখা ছাপাব আশা করছি।

৩. নদী ও রাষ্ট্র

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, কূটনীতির খাতিরে বলা হয় যদিও, কখনো স্বভাবত বন্ধুত্বপূর্ণ বা শত্রুতাপূর্ণ হয় না। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক চালিত হয় দেশের স্বার্থের দ্বারা এবং স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে নিষ্পন্ন হতে হয় দর-কষাকষি বা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। 'হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব'—এই শিশুতোষ বুঝ দিয়ে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় সম্পর্ক চালনা করা যায় না। যেমন ভারত-বাংলাদেশ এই দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-চিন্তায় 'ট্রানজিট' একটি বিরাট আলোচনার বিষয়। ভারত অনেক কাল ধরেই তার উত্তর-পূর্ব রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট চাইছে। অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের জরুরি স্বার্থ জড়িত এমন অনেক বিষয়ে আলোচনা ঝুলে আছে, তর্কের সুরাহা হয়নি, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সীমান্তরেখা নির্ধারণ, ছিটমহল বিনিময়, পানি বিনিময়, সীমান্তে কাঁটাতার, ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলের কার্যত অনুপস্থিতি, এমনকি ভিসার আবেদন-প্রক্রিয়া ও মাল্টিপল ভিসা সহজতর করার বিবিধ প্রসঙ্গ। ট্রানজিট দিয়ে দিলে বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজিক দর-কষাকষির সুযোগ আরও কমে যাবে—এ রকম একটি ধারণা ব্যাপকভাবে চালু আছে এ দেশের সাধারণ্যে। নজরুল ইসলাম যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই ট্রানজিটও ভারতকে দেওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে নদীর পানি বণ্টন-বিষয়ক সমুদয় জটিলতা আগে মীমাংসা করতে হবে। যেমন তিস্তা ছাড়াও আরও পঞ্চাশের অধিক নদীর পানি নিয়ে এখনো আলোচনা তোলাই বাকি। লেখকের ভাষায়, ট্রানজিট দেওয়ার মূল সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক। বাংলাদেশের জন্য এ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি কেবল তখনই দেওয়া সংগত, যখন এর বিনিময়ে সে স্ট্র্যাটেজিক সুফল অর্জন করবে। একইভাবে ফারাক্কা, গজালডোবা প্রভৃতি বাঁধ অপসারণ করে নদ-নদীগুলো উন্মুক্ত করা ভারতের জন্যও একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও ভারতকে বিনিময়ে একটা স্ট্র্যাটেজিক সুফল পেতে হবে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিটের সুযোগ ভারতের জন্য তেমনই একটি স্ট্রাটেজিক সুফল। তবে প্রবন্ধটি নিছক নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট আলোচনার মধ্যে সীমিত থাকেনি। নদীমাতৃক বাংলাদেশে যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'নদী' একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদ-নদীর ভাগাভাগির প্রশ্নটি আরও তীব্রতা পেয়েছে ভারতে 'নদী সংযোগ প্রকল্প' নিয়ে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। এই নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের উদ্দেশ্য হলো ব্রহ্মপুত্র নদ, গঙ্গা নদী ও তাদের বিভিন্ন উপনদীর পানি মোট ৩০টি সংযোগ খালের মাধ্যমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত অভিমুখে প্রবাহিত করা। এমনিতেই ফারাক্কার কারণে গঙ্গার প্রবাহ হ্রাসের নেতিবাচক অভিঘাত এখনো এ দেশ সামলে উঠতে পারেনি। এর ফলে এখন

বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রায় ৭০ শতাংশের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ। এই নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে যদি এবার ভারত ব্রহ্মপুত্র নদের পানিও অপসারিত করে, তাহলে লেখকের ভাষায়, 'বাংলাদেশের বাকি অধিকাংশ নদ-নদী শুকিয়ে যাবে এবং এ দেশের অর্থনীতি ও প্রতিবেশ এক গভীর সংকটে নিপতিত হবে।' অথচ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই নদী সংযোগ প্রকল্প শুরু করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৬ সালের মধ্যে প্রকল্পটির পূর্ণ বাস্তবায়নের নির্দেশও আগেভাগে দিয়ে রেখেছেন ভারত সরকারকে। এই প্রকল্পের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লেখক বিভিন্ন আঙ্গিকে ও মাত্রায়। এখানে যে যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে তা নিছক একাডেমিক বিচারের বিষয় নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে এ দেশের ১৬ কোটি মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের প্রশ্ন।

লেখকের যুক্তিতে, যেসব নদ-নদীকে ঘিরে এই নদী সংযোগ প্রকল্প গড়ে উঠবে, সেসব নদী ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; এসব নদ-নদী আন্তর্জাতিক নদী এবং এসব আন্তর্জাতিক নদীর বিষয়ে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত ভারত নিতে পারে না। লেখকের ভাষায়, 'এ সত্ত্বেও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে এ রকম একটি অবিবেচনাপ্রসূত ও অপরিণামদর্শী আদেশ দিতে পারলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।' কিন্তু এই অনিবার্য সমালোচনার পাশাপাশি লেখক আরও মৌলিক প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রতিবেশী দেশের মানুষের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে অনায়াসে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, তার পেছনে কাজ করেছে একটি তলবর্তী কারণও। সেটি হচ্ছে নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি'। 'নদ-নদীর পানি সমুদ্রে চলে যেতে দেওয়া অপচয়; বরং সবটা পানিই বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শুষে নিতে হবে'—এই হচ্ছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পশ্চিমে শিল্পবিপ্লবকে ব্যবহার করা হয়েছিল নির্বিচারে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারে। আর এখন বিকাশমান চীন ও ভারতের প্রবৃদ্ধির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে প্রকৃতিকে 'শুষে নেওয়ার' কাজ চলছে। এভাবে তাৎক্ষণিকের তাগিদ মেটাতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'প্রকৃতির বিত্তহরণের' কাজটি করা হচ্ছে বাণিজ্যিক স্বার্থে—মুনাফা অর্জনের তাগিদে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে লেখক এই আত্মধ্বংসী কৌশল থেকে সরে এসে নদ-নদীর প্রতি 'প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি' নিতে বলেছেন। এই সঙ্গে স্মরণ করেছেন ফারাক্কা ও গজালডোবা বাঁধের অভিজ্ঞতা। আধুনিকতার নামে যেকোনো প্রকারের উন্নয়নকে, তা পরিবেশ-প্রতিবেশকে আহত করলেও, মেনে নেওয়ার মনোবৃত্তি হচ্ছে একধরনের উটপাখি মানসিকতা, যেন অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকবে। লেখকের এই বোধ 'উত্তর-আধুনিক'। এর আগে বাঁধ দিয়ে বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টারও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন লেখক *ফিউচারস্* পত্রিকার (অক্টোবর ২০০১) একটি স্মর্তব্য লেখায়। তবে সেখানে সমালোচনাটা ছিল আমাদের রাষ্ট্রের 'অপরিণামদর্শী আধুনিকতা' নিয়ে। আর এবার তা প্রসারিত হয়েছে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের আলোচনায় ভারতীয় রাষ্ট্রের 'অপরিণামদর্শী আধুনিকতা' নিয়ে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার চেয়েও আরও ভয়াবহ হতে পারে উপনিবেশ-উত্তর আধুনিকতা—নদ-নদী প্রসঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি আরও একবার সেটা প্রমাণ করল। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য ভারতকে উদ্বুদ্ধ করাতে আমাদের হাতে প্রভাবক খুব বেশি নেই, সে ক্ষেত্রে কৌশলগত হাতিয়ার হতে পারে ট্রানজিট। তবে সেটাই একমাত্র বিবেচনা হতে পারে না ভারতের জন্য। ইতিমধ্যেই জলবায়ু-বিপন্ন দেশের প্রথম কাতারে বাংলাদেশ, তার ওপর নদী সংযোগ প্রকল্পের কারণে নদ-নদী শুকিয়ে গেলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এ দেশ। লেখকের বিচারে, 'প্রায় চার কোটি মানুষ বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়বে'; এতে জন্ম হতে পারে পরিবেশ-শরণার্থীর বাস্তব সমস্যা, যার আছর থেকে ভারতও নিজেকে বিমুক্ত রাখতে পারবে না। সীমান্তের কাঁটাতার যতই দীর্ঘ হোক না কেন, পরিবেশের বিপর্যয়ে উদ্বাস্তু উন্মূল মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে পারে প্রতিবেশী দেশেও। ইতিমধ্যেই যেটা কিছুটা ঘটছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। ছিন্নমূল মানুষ নদীভাঙন ও অন্যান্য পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে ১০০ বছর ধরেই স্থানান্তরিত হচ্ছে সেখানে। আশা করি, যাঁদের উদ্দেশ করে নজরুল ইসলামের এই লেখা, বিশেষত দুই দেশের নীতিপ্রণেতারা, এসব জরুরি প্রসঙ্গ নিয়ে দুদণ্ড ভাববেন। মনে রাখতে হবে, নদ-নদী যেমন রাষ্ট্রের সীমানা মানে না, নদ-নদী বিপন্ন হলে তার অভিঘাতও সীমানা মানবে না।

৪. জিন্নাহ ও পাকিস্তান

এবারের বই আলোচনায় একটি ভিন্নধর্মী বিষয় স্থান পেয়েছে। হাসান ফেরদৌস লিখেছেন জিন্নাহকে নিয়ে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিকাশে তাঁর চিন্তাধারার ও ব্যক্তিত্বের ছাপ কীভাবে কতটা পড়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিচার করেছেন সম্প্রতি বেরোনো তিনটি বইকে কেন্দ্র করে।

'মুসলিম লীগের মধ্যে সবচেয়ে গর্বিত ফারাও' এমন একটি তির্যক শব্দবন্ধে জিন্নাহকে চিহ্নিত করেছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক। তবে সাদত হাসান মান্টোর 'জিন্নাহ সাহিব' স্মৃতিচারণায় এক মানবিক জিন্নাহকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিপত্নীক জিন্নাহ্ মাঝেমধ্যেই পুরোনো ট্রাংক বের করে তাঁর পার্শি স্ত্রীর কাপড়-চোপড়ের দিকে চেয়ে থাকতেন অথবা তাঁর একমাত্র কন্যা যে পার্শি সমাজে বিয়ে করে তাঁকে ছেড়ে গেছেন তাঁর শিশু বয়সের জামাকাপড়গুলো নেড়েচেড়ে দেখতেন। নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন তাঁর তিন বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে। টাকা পাঠাতেন তাঁদের নিয়মিতভাবে, বিশেষত যাঁদের অবস্থা ভালো ছিল না। নিজে খুব স্বল্পাহারী ছিলেন। তবে ভালোবাসতেন চুরুট খেতে চার্চিলের মতো, আর পছন্দ ছিল নানা মডেলের গাড়ি। বাসায় যারা কাজ করত তাদের প্রতি লক্ষ রাখতেন, তাদের খাওয়া-দাওয়া, হাতখরচ সবকিছুর ব্যাপারে ছিলেন উদার। মান্টোর এই স্মৃতিচারণার ভিত্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ড্রাইভার মো. আজাদের সঙ্গে কথোপকথন। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে জিন্নাহর চরিত্রের একটি অনমনীয় দিক, যার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে হাসান ফেরদৌসের আলোচনার মর্মার্থ বোঝার ক্ষেত্রে। ওই সাক্ষাৎকারে মান্টো জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, কখনো কি জিন্নাহকে স্যরি বলতে শুনেছ?' এর উত্তরে আজাদ বলেছিলেন, 'না, আমার মনে হয় না কখনো তার ঠোঁট গলে এই শব্দটা বেরিয়েছে, আমার ধারণা পারলে ডিকশনারি থেকে চিরদিনের জন্য তিনি এই শব্দটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে

দিতেন।' ক্ষীণকায় মানুষ ছিলেন জিন্নাহ এবং সে জন্যই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক ইস্পাতদৃঢ় অনমনীয় চরিত্র—এ রকমই সিদ্ধান্ত টেনেছেন মান্টো।

হাসান ফেরদৌস যুক্তি দেখিয়েছেন যে স্বৈরতন্ত্রের দিকে পাকিস্তানের ক্রমাগত এগোনোর পেছনে গোড়ার গলদই দায়ী। আর এই গলদের শুরুর বিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে জিন্নাহর চরিত্রে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, আচারে-ব্যবহারে, বিশ্বাসে। পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের (এবং জনগণেরও) একটা বড় অংশ বর্তমানের অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য কায়েদে আযমের মতে ও পথে ফিরে যাওয়ার পক্ষে সোচ্চার হন। একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায় সমৃদ্ধ সমাজে প্রত্যাবর্তনের জন্য জিন্নাহ আলোকবর্তিকার মতো কাজ করতে পারেন—এটাই তাঁদের যুক্তি। তবে এর থেকে ভিন্ন মতামতও রয়েছে, যেখানে জিন্নাহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শোনা গেছে। এ রকম বিভিন্ন মতের ওপর আলোচনা উত্থাপন করেছেন লেখক। আইতাজ আহসান, হুসেইন হাক্কানি ও ফারজানা শেখ—এঁরা কেউই র‍্যাডিক্যাল চিন্তাবিদ নন এজাজ আহমেদ ও তারিক আলীর মতো। এক অর্থে এঁরা এলিট বুদ্ধিজীবীদেরই অংশ, তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনজনই পাকিস্তান পিপলস পার্টির বা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বা এখনো আছেন। ফলে জিন্নাহর মূল্যায়ন নিয়ে তাঁদের জরিপের এক ভিন্ন রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

তবে জিন্নাহকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যেই প্রবল ভিন্নমত রয়েছে। আইতাজ আহসান 'সিন্ধুমানব'-এর ধারণা নির্মাণ করে বলতে চেয়েছেন যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতারই উত্তরসূরি পাকিস্তান এবং এর অধিবাসীদের শুধু ইসলামি চেতনায় আবদ্ধ করে দেখা ঠিক হবে না : এরা এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যে উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে ইতিহাসের ধারায় অনেকেই। এর মধ্যে যেমন কাব্যকলার খসরু, ইকবাল ও ফয়েজ আছেন; তেমনি আছেন 'অতুলনীয় প্রগতিশীল ও আলোকিত মানুষ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'। আহসান জিন্নাহর নানা উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ইসলামীকরণ প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহর স্বপ্নে দেখা পাকিস্তানের পরিপন্থী। এখানে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগে যোগদানের 'আগের জিন্নাহ' ও 'পরের জিন্নাহ' এটা কোনো মৌলিক বিভাজন, নাকি সেক্যুলার আদর্শের কন্টিনিউটি—এ বিতর্ক ঘটেছে। আইতাজের উদ্ধৃতিগুলো ছিল ১৯১৫ থেকে ১৯২৫ সালের। এর বিপরীতে তাঁর সমালোচকেরা উদ্ধৃতি দিয়েছেন ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ কালপর্ব থেকে। ১৯৪৫-৪৬ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি, এ কথা প্রমাণের জন্য জিন্নাহর মতো 'সেক্যুলার' রাজনীতিককেও ইসলামি বাগ্মিতায় নামতে হয়েছে। এ কথা হাক্কানী জানিয়েছেন। হতে পারে যে উদারনৈতিকেরা এভাবেই সাময়িক কার্য হাসিলের জন্য রক্ষণশীলদের ক্যাম্পে এমনই ভিড়ে যান যে তাঁদের আর পূর্বতন সত্তায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এর প্রতিফল ভুগতে হয়েছে পাকিস্তানসহ নানা দেশেই।

৫. আবেগের দ্বন্দ্ব?

বই নিয়ে অপর আলোচনাটি লিখেছেন বদরুল আলম খান দমিনিক মোইসির 'জিওপলিটিকস অব ইমোশনস'—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমাজ-মনস্তত্ত্ব নিয়ে নতুন ডিসকোর্সের ওপর। তবে এক হিসাবে দেখলে পুরোপুরি নতুনও নয় এটি। নব্বইয়ের দশকে স্যামুয়েল হান্টিংটন লিখেছিলেন *দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস*—সভ্যতার লড়াই। সেখানে হান্টিংটন বলেছিলেন, বার্লিনের দেয়াল পতনের পরে দুনিয়ায় এখন মূল লড়াইটা হচ্ছে 'সংস্কৃতির' দ্বন্দ্ব। মোইসি এতে যোগ করেছেন 'আবেগের দ্বন্দ্ব'। তাঁর ভাষ্যে, এশিয়ায় রয়েছে 'আশার সংস্কৃতি', পাশ্চাত্যে 'ভয়ের সংস্কৃতি' আর আরব বিশ্বে স্থান নিয়েছে 'অপমানের সংস্কৃতি'। আরব বিশ্ব আটকে গেছে এক ঐতিহাসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে : কোনো সৃষ্টিশীল সমাধান খুঁজতে সে অপারগ হয়ে পড়েছে। ইসলামি সভ্যতার সোনালি অতীতের স্মৃতি রোমন্থন, পাশ্চাত্যের উত্থানের প্রতি ক্রমাগত সন্দেহ, আর বলদর্পী ইসরায়েল নিয়ে দুর্ভাবনার মধ্যে সে অবশ হয়ে পড়েছে। তবে মোইসির বইটি লেখা ২০০৯ সালে, আরব-বসন্তের মধ্য দিয়ে যে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তার বেশ কিছুটা আগে। আরব-বিশ্বে বসন্ত অবশ্য এসেছে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখন আগের চেয়ে বেশি প্রকট, বিশেষত মিসরের নির্বাচনের পর। তা ছাড়া ইরাক ও লিবিয়ার পরে সিরিয়া নিয়ে পাশ্চাত্যের নতুন করে অঙ্ক কষা তো আছেই।

তার পরও মোইসির বিচার আলোচনার দাবিদার, কেননা এর মধ্য দিয়ে দেখা যায়, কীভাবে পাশ্চাত্যের ক্ষমতা-তত্ত্ব দুনিয়াকে নতুন ভাষা-বিশ্লেষণে ধরতে চাইছে। এশিয়ায় প্রথমে জাপান ও পরে চীনের উত্থান এক 'আশার সংস্কৃতির' জন্ম দিয়েছে সেখানে। ভারতের প্রসঙ্গও এনেছেন লেখক। তবে এ তিনটি দেশের মধ্যেই তো এশিয়া সীমিত নয়। গৃহযুদ্ধ-আক্রান্ত শ্রীলঙ্কা, হতাশায় নিমজ্জিত পাকিস্তান বা মধ্য এশিয়ার দেশগুলো লেখকের আলোচনায় আসেনি। বাংলাদেশও নয়। যে তিনটি দেশের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেও সবটা আবার আশা-করোজ্জ্বল নয়। এ সূত্রে তিব্বতের প্রশ্নে চীনের অবস্থান, মিয়ানমারের সামরিক শাসনের সঙ্গে পূর্বাপর সুসম্পর্ক রক্ষা বা ধীরগতিতে হলেও চীনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সংগঠিত প্রতিবাদগুলো বিস্মৃত হওয়ার নয়। জাপান এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত অপরাধগুলোর জন্য চীন বা কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চায়নি। আর ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্চাশাবাদ আছে ঠিকই, কিন্তু সে দেশের বর্তমান এখনো অস্থিতিশীল, জাতপাতে বিদ্ধ। নাইপলের ভাষায় এখনো দেশটি 'এক লক্ষ বিদ্রোহের' ঘটনাস্থল। অন্যদিকে আরব বিশ্বের নিমজ্জমান হতাশার পেছনে রয়েছে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ তেল নিয়ে পাশ্চাত্যের কূটনৈতিক সামরিক তৎপরতা। শুধু ইসরায়েলের অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলের অনেক দেশেই এখনো অগণতান্ত্রিক শাসন টিকে আছে—বিষয়টা এমন নয়। অবাধে বিত্তহরণের তাগিদ থেকেই পাশ্চাত্য নানাভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বশংবদ রাষ্ট্রগুলোতে অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে। আর তাই সিরিয়ার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি-সমাবেশ নিয়ে মিডিয়ায় হেডলাইন হয়, কিন্তু বাহরাইনে চলমান বিরোধীদলীয় বিক্ষোভ গুরুত্ব পায় না সংবাদ পরিবেশনে। অর্থাৎ পুরো বিষয়টা কেবল কোনো বিশেষ সভ্যতার একান্তভাবেই আশাবাদী বা নিরাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমিত থাকার ব্যাপার নয়। গত শতাব্দী ছিল 'ভাবাদর্শের সংঘাতের শতাব্দী' আর এই শতাব্দী হচ্ছে 'আত্মপরিচয়ের সংঘাতের শতাব্দী'—মোইসির এ সংক্ষেপিত সরল ভাষ্যের মধ্যে বর্তমান দুনিয়ার পরিবর্তনশীলতাকে বোঝা সম্ভব নয়। মোইসির লেখায়

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অনুপস্থিতির দুর্বলতার প্রতি সংগত কারণেই তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক।

৬. অন্যান্য রচনা

*প্রতিচিন্তা*র এ সংখ্যায় আরও থাকল সাবেক রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অপ্রকাশিত দীর্ঘ স্মৃতিচারণার একটি অংশ। বিভাগ-পূর্ব বাংলায়—টাঙ্গাইল জেলার পটভূমিতে—এ স্মৃতিচারণার মধ্যে স্থান পেয়েছে সেকালের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও এ রকম কিছু সামাজিক প্রসঙ্গ। আজকের যুগের অসহনশীল গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগ-পূর্ব বাংলার এক মফস্বল শহরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি কতটা উদার ছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের অনুসারী ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক কতটা শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল ছিল, তার একটি পাঠ হিসেবে আমরা স্মৃতিচারণার মুদ্রিত অংশটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি।

১৯৭১-এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, বাংলাদেশের বন্ধু, ইয়ান মার্টিনের একটি ছোট্ট লেখাও স্থান পেয়েছে এ সংখ্যায়। লেখাটির বিষয়বস্তু—বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। এর প্রাসঙ্গিকতা সপ্রতিভাত। এটি চলমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গের একটি অন্য প্রেক্ষিত তৈরি করে দেয়।

৭. অনলাইনে প্রতিচিন্তা

প্রতিচিন্তা এবার দেরি, বড় বেশি দেরি করে বেরোল। ২০১২ সালে *প্রতিচিন্তা* আমরা নিয়মিতভাবে পাঠকদের কাছে দিতে পারিনি। এর জন্য আমরা পাঠকের কাছে ও যাঁদের লেখা এত দেরি করে ছাপা হলো, তাঁদের কাছে একান্তভাবেই ক্ষমাপ্রার্থী। চলতি সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২) থেকে নিয়মিত বিরতিতে যেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তার জন্য নতুন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবার নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, এর সুফল আমরা অচিরেই দেখতে পাব।

*প্রতিচিন্তা*র আগের দুই সংখ্যা যাতে অনলাইনে পাওয়া যায়—এ মর্মে দেশ-বিদেশের অনেক পাঠক আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। এটি সময়েরও দাবি। *প্রতিচিন্তা* শিগগিরই নিয়মিতভাবে পাওয়া যাবে *প্রথম আলো*র অনলাইন সংস্করণের মধ্যে আলাদা বিভাগ হিসেবে www.prothom-alo.com/protichinta ঠিকানায়।

অর্থনীতি

আমাদের কালে বৈষম্য

আজিজুর রহমান খান[১]

> ধনী ও দরিদ্র: পরস্পর-সংযোগ ও সহানুভূতিরহিত দুটি জাতি; দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চল বা উপগ্রহের অধিবাসীর মতো, পরস্পরের অভ্যাস, ভাবনা ও অনুভূতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।
>
> বেঞ্জামিন ডিজরেলি (১৮০৪-১৮৮১)

আমাদের কালে বৈষম্যের গতি-প্রকৃতি ও তার কারণ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈষম্য বহুমাত্রিক। এর একটি বিশেষ মাত্রা—জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য—আমাদের আলোচনার সীমিত বিষয়বস্তু। অবশ্য জীবনযাত্রার মানের সংজ্ঞাও বহুমাত্রিক। অধুনা সমাজবিজ্ঞানীরা জীবনযাত্রার মানের বহুমাত্রিক সূচক এবং তার বৈষম্য পরিমাপের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এই বহুমাত্রিক সূচকগুলো কেবল সাম্প্রতিক বছরগুলোর জন্য এবং স্বল্পসংখ্যক দেশের জন্য পরিমাপ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বৈষম্যের সীমিতসংখ্যক পরিসংখ্যানের ব্যবহার তাই একটি একমাত্রিক সূচকে—আয় বা ভোগ বণ্টনের বৈষম্যের সূচকে—সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কে এই প্রবন্ধে আমাদের কাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার শুরুতে আমার প্রজন্মের মানুষেরা সদ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিল। বিশ্বব্যাপী বৈষম্য আমার আলোচনার লক্ষ্য। আমাদের দেশের বৈষম্য, যা নিয়ে আমি অন্যত্র বেশ কিছু আলোচনা করেছি, আমার মুখ্য আলোচনার বিষয় নয়।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রতিপাদ্য এই যে আমাদের কালে বৈষম্য এবং সমাজের

---

১. মূল্যবান পরামর্শ ও সহায়তার জন্য অধ্যাপক কিথ গ্রিফিন ও আর্থার ম্যাকেওয়ানের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। বিভিন্ন তথ্যের সূত্র স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করে প্রবন্ধের শেষের সংযোজনে প্রধান তথ্যাদির সূত্রগুলো সংক্ষেপে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংযোজনে বৈষম্য পরিমাপের প্রধান সূচকের একটি ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে।

বৈষম্য-সহিষ্ণুতা প্রায় সর্বত্র উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিন্তু আমাদের কালের দুটি ভিন্ন ভাগে বৈষম্যের গতিধারা ভিন্নমুখী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথম তিনটি দশকে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বৈষম্য নিম্নগামী ছিল এবং মানব প্রজাতির যে স্বল্পাংশ বৈষম্যের নিম্নগামিতা থেকে এই সময়ে বঞ্চিত ছিল, সেখানেও বৈষম্য সামান্যই বেড়েছিল। পরবর্তী তিন দশকে—সত্তরের দশকের শেষ বা আশির দশকের গোড়া থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত—মানবসমাজের প্রায় সর্বত্র বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথম তিন দশকে মানবসমাজ অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সর্বত্র বৈষম্য প্রশমনের উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত ছিল। তুলনায় গত তিন দশকে মানবসমাজ সর্বত্র অনেক বেশি বৈষম্য-সহিষ্ণু হয়েছে। এ প্রবন্ধের আরও একটি প্রতিপাদ্য এই যে বৈষম্যের গতিধারা কোনো অনিবার্য প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক বা ঐতিহাসিক নিয়মে নয়, বরং রাজনৈতিক শক্তির সচেতন সিদ্ধান্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে সমাজতন্ত্র, অপুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রমুখ বৈষম্যবিরোধী শক্তির বিলোপ এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উত্থান সত্ত্বেও মানুষের সাম্যান্বেষণের 'অন্তিম ইতিহাস' রচিত হয়নি। বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সমকালীন সমাজগুলোর সামনে অনেক পথ খোলা আছে।

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বৈষম্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরের দশকগুলোয় বৈষম্যের পরিবর্তন

প্রথমে শিল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে তাকানো যাক। এই দেশগুলো সবই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। দুটি ভাগের দেশগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। একটি ভাগে রয়েছে সামাজিক গণতন্ত্র বা কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো; অন্যটিতে 'নিখাদ' বাজার অর্থনীতি অনুসারী দেশগুলো। নিখাদ বলার অর্থ এই নয় যে এই দেশগুলো প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পাঠ্যবই নির্দেশিত সংজ্ঞার অনুসারী, বরং এই যে এই দেশগুলোতে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সপক্ষে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নিতান্তই বিরল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী দশকগুলোতে বিশেষভাবে ইউরোপে সামাজিক গণতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দেশগুলোতে অনুসৃত মুখ্য পন্থাগুলো ছিল: রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত সামাজিক পরিষেবার অর্থায়নের জন্য উচ্চপ্রান্তিক হারে কর প্রবর্তন; রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সর্বস্তরে শিক্ষার অবাধ সুযোগ; রেলপথ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো স্বভাবজ একচেটিয়া উদ্যোগের (Natural Monopoly) ওপর সামাজিক (রাষ্ট্রীয়) নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন; অর্থায়ন সংস্থা ও বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ; এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন। এই বর্গের দেশগুলো নিপুণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি খুবই উচ্চমাত্রার সমতাও অর্জন করেছিল। এদের মধ্যে বণ্টনসাম্যে সর্বাগ্রগণ্য দেশগুলোতে—যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়—বণ্টন পরিমাপের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 'জিনি' সূচক প্রায়ই

ছিল ২৫ বা তার কম।[২]

বাজার অর্থনীতির 'নিখাদ' রূপের সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কালপর্বে যুক্তরাষ্ট্রেও আয় ও মজুরি বণ্টনের বৈষম্যে স্বল্পহারে হলেও অবিরত নিম্নগতি অব্যাহত ছিল। এর কারণ অংশত এই যে সামাজিক গণতন্ত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কল্যাণমূলক ব্যবস্থার কিছু কিছু এই দেশটিও অবলম্বন করেছিল। ত্রিশের দশকে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্তদের ভাতা দেওয়া শুরু হলো; ষাটের দশকে বিধিবদ্ধ মেডিকেয়ার এবং মেডিকেইড কর্মসূচির মাধ্যমে বয়স্ক ও দরিদ্রদের চিকিৎসাবিমা দেওয়া হলো; শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষাকে আরও জোরদার করা হলো; এবং শক্তিশালী ইউনিয়নের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক কর্মীদের শিক্ষার জন্য প্রণীত জিআই বিল এবং অন্যান্য সুবিধার ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হলো। ত্রিশের দশকের 'নিউ ডিল' কর্মসূচির সময়ে বিধিবদ্ধ ব্যাংক, অন্যান্য অর্থায়ন সংস্থা এবং বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এই পর্বে বজায় ছিল। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিকে সহজতর করে তুলল। এসব পদক্ষেপের অধিকাংশই প্রবৃদ্ধির নৈপুণ্য বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়েছিল, ফলে পরবর্তী দশকগুলোর তুলনায় এই কালপর্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও স্পষ্টতই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বেগবান ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের অধিক মানুষ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী দেশগুলোর অধীনে আসে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচার ও বৈষম্যের প্রতিবাদে উনিশ শতকে এই মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও যে বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এদের একটি স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে গণ্য করা যায় তা এই যে এই দেশগুলোতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ লোপ করে তার বদলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়; এই ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ সরাসরিভাবে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ব্যবস্থার অধীন দেশগুলোতে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উচ্চপর্যায়ের নেতা ও আমলাদের প্রচ্ছন্ন সুযোগ-সুবিধা উপেক্ষা করলে এসব সমাজে মজুরি ও আয়ের বণ্টন ছিল সমতাভিত্তিক। বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রধান সমস্যা ছিল একটি যুক্তিনিষ্ঠ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অভাব, যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাজারের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও উৎপাদন ও বণ্টনের একটি নিপুণ সংগঠন নিশ্চিত করতে সক্ষম। এর ফলে—কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী পর্ব বাদ দিলে—এই দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার কখনো সম্ভাবনার প্রান্তসীমার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি। এই দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর সমতা তাই অনেকটা সাম্যভিত্তিক দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনীয়; নিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার মান যা হতে পারত তার চেয়ে অনেকটা নিচে। তা ছাড়া, এসব দেশের আয় বণ্টনের বৈষম্য সামাজিক গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে যারা সর্বনিম্ন বৈষম্য অর্জন

২. প্রবন্ধ শেষের তথ্যসূত্রে জিনি সূচকের একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

করেছিল, তাদের থেকে কম তো নয়ই, বরং বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও স্বীকার করা দরকার যে এই দেশগুলো প্রাক-বিপ্লবী যুগের চরম বৈষম্য দূর করে সমতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সেটা শুধু আয় বণ্টনের বিচারে নয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান বণ্টনের বিচারেও।

বিশ্বের বাকি অংশগুলো উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ভুক্ত। এই কালপর্বে এই দেশগুলোতে বৈষম্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্য পরিমাণে এবং বিশ্বাসযোগ্যতায় সীমিত। এই সময়ে লাতিন আমেরিকা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রবর্তিত আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পায়ননীতি অনুসরণ করছিল। অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো—যাদের অধিকাংশ এই কালপর্বে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল—অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল।

ভূমি বণ্টনের বিপুল বৈষম্য ও অন্যান্য কাঠামোগত কারণে লাতিন আমেরিকার আয় বণ্টনের বৈষম্য বরাবরই বেশি ছিল। আমাদের আলোচ্য কালপর্বে এই অঞ্চলটি কিন্তু বৈষম্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ব্যতিরেকেই দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। বৈষম্যের কাঠামোগত কারণগুলো দূর করার অতিসীমিত উদ্যোগ সত্ত্বেও এসব দেশ সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত কিছু পদক্ষেপের ফলে বৈষম্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিহার করতে পেরেছিল।

দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহদাংশ একধরনের আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পায়নের নীতি অবলম্বন করেছিল। এ অঞ্চলের বৃহত্তম দেশ ভারত একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, অনেকে যাকে 'সমাজতন্ত্রপ্রবণ' বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে যাতায়াত, যোগাযোগ প্রভৃতি গণ-পরিষেবামূলক ক্ষেত্র ছাড়াও বেশ কিছু মৌলিক শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করা হয়েছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিশেষত শহরাঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বণ্টনব্যবস্থায়ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল। ভূমি পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রেও সীমিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশও কম-বেশি একই কৌশল অবলম্বন করেছিল। আলোচ্য কালপর্বে এই অঞ্চলগুলোতে আয় বণ্টন সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীলই ছিল। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বৈষম্যের মাত্রায় পার্থক্য ছিল এবং কতগুলো দেশে—যেমন পাকিস্তানে ও ফিলিপিনে—বেশ কয়েক বছর ধরে বৈষম্য বেড়েছিল; কিন্তু প্রধান দেশগুলোতে আয়-বৈষম্য খুব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এ রকম প্রমাণ সামান্যই পাওয়া গেছে।

পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ—প্রথমত জাপান, পরে তার অনুগামী দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং হংকং ও সিঙ্গাপুরের মতো নগররাষ্ট্র—একেবারে ভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করেছিল : সম্পদের পুনর্বণ্টন—জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে ভূমির এবং নগররাষ্ট্র দুটির ক্ষেত্রে জন-আবাসনের; কর্মসংস্থানবর্ধক পণ্যোৎপাদনভিত্তিক, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন; জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি; এবং অবকাঠামোতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। এই দেশগুলো নিম্নমাত্রায় স্থিতিশীল বৈষম্যের সঙ্গে অভূতপূর্ব দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

এই কালপর্বে ঔপনিবেশিকতামুক্ত আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ছিল মাঝারি ধরনের। এসব দেশের বৈষম্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য যথেষ্ট নয়। তবে যে স্বল্পসংখ্যক দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়, তা বৈষম্যের উর্ধ্বগতির বিশেষ সাক্ষ্য দেয় না।

বৈষম্য-পরিহারী প্রবৃদ্ধির কয়েকটি কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে মানবসমাজের পুনরুত্থান হয় বৈষম্য কমানোর শক্তিশালী অঙ্গীকার নিয়ে। এর দীর্ঘ ঐতিহাসিক শিকড় ছিল। পশ্চিমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচার সম্পর্কিত ধারণা থেকে সমতার অন্বেষণ শুরু হয় এবং উনিশ শতকে তা নানা মতের সমাজতান্ত্রিক রচনা ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে ক্রমে একটি সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে। মার্ক্স এই তত্ত্বের চরম ও চূড়ান্ত প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময় ভাঙনের মুখে পড়ে; এর লেনিনপন্থী অংশটি ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, আর এর সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী অংশটি নির্বাচনী গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে লড়াই চালিয়ে যায় এবং সাময়িকভাবে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে বেশ কয়েকটি দেশে নিরঙ্কুশ বা আংশিক ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ত্রিশের দশকে শিল্পোন্নত দেশগুলো যখন 'মহামন্দা'য় নিমজ্জিত, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এই সমাজব্যবস্থার প্রতি বিশ্বব্যাপী সমীহ সৃষ্টি করে, অন্তত স্ট্যালিনীয় নৃশংসতার সত্যিকার মাত্রা যত দিন অনতিজ্ঞাত ছিল তত দিন পর্যন্ত। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার ইউরোপীয় প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক কর্মীর বিপুল আত্মত্যাগ সমাজতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছিল। উন্নত বিশ্বের পুঁজিবাদের পক্ষে সমাজতন্ত্রের এই নৈতিক আবেদন উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সমাজতন্ত্রের এই আবেদনের একটি নির্দেশক এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ক্ষণে বিজয়ের অন্যতম স্থপতি উইনস্টন চার্চিলকে পরিত্যাগ করে ব্রিটেন গ্রহণ করল ব্যক্তিগতভাবে বৈশিষ্ট্যহীন অ্যাটলিকে, যাঁর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক দল ছয় বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে ব্যাপক সামাজিক-গণতন্ত্রমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেছিল। সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর ব্যাপারে ব্যাপক মতৈক্যের আরেকটি নিদর্শন এই যে ১৯৫১ সালে চার্চিলের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ফলে যে দীর্ঘকালীন রক্ষণশীল শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল, তার আমলে শ্রমিক দলের সংস্কারগুলো মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল। এই একই ধারা গোটা ইউরোপে বহাল ছিল, রক্ষণশীলরা পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা দখল করলেও সামাজিক-গণতন্ত্রমূলক সংস্কারগুলো মোটামুটি অব্যাহত রাখা হচ্ছিল।

যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কেইন্‌সীয় নীতির প্রবর্তন, যার ফলে মুদ্রানীতি এবং সরকারি আয়-ব্যয়নীতির যথাযোগ্য ব্যবহার করে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক-গণতান্ত্রিক, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলন এবং হিথ্ উভয়েই

কেইন্‌সীয় তত্ত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এই নীতি অনুসরণের ফলে উচ্চ সামষ্টিক চাহিদা এবং কর্মসংস্থান শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অবশ্য কর্তৃত্বপরায়ণ সমতাবাদী কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। কিছুকালের জন্য স্ট্যালিনোত্তর সময়ে অর্থনৈতিক প্রণোদনামূলক সংস্কারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটিকে অধিকতর উৎপাদন-নিপুণ করার চেষ্টা হয়েছিল। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের স্বৈরপ্রকৃতি যুদ্ধোত্তর কালপর্বের শুরু থেকেই যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সত্তরের দশকের আগে পুঁজিবাদী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একটি গুরুতর প্রতিযোগী হিসেবে দেখার চাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি ছিল সর্বসাধারণের সমতাভিত্তিক শ্রীবৃদ্ধি। পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশের সমতাবাদী ভূমি সংস্কারের পেছনে সম্ভবত চীন বিপ্লবের ছায়ার প্রভাব ছিল। আরও অনেক সদ্য স্বাধীন দেশ জনকল্যাণ প্রসারে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকার লক্ষ্যে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। বাস্তবে এই দেশগুলোর কর্মপন্থা প্রায়ই স্থায়ী ভিত্তিতে সমতাবাদী বণ্টন প্রবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে। আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পায়ন এবং 'প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়'-এর বিভিন্ন পন্থা এসব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিত্তবান ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতে অতিমাত্রায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করে; কিন্তু আংশিক ভূমিসংস্কার, পণ্য বণ্টনে সরকারি উদ্যোগ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচারের জনতুষ্টিবাদী অঙ্গীকার বৈষম্য সীমিত রাখার ক্ষেত্রে কিছু কাজ করত, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নৈপুণ্য হ্রাস করার বিনিময়ে।

২. গত তিন দশকে বৈষমের উত্থান

গত তিন দশকে বৈষম্যের গতি-প্রকৃতির কয়েকটি উদাহরণ

১৯৮০ সালের দিকে ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং সামগ্রিকভাবে পৃথিবী ব্যাপকতর বৈষম্যের দিকে অগ্রসর হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দেশ—এই তিন বর্গের দেশের প্রতিটি থেকে নেওয়া উদাহরণের মধ্যে আমরা আলোচনা সীমিত রাখব। প্রতিটি প্রধান অঞ্চলের প্রতিটি বর্গের দেশেই বৈষম্যের মাত্রা বেড়েছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে 'নিখাদ' বাজার অর্থনীতির উপবর্গের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। ১৯৬৭ সালে পরিবারসমূহের আয়-বৈষম্যের জিনি সূচক ছিল ৩৯.৭। ১৯৭০ সালে এই সূচক কিছুটা নেমেছিল। সেন্‌সাস ব্যুরোর হিসাবে ২০০৫ সালে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৯-এ, অর্থাৎ বৈষম্য খুব উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কংগ্রেসের বাজেট অফিসের একটি প্রতিবেদনে ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার আরও স্পষ্ট হিসাব পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদন থেকে মোট করোত্তর আয়ে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের ভাগ কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তার নিম্নোক্ত পরিমাপ পাওয়া যায় :

১. আয়ের বিচারে জনসমষ্টির সর্বোচ্চ ১ শতাংশের ভাগ ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, ১৭ শতাংশে।
২. জনসমষ্টির সচ্ছলতম পঞ্চমাংশের ভাগ বেড়েছে ৪৩ থেকে ৫৩ শতাংশ।
৩. দরিদ্রতম পঞ্চমাংশের ভাগ কমেছে ৭ থেকে ৫ শতাংশ।
৪. অন্তর্বর্তী তিন-পঞ্চমাংশকে মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত বলা যায়; এদের ভাগ ৫০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে।

বাস্তবে বৈষম্য বৃদ্ধি হয়েছে আরও অনেক বেশি। পরিবারে রোজগেরে লোকের সংখ্যা, বিশেষত নারী-রোজগেরের সংখ্যা বেড়েছে; পারিবারিক ঋণের বোঝা বেড়েছে; সম্ভাব্য অবসর-ভাতার পরিমাণও অনেক কমেছে এবং এতৎসত্ত্বেও মোট আয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ভাগ কমে গেছে। এসবই ঘটছে এমন একটি সমাজে, গণতন্ত্র যার ঘোষিত ভিত্তি, যেখানে নীতিনির্ধারকেরা নিয়মিত সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হচ্ছেন—বিষয়টি বুদ্ধি-ঘুলিয়ে দেওয়া প্রহেলিকা ছাড়া আর কী! প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রেই বৈষম্য সর্বাধিক এবং এই বর্গভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে গত তিন দশকে বৈষম্য বৃদ্ধির সবচেয়ে কদর্য অভিজ্ঞতাও এ দেশেরই। তবে এই বর্গভুক্ত প্রায় সব দেশেই একই ধরনের পরিবর্তন হয়েছে।

সামাজিক-গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই দেশগুলোর বৈষম্য এই কালপর্বের শুরুতে বেশ নিচু ছিল এবং এদের বৈষম্য বৃদ্ধির হারও ছিল সীমিত। ফলে এই দেশগুলোর বর্তমান বৈষম্য সহনীয়। প্রাচীনতর সামাজিক-গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে—যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার—আয় বণ্টনের সামগ্রিক বৈষম্য এখনো নিচুতেই রয়েছে, তাদের জিনি সূচকগুলো ২৫-এর আশপাশে ওঠানামা করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাধীন দেশগুলোতে জিনি সূচকের যে পরিমাপ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অন্যান্য দেশের জিনি সূচকের তুলনাযোগ্যতা নিয়ে নানা রকম সংখ্যাতাত্ত্বিক সমস্যা আছে, তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটা ছিল ৩০-এর মতো এবং চীনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কিছু কম। রাশিয়ায় পুঁজিবাদে রূপান্তর ঘটেছিল একটি বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক বিত্ত ও সম্পদ লুণ্ঠনের ফলে উদ্ভূত ব্যাপক ও তীব্র বৈষম্যায়নের মাধ্যমে। সিআইএর প্রতিবেদন অনুসারে, জিনি সূচক ছিল ২০০১ সালে ৩৯.৯ এবং ২০০৯ সালে ৪২.২। নিঃসন্দেহে বলা চলে, বৈষম্যের প্রকৃত ঊর্ধ্বগতি এর চেয়ে বেশি ছিল। বিশেষত কালোবাজার থেকে লব্ধ বিপুল পরিমাণ আয় এই হিসাবে বাদ পড়েছে; ত্রুটিপূর্ণ হলেও যে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী সমাজতন্ত্রের আমলে বিদ্যমান ছিল, তা ভেঙে পড়ার ফলে জনজীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার সামান্যই ধরা পড়েছে তথ্য-পরিসংখ্যানে। চীনের আয় বণ্টনের জিনি সূচক, বিশেষ করে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনীতির বিশ্বায়ন শুরু হওয়ার কাল থেকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সাল নাগাদ ৪১.৫-এ পৌঁছেছে।

এই তিন দশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও এসব ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতে বৈষম্য গুণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলশ্রুতির নিদর্শন এমন এক

বীভৎস ও অপব্যয়ী সম্পদ প্রদর্শন, যা অল্প কয়েক দশক আগে অকল্পনীয় ছিল। লাতিন আমেরিকার বৈষম্য সর্বত্রই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সূচনা চিলিতে সত্তরের দশকে জেনারেল পিনোশে প্রবর্তিত বর্বর পরিবর্তনগুলোর মাধ্যমে। তারপর সমগ্র মহাদেশে এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, বিশেষত 'হারিয়ে-যাওয়া' আশির দশকে যখন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অজুহাতে সামষ্টিক চাহিদার গুরুতর সংকোচন এবং বিশ্বায়নের প্রবাহে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগগুলো থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের ফলে জাতীয় উৎপাদন নিম্নগামী এবং কর্মাভাব ও বৈষম্য ঊর্ধ্বগামী ছিল। এই প্রবণতা লাতিন আমেরিকায় বর্তমান শতকের প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাতিন আমেরিকার প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্যের দিক পরিবর্তন হয়েছে, যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার যে স্বল্পসংখ্যক দেশ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, সেখানেও বৈষম্য তীব্রভাবে বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে মিসরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের বৈষম্য নিয়ে আমি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছি। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য নিয়মিতভাবে বেড়েছে। লক্ষণীয় এই যে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় আয়ের বৈষম্যপ্রবণ অঙ্গগুলোর ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় আয়ের এই 'কাঠামোগত' পরিবর্তনই বৈষম্য বৃদ্ধির মূল উৎস। প্রবৃদ্ধির কাঠামোর মধ্যে নিহিত এই বৈষম্যপ্রবণতাকে প্রতিহত করার মতো সমতাবর্ধক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ খুব সামান্যই নেওয়া হয়েছে।

কিছু বহু-কথিত পাল্টাযুক্তি

ওপরে বর্ণিত প্রবণতা নিয়ে দুর্ভাবনা নেই এমন লোকেরা যুক্তি দিয়ে থাকেন যে দেশের অভ্যন্তরে বৈষম্য বাড়লেও সারা বিশ্বের সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর বৈষম্য সম্ভবত বাড়েনি। যুক্তিটা এ রকম : পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষের বাসভূমি চীন এবং ভারতে যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তার ফলে এই দুই দেশের একজন গড় অধিবাসীর জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে শিল্পোন্নত বিশ্বের একজন গড় অধিবাসীর জীবনযাত্রার মানের দূরত্ব কমেছে। 'আন্তদেশীয়' বৈষম্যের সম্ভাব্য হ্রাস এবং 'দেশের ভেতরের বৈষম্য' বৃদ্ধি এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা পরস্পরের প্রতিপূরক হিসেবে কাজ করেছে; ফলে হয়তো সারা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বৈষম্যায়ন হয়নি।

এই তর্কটির প্রেরণা এসেছে দুজন ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ—বুরগুইনোঁ ও মরিসন—এর গবেষণা থেকে। তাঁরা দুজনে ১৮২০ থেকে শুরু করে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কালপর্বের কয়েকটি বছরের জন্য বিশ্বের সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর আয় বণ্টনের জিনি সূচক পরিমাপ করেছেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, এই কালপর্বের গোড়ার তুলনায় শেষে বৈষম্যের মাত্রা অনেক বেশি হয়েছে। লক্ষণীয় যে এই পরিমাপ অনুসারে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব বৈষম্য হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু তার পর থেকে তা অব্যাহতভাবে বেড়েছে। আরও লক্ষণীয় এই যে দেশের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল অবধি স্থিতিশীল ছিল এবং এরপর বাড়তে শুরু করেছে। এই তথ্যগুলো আমাদের সিদ্ধান্ত

সমর্থন করে। ওদের হিসাব থেকে আরও দেখা যায় যে আন্তদেশীয় বৈষম্যের অবিরাম ঊর্ধ্বগতি ১৯৬০-এর পর থেকে অব্যাহত ছিল।

আন্তদেশীয় বৈষম্য হ্রাসের ফলে অভ্যন্তরীণ বৈষম্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্ব বৈষম্য স্থিতিশীল রয়েছে, অতএব বৈষম্য বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনার কারণ নেই—এই যুক্তির মধ্যে আমি স্বস্তি খুঁজে পাই না। মানুষের কল্যাণ, সম্ভ্রম, আত্মমর্যাদা এবং কর্মোদ্যম নিজস্ব সমাজের বৈষম্যের প্রভাব দিয়ে নিরূপিত হয়। এই বৈষম্য যখন আকাশচুম্বী, তখন নিজস্ব সমাজ ও দূরান্তরের সব অচিন সমাজের সম্মিলিত বৈষম্যের কোনো দুর্বোধ্য সূচকের স্থিতিশীলতার মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজার অবকাশ থাকে না। বিশ্বজনের সামগ্রিক বৈষম্যের সম্ভাব্য নিম্নগতির মধ্যে স্বস্তি অন্বেষণের বিরুদ্ধে এই মৌলিক আপত্তি ছাড়াও প্রশ্ন রয়েছে যে বুরগুইনোঁ-মরিসন প্রণীত সূচকটি যদি বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসারিত করা যেত, তবে তাতে গত দুই দশকে বিশ্ববৈষম্যের নিম্নগতি দেখা যেত কি না। গত দুই দশকে চীনা/ভারতীয় এবং উন্নত বিশ্বের নাগরিকদের মধ্যকার গড় বৈষম্য যথার্থই হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু তা থেকে নিশ্চয় করে বলা যায় না যে আন্তদেশীয় বৈষম্য কমেছে। প্রথমত, অনেক দরিদ্র দেশের নাগরিকদের সঙ্গে যুগপৎ উন্নত বিশ্ব ও চীন/ভারতের আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, চীনের জাতীয় আয়ের প্রবল ঊর্ধ্বগতির তুলনায় পরিবারবর্গের 'ব্যক্তিগত আয়' বেড়েছে অনেক শ্লথগতিতে। দ্বিতীয়ত, চীন, ভারতসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে অভ্যন্তরীণ বৈষম্য এমন বিপুল হারে বেড়েছে যে আন্তদেশীয় বৈষম্যের অনিশ্চিত নিম্নগামিতা তার প্রভাবকে অতিক্রম করবে, এ নিতান্ত দুরাশা মাত্র।

বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলো প্রায়ই আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করে যে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হলে বৈষম্য বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ উদ্বেগের কারণ নেই; দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পেলে আয় বণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি নিয়ে ভাবনা অকারণ। এই তত্ত্বের একটি চরম রূপ চীনে সংস্কার প্রবর্তনের গোড়ার বছরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছিল, এতে দাবি করা হয়েছিল যে বৈষম্য বৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক। এমন তত্ত্বের সমর্থনে বলা যায় যে মাওবাদী আমলের চরম ও খামখেয়ালি সমতাবাদ উন্নয়নকে এমন বিঘ্নিত করছিল যে তার অবসান দরিদ্রসহ সব মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এটা বড়জোর প্রণোদনাবিনাশী খেয়ালি সমতাবাদের অবসানের পক্ষের যুক্তি; এ ধরনের সমতাবাদী নীতিগুলো নির্মূল করার জন্য চীনের সমাজের বিপুল বৈষম্যায়ন অপ্রয়োজনীয় ছিল। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বৈষম্যায়ন হওয়ার ফল এই যে অন্যদের তুলনায় দরিদ্রদের আয় বাড়ে ধীরগতিতে, দারিদ্র্য হ্রাস হয় সম্ভাবনাসীমার চেয়ে শ্লথ হারে। সমাজের সামষ্টিক কল্যাণের অহেতুক ক্ষতিস্বীকার ছাড়া একে আর কিছু ভাবা যায় না।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে আরও মৌলিক আপত্তি এই যে প্রবৃদ্ধির সুফলের কিয়দংশ দরিদ্র জনগণের ভাগে পড়লেও সীমাহীন বৈষম্য ন্যায় বিরুদ্ধ, সামাজিক দুর্গতিসূচক এবং স্থায়ী প্রবৃদ্ধির অন্তরায়। সীমিত বৈষম্য স্বীকারযোগ্য, এমনকি কাঙ্ক্ষিত হতে পারে যদি তা প্রবৃদ্ধি-সহায়ক নৈপুণ্য ও প্রণোদনার জন্য প্রয়োজনীয় পুরস্কার থেকে উদ্ভূত হয়। সাম্প্রতিককালে সর্বোচ্চ সম্পদশালী দেশগুলোর মধ্যে অনেকে যে উচ্চমাত্রার সমতা রক্ষা করতে পেরেছে, তাতে প্রমাণ হয় যে 'সামাজিকভাবে আবশ্যিক' বৈষম্যের মাত্রা বেশি

নয়। এই মাত্রার উর্ধ্বে সীমাহীন বৈষম্যায়ন সামাজিক সংহতিতে ভাঙন ধরায়, যে সংহতি সুখী মানবসমাজের অস্তিত্বের অপরিহার্য পূর্বশর্ত (এই প্রবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত উনিশ শতকের একজন অগ্রগণ্য রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য লক্ষ করুন)। মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্য অন্যায্য। এটা মিথ্যা যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বাংলাদেশের মতো দেশে বিদ্যমান বৈষম্য বাজার অর্থনীতির ফল। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া এই তিনটি ভিন্ন ধরনের দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের অধীনে উচ্চমাত্রায় ক্রমবর্ধমান বৈষম্য উদ্ভূত হতে পারার কারণ এই যে এই দেশগুলোতে শক্তিধর এবং বিত্তবানদের স্বার্থে বাজারকে বিকৃত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সুফল সর্বত্রই অধিক হারে ধনীদের কুক্ষিগত হয়েছে; সম্পদশালী যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন-ব্যবস্থা বিত্তবান ও তাদের দালালদের (lobbyist) আর্থিক ক্ষমতা দ্বারা এত দূর প্রভাবিত হয়েছে যে সেখানকার সবচেয়ে ধনী শতকোটি পতিদের অনেকে এখন মধ্য আয়ের লোকদের চেয়ে কম আনুপাতিক হারে কর দেয়; একদিকে ব্যাপক ফাটকাবাজিতে দেউলিয়া ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রীয় তহবিলের সহায়তায় সক্ষম করা হয় আর অন্যদিকে ফাটকাবাজির ফাঁদে পড়া নিম্নবিত্তরা গৃহ-ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে তাদের বাসস্থান নিলামে ওঠে; রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে দহরম-মহরমের সুবাদে সামাজিক পরজীবীরা রাষ্ট্রীয় ব্যয়-প্রকল্পে ঠিকাদারির অব্যাহত সুযোগ পায়। আকাশচুম্বী বৈষম্যের চাপে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের শ্বাস রোধ হয়। চীন অবশ্য খোলাখুলিভাবেই একদলীয় রাষ্ট্র, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রও কার্যত একটি একদলীয় ব্যবস্থা এই কারণে যে দুই দলের অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্যই তাঁবেদারি করেন ধনকুবেরদের, যাঁরা তাঁদের নির্বাচনের ব্যয় বহন করেন। (জেফ্রি স্যাক্স্-এর সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়: 'প্রায়ই রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের একমাত্র পার্থক্য বলে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো রিপাবলিকানদের মালিকানা বৃহৎ তেল কোম্পানিদের হাতে এবং ডেমোক্র্যাটদের মালিকানা ওয়ালস্ট্রিটের হাতে।')

সবশেষে বলা দরকার, অতিরিক্ত বৈষম্য সামষ্টিক চাহিদা নিরোধক এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থার কারণ। বৈষম্যবর্ধক প্রবৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ ভোগচাহিদা বৃদ্ধির গতি অতি মন্থর; বৈষম্যবর্ধক প্রবৃদ্ধিজাত মন্থর অভ্যন্তরীণ ভোগের ফলে উদ্ভূত ব্যাপক উদ্বৃত্ত আয় ব্যবহার করে চীন যুক্তরাষ্ট্রে এমন সব বিনিয়োগ করছে, যার মুনাফা নগণ্য—পৃথিবীর দুই বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির সমস্যার একই মৌলিক ব্যাখ্যা।

৩. বাঁক-পরিবর্তনের কারণ

বৈষম্যের গতিধারায় বাঁক-বদলের সঙ্গে তিনটি সমকালীন পরিবর্তনের যোগ রয়েছে: বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন; প্রাগ্রসর বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন যাকে আপাতত সংক্ষেপে 'গোঁড়া বাজারনীতি' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে; এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দীর্ঘকালীন আমদানি-প্রতিস্থাপক নীতি পরিত্যাগ করে মুক্তবাণিজ্য ও বাজার

অর্থনীতির দিকে পদক্ষেপ। কালান্তর সূচক এই পরিবর্তনগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে ব্যাপকতর বৈষম্যায়নের কারণ হয়েছে, এখানে আমি সে সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণার কিছুটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব।

সমাজতন্ত্রের পতন

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ অসংগতির কারণে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ও অনিবার্য পতন ঘটবে। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, সে কারণেই তার নিজের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশে পরিচালিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রবর্তন এই অসংগতির উৎস। অর্থনীতির তাত্ত্বিকদের বর্ণনায় বাজারব্যবস্থা উৎপাদনের উদ্যোক্তা, শ্রমিক ও ভোক্তাদের মধ্যে 'সংলাপের' সুযোগ সৃষ্টি করে, যার ফলে কী, কতটুকু, কী প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন কীভাবে হবে তা স্থির হয়। এর দুটি প্রয়োজনীয় ফলশ্রুতি: চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্পদের নিপুণতম ব্যবহার নিশ্চিত করা। বাজারব্যবস্থা পুঁজিবাদের অধীনে নিশ্চয়ই একটি শোষণের হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু সে জন্য দায়ী সম্পদ, তথ্য ও ক্ষমতার অসম মালিকানার মতো বাড়তি পুঁজিবাদী প্রবর্তনা। বাজারের এই সংলাপমূলক ও শোষণমূলক ভূমিকার পার্থক্য উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। সংলাপমূলক ভূমিকায় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের মতো বাজার নিতান্তই একটি নিপুণ উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা কার্যকর করার হাতিয়ার। বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বাজারের শোষণমূলক ভূমিকার কারণগুলো দূর করা কর্তব্য, কিন্তু বাজারের সংলাপমূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখা একান্তই আবশ্যিক।[৩] বিদ্যমান সমাজতন্ত্র বাজারের এই ভিন্ন ভূমিকা দুটির পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেনি। এর দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী শোষণের অস্ত্র ছাড়া বাজারের অন্য কোনো ভূমিকা অসম্ভব। গোড়া থেকেই এরা সম্পূর্ণভাবে বাজারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং উৎপাদন, বণ্টন ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় আমলাদের সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণাধীন করে। ফলে সম্পদ ব্যবহারের নৈপুণ্য অর্জন এমনকি চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য রক্ষার মতো প্রাথমিক কর্তব্য সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়েছিল। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুপস্থিতি, নৃশংসভাবে ভিন্নমত দমন, সমাজতান্ত্রিক 'সাম্রাজ্যের' অভ্যন্তরীণ দেশগুলোর স্বায়ত্তশাসনহীনতা ইত্যাদি যেসব বিষয়ের ওপর দোষ আরোপ করা হয়, আমি তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করছি না। আমি বলতে চাই, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাব্যবস্থা যে নৈপুণ্যহীন উৎপাদন ও বণ্টন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা জনগণের বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতে পারত।

৩. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অমর্ত্য সেন বাজারের বিলুপ্তিকে সংলাপের অবসান বলে বর্ণনা করেছেন। ওপরের বিভাজনের নামকরণে আমি তাঁর বর্ণনা অনুসরণ করেছি।

আরও একটি পরিহাস এই যে, প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বাজারের বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপরিচালিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল এবং তাতে মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থার অপারঙ্গমতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এর পরিপ্রেক্ষিতে 'বাজারসদৃশ' বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার একটি সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, যাতে ভোক্তা, শ্রমিক ও সামাজিক মালিকানাধীন উদ্যোগগুলো অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টনসম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেন বিদ্যমান সমাজতন্ত্র কখনো এই বিকল্পকে গভীরভাবে বিবেচনা করেনি এবং 'যদি করত তবে কী হতে পারত' তার যথাযোগ্য উত্তর আমার জানা নেই।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের ভাঙন শুরু হয়। পরিবর্তন সবার আগে শুরু হয় চীনে, মোটামুটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে তারা ক্রমেই সংস্কারের যে পথ গ্রহণ করেছিল তার পরিণতি হয় একদলীয় শাসনাধীন পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার ইউরোপীয় ও মধ্য-এশীয় 'সাম্রাজ্য' এক দশক বা তার চেয়ে কিছু সময় পরে বিপুল বিশৃঙ্খলার পথে পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটায়। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে এর খেয়ালি সমতাবাদভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থারও ইতি ঘটে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কিছু সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র পূর্ব ইউরোপ ও এশীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বৈষম্যপ্রবণ দেশ হয়ে দাঁড়ায়। তুলনায় কিছুটা ধীরগতিতে, পরিবর্তন শুরু হওয়ার পঁচিশ বছরের মধ্যে, চীন এশিয়ার সবচেয়ে সমতাবাদী দেশ থেকে সবচেয়ে বৈষম্যপ্রবণ দেশের একটিতে রূপান্তরিত হয়।

বৈষম্য সীমিত রাখার লক্ষ্য সম্বন্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতৈক্যের অবসান

যুদ্ধোত্তর দশকগুলোতে পুঁজিবাদী বিশ্বের বৈষম্য-পরিহারক সমৃদ্ধির অর্থ এই নয় যে এই দেশগুলো নিজেদের পুঁজিবাদী চরিত্র ত্যাগ করেছিল। এই দশকগুলোতে বেশ কিছু পুঁজিবাদী দেশে আয় বণ্টনে শ্রমিকদের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পুঁজিপতিদের অংশ হ্রাস পেয়েছিল। পুঁজিপতিদের পক্ষে প্রতি-আক্রমণ অনিবার্য ছিল। এই যুদ্ধের প্রথম শিকার হয়েছিল পূর্ণ কর্মসংস্থানের অঙ্গীকার, যা মজুরি ও জীবনযাত্রা নিয়ে দর-কষাকষিতে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক। ১৯৭০-এর দশকে এসে মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধের লক্ষ্যের ওপর পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনের প্রাধান্যের পূর্বতন প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ক্রমবর্ধমান হারে রক্ষণশীল মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য এবং খোলাখুলিভাবে ব্যাপকতর কর্মাভাব-সহনশীলতা রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হয়ে দাঁড়াল। শ্রমিক ইউনিয়নের শক্তি খর্ব করতে এটা যথেষ্ট ছিল না। মজুরি নিয়ে দর-কষাকষি হয়ে থাকে চলতি ক্রয়ক্ষমতার মুদ্রায়। অতএব, পুঁজিপতিদের পক্ষে আয়ের স্বকীয় ভাগ অপরিবর্তিত রাখার সহজ পথ ছিল উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। এই পথ অনুসরণ করার সমস্যা এই যে, এতে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের মুদ্রার প্রকৃত বিনিময়মূল্য বৃদ্ধি পায়, যার ফলে দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাসক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও দেশীয় মুদ্রার প্রকৃত বিনিময়মূল্য

স্থিতিশীল রাখার উপায় অবমূল্যায়ন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রেটনউড্‌সে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের ভিত্তি ছিল বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা; ঘন ঘন অবমূল্যায়নের নীতিকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল এবং বিনিময় হার স্থির রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সত্তরের দশকের গোড়াতে সোনার মাপে ডলারের মূল্য নির্ধারণের অবসানের ফলে কার্যকরভাবে স্থিতিশীল বিনিময় হারের ব্রেটনউড্‌স-নির্ধারিত ব্যবস্থাটির সমাপ্তি ঘটে। ফলে দেশগুলোর পক্ষে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিধানের জন্য মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কিন্তু পুঁজিপতিদের পক্ষে শ্রমিকদের ক্ষমতা দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হলো বিশ্বব্যাপী পুঁজির অবাধ বিচরণ, যেখানে শ্রম সংগঠিত এবং ব্যয়বহুল, সেখান থেকে যেখানে শ্রম অসংগঠিত এবং সস্তা, সেখানে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের ক্রমপ্রসার অব্যাহত ছিল; নব্বইয়ের দশকে অর্থনীতির বিশ্বায়নে একটি গুণগত ঊর্ধ্বগতির সূচনা হলো সেবার ক্ষেত্রে মুক্তবাণিজ্য, মুক্ত আন্তর্জাতিক পুঁজি সঞ্চরণ, মেধাস্বত্বের সুরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেনে ১৯৭৯ সালে মার্গারেট থ্যাচারের এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০ সালে রোনাল্ড রেগানের বিজয়ের ফলে শিল্প-বাণিজ্য-অর্থায়নে নিয়ন্ত্রণ-শৈথিল্য, বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানার প্রসার, রাজস্ব কর হ্রাস, পুনর্বণ্টনমূলক ব্যবস্থার সংকোচন, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ হ্রাস ইত্যাদি পরিবর্তনের যুগ সূচিত হয়।

অনেক বিশ্লেষক ক্রমবর্ধিষ্ণু বৈষম্যের জন্য দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং তার ফলে উদ্ভূত দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের আয়-পার্থক্যের বিস্তারকে দায়ী করেছেন। বৈষম্য বিস্তারে হয়তো এর কিছু ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু কোনোক্রমেই স্বীকার করা সম্ভব নয় যে, এ ধরনের অপ্রতিরোধ্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই বৈষম্য বৃদ্ধির মূল কারণ। আমরা দেখেছি, ধনাঢ্যতার শিখরের ১ শতাংশের আয় বৃদ্ধি হয়েছে সর্বোচ্চ হারে। একে কোনোক্রমেই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না, এই আয় শ্রমদক্ষতার ফসল নয়, বরং নিয়ন্ত্রণ-শৈথিল্য, কর হ্রাস এবং ধনাঢ্যদের স্বার্থে প্রবর্তিত অন্যান্য পুনর্বণ্টন-সংক্রান্ত নীতির ফল। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রযুক্তিগত শিক্ষার সম্প্রসারণ দ্বারা দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের মধ্যকার আয়-বৈষম্যকে সীমিত রাখা সম্ভব ছিল। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি।

এই কালপর্বে সামাজিক গণতন্ত্রেও বৈষম্য বৃদ্ধি হয়েছে। এর কারণ কী? সামাজিক গণতন্ত্রও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও পুঁজিবাদ সেখানে ব্যাপক সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্বায়ন-সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের সঙ্গে এদের অর্থনীতিকেও সমন্বিত করতে হয়েছে। বিশেষত অর্থনীতির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা রক্ষা করার জন্য উৎপাদন ব্যয়ে শ্রমের মূল্যকে সীমিত করতে হয়েছে, শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়াতে ও সুযোগ-সুবিধা কমাতে হয়েছে, দেশত্যাগের প্রবণতা নিবারণের জন্য পুঁজির মুনাফার ওপর কর হ্রাস করতে হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থার সপক্ষে

শক্তিশালী মতৈক্যের ফলে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী ও আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের নেতিবাচক পরিবর্তন এড়ানো গেছে।

উন্নয়নশীল বিশ্ব

ব্যতিক্রমী ধারার বৈষম্যবিরোধী, উন্মুক্ত উন্নয়ননীতি অনুসারী মুষ্টিমেয় পূর্ব এশীয় দেশ বাদে বাকি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেকাংশে একধরনের আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পায়ন (import-substituting industrialization, যাকে সংক্ষেপে অন্তর্মুখী উন্নয়ন নামে অভিহিত করছি), আর সেই সঙ্গে নানা মাত্রার রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ছিল। অন্তর্মুখী উন্নয়নের অকার্যকারিতা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আগে বাইরে থেকে আমদানি করা হতো এমন সব পণ্য ও সেবার অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে প্রণোদিত করার জন্য এটি যে প্রতিরক্ষার প্রাচীর সৃষ্টি করে, তার ফলে রপ্তানির প্রতি বৈষম্য এবং ভিন্ন ভিন্ন পণ্য ও সেবার প্রতিরক্ষার হারে উচ্চমাত্রায় হেরফের অবশ্যম্ভাবী। ফলশ্রুতি হিসেবে উৎপাদনের নৈপুণ্য হ্রাস পায়। ভোক্তা ও প্রাথমিক রপ্তানির উৎপাদক স্বল্পবিত্ত কৃষকদের জন্য হানিকর এবং শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধাজনক এই উন্নয়ননীতির প্রভাব সামগ্রিক আয় বণ্টনের ওপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিকূল। এসব দেশের শাসকদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমতাবাদ প্রায়ই ভূমি সংস্কারের নামমাত্র উদ্যোগ, খাদ্য ভর্তুকি, উৎপাদক দ্রব্যসমূহের জোগানে সরকারি উদ্যোগ এবং অন্যান্য ছোটখাটো পুনর্বণ্টনমূলক পদক্ষেপে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে অর্থনীতিবিদদের সমালোচনায় অন্তর্মুখী শিল্পায়নের অনির্ভরযোগ্যতা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো উন্নয়ন সংস্থাগুলো এই ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সুপারিশ শুরু করে। আশির দশকে এসব সংস্থা এবং শিল্পোন্নত দাতা দেশগুলো ঋণ-সংকটে কাবু লাতিন আমেরিকার ওপর 'কাঠামোগত সংস্কার' নামক একধরনের ঋণের শর্তাবলির মাধ্যমে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পায়। ক্রমশ উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রতিরক্ষার প্রাচীর উঠিয়ে নিতে শুরু করে এবং শুল্ক ও অন্যান্য আমদানি-প্রতিরোধক বাধা অনেক কমিয়ে আনে। বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্কারের সঙ্গে আসে তথাকথিত 'ওয়াশিংটন মতৈক্যের' অন্যান্য উপাদান: বিরাষ্ট্রীয়করণ, নিয়ন্ত্রণ-শৈথিল্য, ভর্তুকি হ্রাস, বাজেটে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য ইত্যাদি। একদিকে যেমন ঋণ সংগ্রহের প্রয়োজনে কিছু দেশ বাধ্য হয়ে ঋণের শর্ত হিসেবে সংস্কার মেনে নিয়েছিল, অন্যদিকে চিলি, চীন, ভারত, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অন্তর্মুখী উন্নয়ননীতির অকার্যকারিতা এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুবিধা অনুধাবন করে স্বেচ্ছাপ্রসূত হয়ে সংস্কার গ্রহণ করেছিল।

শ্রমশক্তির প্রাচুর্য এবং পুঁজির অপ্রতুলতা দ্বারা চিহ্নিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থনীতিতত্ত্ব দাবি করে যে, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা থেকে অবাধ বাণিজ্যে উত্তরণের ফলে উৎপাদন নৈপুণ্য বৃদ্ধি ছাড়াও বণ্টন-বৈষম্যের হ্রাস হয়। অবাধতর বাণিজ্যের ফলে এসব দেশে উৎপাদন ও রপ্তানিতে অধিকতর শ্রমনিবিড় পণ্য ও সেবার অংশ বাড়বে। ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়বে এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুততর হবে। লক্ষণীয় যে পুঁজি-সমৃদ্ধ ও শ্রম-অপ্রতুল শিল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত; এই দেশগুলো অবাধতর বাণিজ্য অবলম্বন করলে মজুরি বৃদ্ধি হবে মুনাফা বৃদ্ধির চেয়ে শ্লথহারে। দেখা যাচ্ছে, যুগপৎ বৃহত্তর উৎপাদন নৈপুণ্য ও সমতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থনীতিতত্ত্ব উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রেখেছে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, যেসব উন্নয়নশীল দেশ অন্তর্মুখী নীতি বর্জন করে বিশ্বায়নের পথে অবাধ বাণিজ্যের পদক্ষেপ নিয়েছে, সেসব দেশে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রায়ই নাটকীয়ভাবে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অনুমানবিরুদ্ধ ফলাফল ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আমার কিছু রচনায় এর যে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তার একটি সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি।

অন্যান্য অধিকাংশ অর্থনৈতিক তত্ত্বের মতো বাণিজ্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি রূপান্তরকালীন সমস্যা ও ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে। অন্তর্মুখী দেশগুলোর উৎপাদনের বৃহদংশই নানাবিধ অনৈপুণ্যতায় ভুগে থাকে। উদাহরণ হিসেবে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। মাওবাদী আমলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনীয় কর্মীর চাইতে অনেক বেশি ছিল। 'সমাজতন্ত্রে বেকারী অসম্ভব'—এই তত্ত্বকে সত্য প্রমাণ করার দায়ে রাষ্ট্রের উদ্যোগসমূহে কর্মসংস্থানকে দেখা হতো বেকার-ভাতার গোপন বিকল্প হিসেবে (একই ঘটনা ভারতের মতো বহু মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘটেছে, এসব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা উৎপাদনের প্রয়োজনকে প্রায়ই অনেক ব্যবধানে ছাড়িয়ে গেছে)। অন্তর্মুখী নীতি বর্জনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার যুগে নতুন রপ্তানিমুখী শিল্পোদ্যোগের উদ্ভব হলো, যা সংগতভাবেই শ্রমনিবিড় এবং দ্রুতহারে কর্মসংস্থানে সক্ষম। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এদের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উদ্বৃত্ত কর্মীদের ছাঁটাই করতে বাধ্য হলো। বিশাল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিপুল উদ্বৃত্ত কর্মীর ছাঁটাইয়ের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল নতুন শিল্পোদ্যোগে নিয়োজিত কর্মসংস্থানের চাইতে বেশি। ফলে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সামগ্রিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতি ছিল অত্যন্ত ধীর, কখনো নেতিবাচক। রূপান্তরের এই কর্মসংস্থানক্ষীণ কাল চীনে কয়েক দশক স্থায়ী ছিল, যখন বিপুল প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও স্বল্পবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা সামান্যই উন্নত হয়েছিল।

উন্নয়নশীল দেশগুলো অন্তর্মুখী নীতি বর্জন করার সন্ধিক্ষণে প্রায়ই মুদ্রাস্ফীতি, রাষ্ট্রীয় ঋণাধিক্য, বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি—সামষ্টিক অর্থনীতির এই সব ভারসাম্যহীনতায় আক্রান্ত ছিল। এই সময়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং দাতা দেশগুলোর চাপের মুখে এই দেশগুলো রাষ্ট্রের ব্যয় সংকোচ ও মুদ্রাসংকোচনের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সামষ্টিক ভারসাম্য বিধানের পদ্ধতিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল প্রবৃদ্ধি অপহারক, এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলোর অর্থায়নেও বাধা পড়ত। খুব কম ক্ষেত্রেই জাতীয় নীতিনির্ধারকেরা দরিদ্রদের সুবিধাগুলো সংরক্ষণ

করতে সক্ষম হতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সুবিধাগুলো হ্রাস করা অনিবার্য হয়ে যেত, যেমন: খাদ্য ভর্তুকি ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের ভর্তুকি হ্রাস করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় সংকোচ করা।

এসব দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহও ছিল ব্যাপক বৈষম্যপ্রবণ। এর ঝোঁক ছিল তুলনামূলকভাবে সম্পদশালী অঞ্চলে পুঞ্জীভূত হওয়ার দিকে, যেখানে উন্নত অবকাঠামো ও দক্ষ শ্রমের জোগান রয়েছে। আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধির ফলাফল হিসেবে সামগ্রিক আয় বণ্টনের বৈষম্যও বেড়ে যায়।

সবশেষে, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়নের ফলে বৈষম্যায়নের মাত্রা অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিক ধারণাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। ভারতের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাত্ত্বিক ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিশ্বায়নের কালে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির বৃহদংশ ছিল কর্মসংস্থান-প্রতিকূল পণ্য ও সেবার সমষ্টি, যে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে অদক্ষ ও দরিদ্র শ্রমিকদের অল্পই ব্যবহার করা হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রপ্তানির বৃহদংশ ছিল দক্ষ শ্রমনিবিড় পণ্য ও সেবার সমষ্টি। এই সব শ্রমকর্মী ছিল আয় বণ্টন-সোপানের শীর্ষে। এ ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়ে গেল বৈষম্যবর্ধক। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বিশ্বায়নের অনেক আগেই ভারত সুদক্ষ মানবসম্পদের উদ্বৃত্ত জোগান অর্জন করেছিল। এর কারণ নেহরু আমল থেকে প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ, যা অতীতে সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদের প্রাচুর্য এবং ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রচলনের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির মতো পণ্য ও সেবায় ভারতের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল আগেই। বিশ্বায়নের কালে এই সব পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ ভারত তাই সহজেই নিতে পেরেছিল।

যথাযোগ্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রোদ্যোগের মাধ্যমে ওপরে বর্ণিত চাপগুলোর প্রভাব থেকে আয় বণ্টন-বৈষম্যকে রক্ষা করা যেত: প্রবৃদ্ধির কর্মসংস্থান-বিদ্বেষকে পুষিয়ে নেওয়া যেত বড় মাপের গণকর্মসংস্থানকারী রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ দিয়ে, যদি রাষ্ট্রীয় বাজেটে ভারসাম্যের চাপকে শিথিল করা যেত অথবা চীনের ক্ষেত্রে জাতীয় সঞ্চয়ের যে বিপুল অংশ মার্কিন সরকারকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়, তার একাংশ এ ধরনের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে নিয়োগ করা হতো; রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে যদি স্বল্পবিত্তদের সেবা ও সুবিধা সংরক্ষণ করা যেত। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু দেশে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, আমরা নিচে তা আলোচনা করব। কিন্তু গত তিন দশকের অধিকাংশ সময়ে বর্ধিষ্ণু বৈষম্যের গতিরোধের লক্ষ্যে সামান্যই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

ব্যাপক বৈষম্য-সহিষ্ণুতার কারণ

'শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যই চলছে। কিন্তু এই সংগ্রাম পরিচালনা করছে আমাদের ধনিক শ্রেণী এবং এই সংগ্রামে আমাদের জয় হচ্ছে'—কথাটা বলেছেন আমেরিকার অগ্রগণ্য উদ্যোক্তা এবং বিশ্বের ধনাঢ্যতম ব্যক্তিদের অন্যতম ওয়ারেন বাফেট। এই অর্থবহ বক্তব্য একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশে শ্রমজীবী মানুষ পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ অবিচারের প্রতিরোধে সমাজের সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্রমান্বয়ে সাফল্য অর্জন করেছিল। গত তিন দশক সময়ে দলগুলোর ভূমিকা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে: সুবিধাভোগী বিত্তবান শ্রেণী এই সংগ্রামে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তাদের হৃত অংশ পুনরুদ্ধার করেছে। যাকে একসময় পুঁজিবাদ উচ্ছেদের, অন্ততপক্ষে পুঁজিবাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার, ঐতিহাসিক গতি মনে করা হতো, তাকে তারা কেমন করে স্তব্ধ করে পাল্টে দিতে পারল? প্রসঙ্গটি বিরাট। এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া কেবল একক ব্যক্তির নয়, সমাজবিজ্ঞানের কোনো একক শাখার সাধ্যাতীত। আমি কয়েকটি প্রাথমিক ভাবনার উল্লেখ করব।

সমাজতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জের সমাপ্তি

আমি এই অবস্থান নিয়েছি যে বিদ্যমান 'মার্ক্সীয়' সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো ছিল সমাজতন্ত্রের ধারণার বিকৃতি; সমাজতন্ত্রের ধারণা বাস্তবায়িত হওয়ার আরও অনেক মহতী পন্থার অস্তিত্ব থাকা উচিত ছিল। বিদ্যমান সমাজতন্ত্র ছিল অর্থনীতিতে নৈপুণ্যহীন, সামাজিকভাবে অরাজক, নান্দনিকতায় বন্ধ্যা এবং রাজনীতিতে নিপীড়ক। তা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসের শক্তি এবং দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিবাদী বিশ্বের সমস্যার তুলনায় বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের তৎকালীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আবেদন এতটাই আকর্ষণীয় ছিল যে ষাটের দশকের মতো অধুনাতন সময় পর্যন্ত অনেক প্রভাবশালী পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ এই ব্যবস্থাটিকে পুঁজিবাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করতেন। এই ধারণার প্রভাব পুঁজিবাদী বিশ্বের আচরণকে অনেকটা সংযত করে তুলেছিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠন, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অঙ্গীকার, বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অংশ বণ্টনের রাজনৈতিক প্রয়োজনবোধ, তৃতীয় বিশ্বের অসমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য—এ সবই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধোত্তর পূর্ব এশিয়ার সমতাবাদী ভূমি সংস্কারে দখলদারী মার্কিন সামরিক শাসন উৎসাহ জুগিয়েছিল, এমনকি জাপানের ওপর ভূমি সংস্কার চাপিয়ে দিয়েছিল। সক্ষম অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্তরের দশকে, এই ব্যবস্থার পতনের অনেক আগেই, ক্রমশ উবে যায়। সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী বিশ্বের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংযমেরও ক্রমাবসান ঘটে। শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা পরিত্যক্ত হয়, বিশ্বায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র এই শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা সমান ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মতো গোঁড়া বাজারনীতির দেশগুলোতে এর রূপ ছিল চূড়ান্ত, কিন্তু সামাজিক গণতন্ত্রের দেশগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয় বণ্টনের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার এবং শ্রমজীবীদের সুযোগ-সুবিধার সীমিত সংকোচনের চেষ্টা ছিল।

সমাজতন্ত্রের পতন উন্নয়নশীল বিশ্বেও গভীর প্রভাব ফেলে। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত এই দেশগুলোর অনেকেই বিশ্বযুদ্ধের পর অপুঁজিবাদী উন্নয়নের পথ খুঁজছিল। ভারতের মতো দেশে মুখ্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলেও সমাজতন্ত্রের প্রতি একধরনের মৌখিক আনুগত্য চালু ছিল। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিলোপের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিমুখীনতায় বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। এদের অধিকাংশ এই অসমর্থনযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের পতন ব্যাপক পুনর্বণ্টন ও সমতাবাদী নীতির পরিসমাপ্তির সূচক। সমাজতন্ত্রের পতনের এটি একটি বাড়তি নেতিবাচক ফলশ্রুতি, এমনকি 'সমাজতন্ত্র' বহুজনের কাছে একটি নোংরা শব্দে পরিণত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক ধারণায় অনুপ্রাণিত যারা বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিকৃত রূপটির সমালোচক এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমতাবাদের অনুসারী, তাদেরও বড় মূল্য দিতে হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে যেসব শক্তি দীর্ঘকাল ধরে আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পায়ন এবং রাষ্ট্রবাদী নীতির ঘোর সমালোচক ছিল, তারা অভ্যন্তরীণ উন্নয়ননীতিতে ব্যাপক মাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসার এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করল। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিশ্বায়নের সঙ্গে এসব দেশকে যুক্ত করা, বিরাষ্ট্রীয়করণকে উৎসাহিত করা, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে কমিয়ে আনা ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় এসব শক্তির মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ মিত্র খুঁজে পেল।

পুঁজিবাদের পরিবর্তিত চরিত্র

আমার প্রজন্মের যারা তরুণ বয়সে পুঁজিবাদ সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা শুরু করেছিল, তাদের কাছে এই ব্যবস্থার ভাবমূর্তি ছিল অনেকটা এ রকম: একদিকে ঝাঁক বেঁধে বিভিন্ন কারখানায় রয়েছে বিপুলসংখ্যক শোষিত শ্রমিক, অন্যদিকে গুটিকয়েক পুঁজিপতি, যাদের শোষণক্ষমতার উৎস হচ্ছে উৎপাদনযন্ত্র তথা পুঁজির নিরঙ্কুশ মালিকানা। পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপাদনযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব করায়ত্ত করার লক্ষ্যে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধই হচ্ছে পুঁজিবাদী অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল অস্ত্র।

পুঁজিবাদের এই চিত্রটি বহুকাল যাবৎ ছিল একটি অতি সরলীকরণ। সময়ের পরিবর্তনে এই চিত্রটি আরও বেশি বাস্তবতাবিবর্জিত হয়ে গেছে। এর একটি কারণ এই যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে কারখানায় নিয়োজিত শিল্পশ্রমিকদের আনুপাতিক সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সর্বোচ্চ থাকাকালীন এসব দেশে শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ছিল মোট শ্রমশক্তির অর্ধেকের কাছাকাছি। তুলনায় এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে এই হার ১০ শতাংশের কাছাকাছি, ফ্রান্সে ১৩ শতাংশ আর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে এ দিক থেকে ব্যতিক্রমী জার্মানিতে ২০ শতাংশ। কর্মসংস্থানের একটি বিশাল অংশজুড়ে এখন রয়েছে এমন সব সেবা খাত, যেখানে প্রথাগত শ্রমিক সংহতি গড়ে তোলা খুবই কঠিন। শিল্পায়নের ঐতিহাসিক পথ ধরে এগোনোর পথে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির অন্তত ৪০ শতাংশ পর্যন্ত উঠবে, এই স্বাভাবিক প্রত্যাশা পূর্ণ হচ্ছে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের সফল শিল্পায়নের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে এই সূচক ৩০ শতাংশের কাছাকাছি ওঠার পর থেকেই নিম্নাভিমুখী হতে শুরু করেছে।

পুঁজির মালিকানা ও পুঁজি থেকে উদ্বৃত্ত গ্রাস করার ক্ষমতার মধ্যে বিচ্ছেদ শুরু হয়েছে অনেক কাল আগে। আজকের পুঁজিবাদের স্টক-শেয়ারের মালিকানা বহু বিস্তৃত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় অর্ধেক পরিবার এ ধরনের মালিকানা ভোগ করে; যদিও এসব সম্পত্তির মালিকানা অত্যন্ত অসম। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের আয় প্রায়ই আকাশচুম্বী এবং এই আয়ের পরিমাণ ব্যবস্থাপকদের হাতে উদ্যোগগুলোর মালিকানার পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়। পুঁজির মালিকানা নয়, বরং পুঁজি-ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বই উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতার উৎস, যে ক্ষমতা তাদের নিজস্ব আয় নির্ধারণের প্রধান নিয়ামক। ব্যাংক, বিমা ও সংশ্লিষ্ট (finance) ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্যি; সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নিয়ন্ত্রণ শৈথিল্যের ফলে এটি আয় ও সম্পদের পুঞ্জীভবনের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্টক-শেয়ারের পরিব্যাপ্ত মালিকানা শ্রমিকশ্রেণীকে কোনো ক্ষমতায় ভূষিত করেনি, বরং নির্বিত্ত হিসেবে তাদের শ্রেণীগত সংহতিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিরন্তর জনগণকে এই ভ্রান্ত ধারণা দিচ্ছে যে, এ দেশে শ্রেণী উত্তরণের ঊর্ধ্বমুখী সচলতা অনেক বেশি। বাস্তব এই যে, স্বল্পবিত্তদের পক্ষে ওপরে ওঠা ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে কঠিন হয়ে উঠেছে। ২০১০ সালের একটি ওইসিডি (OECD) প্রতিবেদন অনুযায়ী সচলতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ইউরোপের সামাজিক-গণতন্ত্রবাদী দেশগুলোর চেয়ে অনেক নিচে, বস্তুত কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও নিচে। ব্রিটেন আর ইতালিই একমাত্র ইউরোপীয় দেশ, যেখানে শ্রেণী উত্তরণের ঊর্ধ্বমুখী সচলতা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম। সে যাই হোক, নিম্নবিত্তদের আত্মপরিচয়বোধের পরিবর্তন ক্রমবর্ধিষ্ণু বৈষম্য-সহিষ্ণুতার সহায়ক হয়েছে। মনে পড়ে জন স্টাইনবেকের গভীর অন্তর্দৃষ্টিসূচক বক্তব্য: 'আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের শিকড় পুঁততে না পারার কারণ এই যে, এখানকার দরিদ্ররা নিজেদের শোষিত নির্বিত্তশ্রেণী মনে করে না, বরং সাময়িকভাবে বিব্রত ক্রোড়পতি মনে করে।'

উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে বৈষম্য প্রশমনের গুরুত্ব হ্রাস

উন্নয়ন পরিভাষার একটি পরিবর্তন কালক্রমে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহের তুলনামূলক অগ্রাধিকারে পরিবর্তন এনেছে। সত্তরের দশকের শেষদিকে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে গ্রহণ করে। ক্রমশ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যকে বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার সপক্ষে একটি যুক্তি গড়ে ওঠে। বাস্তবে উন্নয়ননীতি প্রণয়নের আলোচনা থেকে বণ্টনবৈষম্যের প্রসঙ্গটি একেবারে উবে যায়। চীনে মাও-পরবর্তী সংস্কারবাদীদের 'সমতাবাদ ঠেকাও' ধ্বনি পর্যন্ত না গেলেও, উত্তরোত্তর কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তর্কটা এই দাঁড়িয়েছিল যে বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির সহায়ক এবং প্রবৃদ্ধি দারিদ্র মোচন ত্বরান্বিত করে; অতএব বৈষম্য-সহিষ্ণুতা প্রার্থিত হতে পারে। 'দারিদ্র্য হটাও',

'চরম দারিদ্র্য হটাও', 'দরিদ্রদের ক্ষমতা বাড়াও', 'সবার জন্য উন্নয়ন'—এই অন্তহীন স্লোগানের মিছিলে এসব লক্ষ্যের সঙ্গে বৈষম্য হ্রাসের আবশ্যিক সম্পর্কটির কথা প্রায়শই অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

৪. ভবিষ্যৎ

মহামন্দার প্রথম বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের আয় হ্রাস হয়েছিল, যেমনটি বেশির ভাগ শিল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। ২০১০ সাল থেকেই ধনীরা ধাক্কা সামলে নিয়েছে, ওয়ালস্ট্রিটের সমৃদ্ধি এবং উঁচু হারে বোনাস ফিরে এসেছে, আর সেই সঙ্গে দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। উচ্চমাত্রার বৈষম্য এ সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোগ-চাহিদার হ্রাস মন্দার একটি প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ-চাহিদায় অচলাবস্থা আয় বণ্টনের সর্বস্তরে ঘটেনি : ২০১১ সালের গোড়ায় প্রকাশিত অতিক্রান্ত ছুটির মৌসুমের তথ্য নির্দেশ করে যে অভিজাত পণ্যের বিক্রেতারা চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিল যখন সাধারণ পণ্যদ্রব্যের চাহিদা গুরুতরভাবে কমে গিয়েছিল। অর্থাৎ বিপুল বণ্টনবৈষম্য অর্থনৈতিক পুনরুত্থান ও প্রবৃদ্ধির গতিরোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশা করা সমীচীন ছিল যে নীতিনির্ধারকেরা ব্যাপক জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি ও কর্মাভাব হ্রাসের প্রতি মনোযোগী হবেন। অথচ তাঁরা পরিবর্তে এলিসের কল্পপৃথিবীতে হাবুডুবু খাচ্ছেন : রাষ্ট্রীয় দেনা কমানোর নামে সামষ্টিক চাহিদাকে আরও কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন।

বৈষম্য সহিষ্ণুতা প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে। 'নিজের দেশের চেয়ে বিশ্বের সান্নিধ্যে অধিকতর স্বচ্ছন্দ নগর' নিউইয়র্কে[৪] ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে 'ওয়ালস্ট্রিট দখল' আন্দোলনের জন্ম হয় দুঃসহ বৈষম্যের বিরুদ্ধে; ব্যাংক, বীমা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উঁচুতলার নির্বাহীদের লুণ্ঠনমূলক উদ্বৃত্ত হরণ এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বনাশ সাধনের প্রতিবাদে। তিন দশক আগে ধনিক শ্রেণী শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে যে শ্রেণী-সংগ্রাম শুরু করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম বড় মাপের পাল্টা আক্রমণ হিসেবে খুব দ্রুত এই আন্দোলন বিশ্বের অনেক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের পরিণতি সম্বন্ধে এখনো নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও, এর ফলে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য-সচেতনতা গড়ে ওঠার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ২০১২ সালে বৈষম্যের সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, প্রকাশ হয়েছে বিশিষ্ট পত্রপত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ ক্রোড়পত্র, যার কিছু নমুনা এই প্রবন্ধের সংযোজনে উল্লেখ করা হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তুলনায় আন্তর্জাতিকভাবে কম দৃশ্যমান হলেও, প্রচুর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। কৌতূহলোদ্দীপক এই যে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সর্বাধিক দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশ চীন ও ভারত যেখানে সরকার ও বিশ্বব্যাংক উভয়েরই হিসাব অনুযায়ী সাম্প্রতিক দশকগুলোতে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ড কার্যত বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে, চীনে প্রতিদিন বিচ্ছিন্ন সহিংসতার খবর শোনা যাচ্ছে। দুই ক্ষেত্রেই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মূল লক্ষ্য বৈষম্যের দুঃসহ বৃদ্ধি।

ভবিষ্যতে বৈষম্যের গতিধারা সম্বন্ধে আলোচনার আগে বর্তমানকালের আশাব্যঞ্জক কিছু ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্রের দেশগুলো তাদের সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী মোটামুটি অটুট রেখেছে, যদিও ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্বায়নের মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা যেসব পরিবর্তন গ্রহণ করেছে তাতে সর্বত্রই বৈষম্য কিছুটা বেড়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পুরোনো সামাজিক গণতন্ত্রগুলোতে আয় বণ্টনের সমতা এখনো মোটামুটি ২৫ জিনি সূচকের আশপাশে রয়েছে। এসব দেশেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু গত তিন দশকের সমস্যাগুলোর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে সীমিত রাখার লক্ষ্যে এরা একটি সামাজিক মতৈক্যে পৌঁছাতে পেরেছে। যে স্বল্পসংখ্যক পূর্ব এশীয় দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বৈষম্য পরিহারী, রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির পথ অবলম্বন করেছিল তাদেরও বণ্টনসমতার ক্ষেত্রে অল্পই পিছু হটতে হয়েছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশাপ্রদ অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা। এই অঞ্চলটি ২০০৮-০৯ সালের অর্থনৈতিক সংকট ভালোভাবেই প্রতিহত করতে পেরেছে। তুলনামূলক মানদণ্ডে বৈষম্যের মাত্রা খুব বেশি হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে বৈষম্য কমতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে এখন গবেষকদের অনুসন্ধান চলছে। প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রবণতার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে দেশে দেশে পার্থক্য থাকলেও কিছু উপাদান সর্বত্র কাজ করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নীতিনির্ধারণে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার, দরিদ্রদের সুবিধার্থে অধিকতর ব্যয় বরাদ্দ। চিলি ও ব্রাজিলের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা-সম্পর্কিত তথ্য ভালোভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে নিম্নগামিতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ইতিবাচক পরিবর্তন এই প্রবণতার সহায়ক হয়েছে।

প্রতিরোধ ও ইতিবাচক পরিবর্তনের পদক্ষেপগুলো কি তিন দশকের বৈষম্য-প্রবণতাকে শেষ পর্যন্ত রোধ করতে এবং পালটে দিতে পারবে? যদি পারে তবে তখনকার পরিবর্তিত চেহারাটা কেমন হবে? স্বল্পতর বৈষম্যের সমাজে বিবর্তনের পথের বিস্তৃত বিবরণ এবং তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতির খুঁটিনাটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অর্থহীন। বরং উপসংহারে এমন কয়েকটি প্রধান বিষয়ের ওপর দৃষ্টিক্ষেপ করতে চাই বৈষম্য হ্রাসের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ণয়ে যা নিয়ে ভাবনা অপরিহার্য।

সাবেকী মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন গ্রহণযোগ্য বিকল্প নয়

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে, যেমনটি প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে, এই বিকল্পটি মোটের ওপর পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশে এই লক্ষ্য অর্জনের অবাস্তব প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নেপালে মাওবাদী অভ্যুত্থান এবং ভারতের নানা

৪. নিউইয়র্ক সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি টোনি জাড রচিত *Memory chalet* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

ধরনের গণবিদ্রোহ থেকে শুরু করে অনেক দেশে বিদ্যমান মার্ক্সবাদী দল ও উপদলের মধ্যে এর প্রভূত উদাহরণ রয়েছে। এরা যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পেরেছে তার প্রমাণ সামান্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছে ব্যবস্থাটির অভ্যন্তরীণ অসংগতিকে নয়, বরং অতীতের পরিহারযোগ্য ভুলভ্রান্তিকে, সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে, যেন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পূর্বশর্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদের সদাশয় প্রশ্রয়! দক্ষিণ এশিয়ার এ ধরনের কিছু কিছু দলের সদস্যদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে কোনো অকল্পনীয় পথে তারা যদি নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে তবে যৌথ কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প ও সেবা খাতের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং আমলা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মতো নীতিগুলো সম্বন্ধে তারা কী করবে, তবে তাদের উত্তরে নতুন ভাবনার চিহ্ন থাকে অতি সামান্য; প্রায় অনিবার্যভাবেই তাদের উত্তর হয় যে তারা একই নীতি প্রয়োগ করবে, যদিও প্রয়োগের পন্থায় অতীতের ভুলভ্রান্তি পরিহার করা হবে, যেমন সহিংস বলপ্রয়োগের পরিবর্তে যুক্তি ও আলোচনার ব্যবহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা স্বীকার করে যে গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যানের নীতিটি ভুল ছিল; কিন্তু বাজারব্যবস্থার বিলোপ নিয়ে তাদের অনুশোচনার চিহ্ন বিরল। ভবিষ্যতে এই মার্ক্সবাদীদের পক্ষে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা সামান্য। কিন্তু অবাস্তব লক্ষ্যের পেছনে ছোটা অকারণ শক্তিক্ষয়। বড় মাপের সংগঠিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ধরনের শক্তিক্ষয় পরিহারযোগ্য সামাজিক অপচয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, মূলধারার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া নেপালের মাওবাদীদের পক্ষে একটি সদর্থক পদক্ষেপ। একই কথা ভারতের বিদ্রোহী আন্দোলনগুলো সম্বন্ধেও সত্যি, বৈষম্য ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের আত্মত্যাগ দৃষ্টান্তমূলক, কিন্তু অতীতের বিপ্লবের অসার্থকতার কারণ সম্বন্ধে তারা যথার্থ উপলব্ধি অর্জন করেছে এমন নিদর্শন অতি সামান্য।

বিংশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ—এরিক হব্‌স্‌বমের ভাষায় 'সংক্ষিপ্ত বিংশ শতাব্দী'—জুড়ে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের চেহারা নানা দেশে নানা রকম হলেও, তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল: আমলা পরিচালিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে বাজারের জায়গায় প্রতিস্থাপন, উৎপাদনশীল সম্পদের ওপর একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় ও যৌথ মালিকানা এবং একদলীয় শাসনব্যবস্থা। যৌথ মালিকানাধীন উদ্যোগ, ভোক্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার যে বিকল্প সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব তিরিশের দশকে উদ্ভাবিত হয়েছিল তা অসম্পূর্ণ নীল-নকশা হিসেবে রয়ে গেছে, বাস্তবায়নের চেষ্টা আজও হয়নি। অতীতের সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষাগুলো যেভাবে অপযশের গর্তে তলিয়ে গেছে তাতে এ জাতীয় তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যে বিশাল সংগঠিত উদ্যম প্রয়োজন তা কল্পনা করা কঠিন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে বৈষম্য হ্রাসের পথ খোঁজা নিরর্থক

আমাদের যে প্রজন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দশকগুলোতে পুঁজিবাদকে একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শনাক্ত করে তার বিকল্প অনুসন্ধান করা শুরু করেছিল, তাদের কাছে এটি একটি পরাভব-জ্ঞাপক উপলব্ধি মনে হতে পারে। কিন্তু এটা নিতান্তই বাস্তবের স্বীকৃতি, মতবাদ-প্রণোদিত পছন্দ নয়। বাস্তব কাঠামোকে অস্বীকার করে, বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক ক্রিয়াকর্মে বিকল্পের সন্ধান অথবা বাস্তব ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদক কোনো কল্পলোকি বিকল্পের অন্বেষণ কোনো কাজের কথা নয়। একে পুঁজিবাদকে পাশ কাটানোর লেনিনবাদী মাওবাদী প্রয়াসের শতাব্দী বিলম্বিত সংশোধন মনে করে সান্ত্বনা খোঁজা যেতে পারে। পুঁজিবাদ ইতিহাসের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যাকে পাশ কাটানো অসম্ভব। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ফলাফল 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'-এর বেশি কিছু নয়।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেকগুলো বিকল্প রূপের মধ্যে প্রার্থিত সমাজব্যবস্থার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা সম্ভব, এই ভাবনার মধ্যে হতাশা অতিক্রম করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পূর্বোল্লিখিত উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে বণ্টনসমতা, মানবিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে, সমস্ত সমাজব্যবস্থার মধ্যে, সামাজিক গণতন্ত্রের অর্জন সর্বাধিক। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা এবং বাজারের মতো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, জনগণের জন্য মৌলিক সেবাসমূহের সংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সংরক্ষণ, শ্রেণী উত্তরণ সচলতার প্রাতিষ্ঠানিকতা বিধান ইত্যাদির লক্ষ্যে শক্তিশালী সামাজিক তত্ত্বাবধান আরোপ করা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিশাল ব্যাপ্তির ব্যয় নির্বাহ হয় উচ্চপ্রান্তিক হারে করারোপের মাধ্যমে। ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক মতৈক্যের শক্ত ভিত্তির ওপর। ব্যবস্থাটি অসংখ্য সমস্যার মুখে অবিচল থেকে, সমতাবাদী লক্ষ্য অক্ষুণ্ন রেখে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় নিজস্ব সক্ষমতা বজায় রেখেছে।

জাপানে এবং কিছু পূর্ব এশীয় দেশে পুঁজিবাদের আরও একটি রূপভেদ আছে যাকে সামাজিক গণতন্ত্রের শ্রেণীতে ফেলা যায় না, কিন্তু যেখানে তুলনামূলকভাবে আয়ের সমতাবাদী বণ্টন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে বেশ কিছু পূর্বশর্ত পালনের ফলে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সমাজের শ্রমক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান, পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমজীবীদের মজুরি ও সুবিধা বৃদ্ধির ঐতিহ্যের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়েই সম্পদের, বিশেষত জমির ব্যাপক পুনর্বণ্টন এবং মানবসম্পদ বিকাশের বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি।

সমবায়মূলক মালিকানা, ক্ষুদ্রায়তন উদ্যোগের বাধা অতিক্রম করার রাষ্ট্রীয় সহায়তার পটভূমিকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও সেবার প্রসার—ইত্যাদি নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে। পরিশেষে স্মরণযোগ্য যে লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় পুনর্বিন্যাসের মতো 'নিরীহ' নীতি অনুসরণ করে কোনো রকম অভ্যুত্থান ছাড়াই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য হ্রাস সম্ভব। ব্যবস্থাটির কার্যক্রমে আরও বড় ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চয়ই আরও দ্রুত হারে সমতা অর্জন সম্ভব।

সমতাবাদী পরিবর্তনের জন্য ভবিষ্যতে সমাবেশের ভিত্তি পাল্টাতে হবে

পুঁজিবাদের পরিবর্তিত চরিত্র পুঁজিবাদী অবিচারের প্রতিরোধে সমাবেশেও পরিবর্তনের প্রয়োজন নির্দেশ করে। 'শেকল ছাড়া হারাবার মতো' আছে আরও অনেক কিছু আজকের শ্রমিকশ্রেণীর। উনিশ এবং বিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের যে অগ্রণী ভূমিকা তাদের ওপর আরোপিত ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর আত্মপরিচয় বোধের গভীর পরিবর্তন তার ভিত্তি নষ্ট করে দিয়েছে। আজকের দিনে অধিকাংশ পুঁজিবাদী সমাজেই আয় বণ্টনে গুণগত পরিবর্তনের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐক্যবদ্ধ জোট আদৌ সম্ভব কিনা তা নির্ণয় করা কঠিন। ছোট পরিসরে প্রান্তিক পরির্তন আনা হয়তো সম্ভব, কালক্রমে এ ধরনের পরিবর্তনের ক্রমসঞ্চয় বৃহৎ পরির্তনের আকার নিতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে ব্যাপক গণসমাবেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; ২০১১-এর 'আরব বসন্ত' এর উদাহরণ। এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে উদ্ভূত সমাজটি যে সহজে সম্পদ, আয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনের ব্যাপারে একমত হবে তার সম্ভাবনা অনিশ্চিত।

বৈষম্য প্রশমনে কর্মসংস্থানের কেন্দ্রস্থ ভূমিকা

'কাজ করতে চাওয়া মানুষের কর্মাভাব সম্ভবত ভবিতব্য নির্ধারিত বৈষম্যের সবচেয়ে বিষণ্ন দৃশ্য', দেড় শ বছর আগে টমাস কার্লাইল প্রথমবার বলার সময় কথাটি যতটা সত্যি ছিল আজও ঠিক ততটাই আছে। সমতা ও দ্রুত প্রবৃদ্ধির যুদ্ধোত্তর দশকগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্ণ কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি। আমি যাকে শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের নেতৃবর্গ কর্তৃক পরিচালিত শ্রেণীযুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছি তার ফলে এই প্রতিশ্রুতি পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে কেইন্‌সের অনুবর্তীরা 'আয় বণ্টন নীতি'র মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির সামষ্টিক স্থিতিশীলতার সামঞ্জস্য বিধানের যে চেষ্টা করছিলেন তাকে প্রতিস্থাপন করা হলো 'সহজাত কর্মাভাবের' তত্ত্ব দিয়ে। আমার প্রজন্মের মূলধারার অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে গেছে। উনিশ শতকের যে রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধটির শুরু হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা এখন সে দেশের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে ব্যাপক কাটছাঁট করতে ব্যস্ত। যদিও মুষ্টিমেয় খালি পদের জন্য শত শত বেকারের লাইন তাকালেই চোখে পড়ে, তবু তাঁরা 'কর্মবিমুখ বেকারদের' কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় মগ্ন হয়ে এসব 'সংস্কারে' ব্যস্ত।

পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে আনা জরুরি। কর্মসংস্থানের উঁচু হার এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তার সমাধান করা উচিত 'আয় বণ্টন নীতি'র মতো সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে, বেকারত্বের অস্ত্রধারী পুঁজিপতিদের শ্রেণী-সংগ্রাম দিয়ে নয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে সমগ্র জনশক্তির জন্য শোভন জীবনযাপনের উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে হলে কর্মসংগঠন, প্রশিক্ষণ, বাণিজ্য এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

গণতন্ত্র সমতাবাদ সহায়ক

বৈষম্য বৃদ্ধি রোধে লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক সাফল্য ওই মহাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাছে ঋণী। নিছক নির্বাচনিক ধারণাকে ছাপিয়ে এই গণতন্ত্র এমন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে যা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। পৃথিবীর অনেক দেশেই গণতন্ত্রের পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক। চীনের মতো দেশে সহজে শনাক্তযোগ্য হলেও গণতন্ত্রের অনতিলক্ষ্য অনুপস্থিতি বহুব্যাপ্ত। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন জনগণকে ক্ষমতাসীন সরকারকে অপসারিত করার সামর্থ্য দিয়েছে, কিন্তু ভিন্ন নামের ছত্রচ্ছায়ায় একই অপশক্তিসমূহের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিহত করার সামর্থ্য দেয়নি। দরিদ্র ও 'নিচু' জাতের জনগোষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে ভারতের গণতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের নানা কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কংগ্রেসের উভয় দলের সদস্যদের ওপর বিত্তবান শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ; 'যুদ্ধোত্তর দশকগুলোতে যে সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্রমোন্নত সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিল', সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সেই একই কোর্টের 'দক্ষিণপন্থী হিম বৃষ্টির' দিক পরিবর্তন;[৫] সর্বোপরি দরিদ্র গোষ্ঠীসমূহের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের নির্লজ্জ চলমান প্রয়াস। গণতন্ত্রের অবক্ষয় যেমন বৈষম্য বর্ধক, তেমনি গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন গ্রহণযোগ্য সমতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

বিশ্বায়ন শত্রু নয়

বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে কখনো কখনো বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়। এটি একটি বিরাট ভ্রান্তি। উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববাজার শ্রমনিবিড় রপ্তানি ও উৎপাদনের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে বৈষম্য-পরিহারক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। গত দুই দশকের বিশ্বায়নের কালে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে বাস্তবক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি হওয়ার কারণ আমরা আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত এই ফলশ্রুতি মোটেও অনিবার্য ছিল না। বিশ্বায়ন যে প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে পরিবর্তনকালীন সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যেন বিশ্বায়নের চাপে সৃষ্ট অবাধ বাণিজ্য উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে না ওঠে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক 'শিশুশিল্প' আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করতে সময় নেয়। বিবর্তনকালে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা না দিতে পারলে তাদের পক্ষে সাবালক হয়ে ওঠা এবং আন্তর্জাতিক সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। বিশ্বায়িত বাজারে যুক্ত হওয়ার পথে শিশুশিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদানের অধিকার অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। কিন্তু বিশ্বায়নকে বর্জন করে আমদানি-প্রতিস্থাপক ব্যবস্থার অসাম্য এবং অনৈপুণ্যকে বরণ করা অর্থহীন।

---

৫. উদ্ধৃতিটি Ronald Dworkin এর *Is Democracy Possible Here* গ্রন্থ থেকে।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্বায়ন ও অবাধ বাণিজ্যের ফলে শিল্পোন্নত দেশে তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল শ্রমিকদের আয় হ্রাস পাবে এবং তুলনামূলকভাবে অপর্যাপ্ত পুঁজির আয় বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবে এ ধরনের প্রবণতার সপক্ষে কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এই প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে তবে উন্নত দেশে, বিশেষভাবে শ্রমজীবীরা, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধাচরণে আরও সবাক হবে। বিশ্বায়নের এই সম্ভাব্য বাধা দূর করার জন্য ধনী দেশগুলোর কিছু পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। প্রশিক্ষণ দ্বারা শ্রমজীবীদের দক্ষতা বাড়ানো এবং উৎপাদন কাঠামোকে অধিকতর পুঁজি-নিবিড়তা ও দক্ষতা-নিবিড়তার দিকে পরিচালিত করা এ ধরনের পদক্ষেপের অন্যতম উদাহরণ।

তথ্যসূত্র

জিনি সূচকগুলো নেওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংক, আমেরিকান সেন্সাস ব্যুরো, সিআইএ এবং অন্যান্য উল্লিখিত উৎস থেকে। এসব তথ্য উদ্ধারের সহজ উপায় গুগলে এদের ওয়েবসাইটগুলো খোঁজা। বুরগুইনোঁ-মরিসনের রচনাটি ২০০২ সালের *American Economic Review*-তে পাওয়া যাবে। লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক বৈষম্য হ্রাস-সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যাবে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের *Wider Angle* নামক পত্রিকায়। বাংলাদেশের বৈষম্য সম্পর্কে আমার কিছু গবেষণার বিবরণ পাওয়া যাবে ২০০১ ও ২০০৬ সালের Bangladesh Development Studies-এ প্রকাশিত বিনায়ক সেনের সঙ্গে আমার যৌথ নিবন্ধে। উল্লিখিত অন্যান্য অধিকাংশ উপাত্ত বিশ্বব্যাংকের *World Development Indicators*-এর বিভিন্ন সংখ্যায় পাওয়া যাবে।

বৈষম্যের সূচক

Wikipedia-র 'List of Countries by Income Inequality' নামের নিবন্ধ থেকে কয়েকটি দেশের জন্য বৈষম্য পরিমাপের তিনটি সূচক নিচে উদ্ধৃত হলো। (নিবন্ধটিতে উল্লিখিত উপাত্ত থেকে নিম্নোক্ত কোনো কোনো উপাত্ত ভিন্ন এই কারণে যে সেগুলো ভিন্ন কোনো বছরের বা ভিন্ন কোনো উৎস থেকে গৃহীত।) :

দেশ	দশাংশ অনুপাত	পঞ্চমাংশ অনুপাত	জিনি সূচক
সুইডেন	৬.২	৪.০	২৩.০
দক্ষিণ কোরিয়া	৭.৮	৪.৭	৩১.৪
ইন্দোনেশিয়া	৭.৮	৫.২	৩৬.৮
যুক্তরাষ্ট্র	১৫.৯	৮.৪	৪৫.০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৩.১	১৭.৯	৬৫.০

'দশাংশ অনুপাত' শীর্ষক কলামে দেখানো হয়েছে সবচেয়ে ধনী দশাংশ মানুষের আয় সবচেয়ে দরিদ্র দশাংশ মানুষের আয়ের তুলনায় কতগুণ বেশি। 'পঞ্চমাংশ অনুপাত' কলামে দেখানো হয়েছে সবচেয়ে ধনী পঞ্চমাংশের আয় সবচেয়ে দরিদ্র পঞ্চমাংশের আয়ের তুলনায় কতগুণ বেশি। শেষ কলামটিতে করাদো জিনি (Corrado Gini 1884-1965) নামের ইতালীয় পরিসংখ্যানবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত সূচকটি দেখানো হয়েছে; উদ্ভাবকের নামাঙ্কিত এই জিনি সূচকটি সম্ভবত বৈষম্য পরিমাপের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

প্রথম দুটি কলামের অনুপাত দুটি প্রায়ই বৈষম্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়; এগুলো সহজবোধ্য কিন্তু পরিমাপক হিসেবে দুর্বল। এদের ভিত্তি কেবল দুটি চরম আয়ের গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা। দশাংশ অনুপাতটি মধ্যবর্তী আটটি দশাংশকে এবং পঞ্চমাংশ অনুপাতটি মধ্যবর্তী তিনটি পঞ্চমাংশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। সামগ্রিক আয় বণ্টনের বিচার সবার আয়ের তুলনার ওপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত। তা না করার সমস্যাটির উদাহরণ : দশাংশ অনুপাত অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সমকালীন আয়-বৈষম্য তুলনীয়, যদিও মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য বিচার এই যে দক্ষিণ কোরিয়া ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে সমতাবাদী। দশাংশ অনুপাতের সীমাবদ্ধতার কারণ এই যে এই সূচকটি আয়গোষ্ঠীর ব্যাপক অংশকে অগ্রাহ্য করেছে। জিনি সূচক এ ক্ষেত্রে বৈষম্যের পার্থক্য সঠিকভাবে পরিমাপ করেছে। সূচকটির ভিত্তি হচ্ছে প্রতিটি আয়গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিম্নতর ও উচ্চতর আয়গোষ্ঠীর তুলনা।

জিনি সূচকের মাত্রাটি বিচার করার সহজবোধ্য একটি চেষ্টা করা যেতে পারে। এই সূচক অনুযায়ী শূন্য হচ্ছে চূড়ান্ত বৈষম্যহীনতা (যখন সবার আয় সমান) এবং ১ বা ১০০ হচ্ছে চূড়ান্ত বৈষম্য (যখন একজন সমস্ত আয়ের অধিকারী এবং সমাজের বাকি সবার কোনো আয় নেই)। এই পরিমাপ অনুপাত হিসেবে দেখালে এর সীমা শূন্য থেকে এক পর্যন্ত হয় এবং (অনুপাত ১০০ দিয়ে গুণ করে) সূচক হিসাবে দেখালে শূন্য থেকে ১০০ পর্যন্ত। আমরা এই প্রবন্ধে সূচকের পরিমাপ ব্যবহার করেছি, ইচ্ছা করলে অনুপাতের পরিমাপও ব্যবহার করতে পারতাম, সে ক্ষেত্রে ওপরের তালিকায় সুইডেনের জিনি হতো ০.২৩, যুক্তরাষ্ট্রের ০.৪৫ ইত্যাদি।

বৈষম্য-সূচক বিচারের মানদণ্ড—কোনটা কেমন অসম বলে বিচার করা উচিত—ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। আমার বিচারে, ওপরের তালিকার জিনি সূচকের মানদণ্ডে, সুইডেন সমতার পরাকাষ্ঠা, দক্ষিণ কোরিয়া উঁচুমাত্রায় সমতাবাদী, ইন্দোনেশিয়ার সমতা বা অসমতা মাঝারি মাপের, যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্য ব্যাপক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্য দুঃসহ।

বৈষম্যবিষয়ক সাম্প্রতিক প্রকাশনার কয়েকটি উদাহরণ

গত দু-এক বছরে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্বন্ধে গবেষণা এবং প্রকাশনার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছে এমন তিনটির উল্লেখ করছি। Timothy Noah রচিত *The Great Divergence* একটি সহজবোধ্য কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থ; বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্য এবং এর নিরসনের উপায়। Joseph Stiglitz-এর *The Price of Inequality* বৈষম্যের প্রবৃদ্ধি বিরোধিতা এবং সামাজিক অবিচার সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত আলোচনা। পুঁজিবাদ, বিশ্বায়ন এবং বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা *The Economist* সাপ্তাহিকটি ১৩ অক্টোবর সংখ্যায় 'For Richer For Poorer' শিরোনামে একটি দীর্ঘ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। বিশ্বের সব অঞ্চলে অসাম্যের সাম্প্রতিক গতিবিধি এবং তার রাশ আটকানোর উপায় এর আলোচ্য বিষয়।

পরিভাষা

পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত বিধি অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের প্রয়োজন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, 'দক্ষ' শব্দটি ইংরেজি skilled এবং efficient দুটি শব্দেরই স্বীকৃত প্রতিশব্দ। কিন্তু অর্থনীতিশাস্ত্রে efficiency-র একটি বিশেষ অর্থ আছে। আমি skilled-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'দক্ষ' (যেমন skilled worker, দক্ষ শ্রমিক) এবং efficient-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিপুণ' (যেমন productive efficiency, উৎপাদন নৈপুণ্য) ব্যবহার করেছি। Unemployment-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'বেকারী' বহুল ব্যবহৃত। আমার মনে হয়েছে যে দৈনন্দিন ব্যবহারে 'বেকারী' শব্দটি দিয়ে চাকরির (মজুরি শ্রম) অভাব বোঝানো হয়। আমি সব ধরনের উৎপাদন কর্মের অভাব অর্থে unemployment-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'কর্মাভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছি। এ ধরনের আরও কিছু শব্দের ভাষান্তর নিচে উল্লেখ করা হলো :

Actually Existing Socialism	(বাস্তবে) বিদ্যমান সমাজতন্ত্র
Aggregate Demand	সামষ্টিক চাহিদা
Billionaire	শতকোটি পতি
Financial Institution	অর্থায়ন সংস্থা
Incomes Policy	আয় বণ্টননীতি
(International) Competitiveness	(আন্তর্জাতিক) প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা
Natural Monopoly	স্বভাবজ একচেটিয়া উদ্যোগ
Primitive Capital Accumulation	প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়
Production Possibility Frontier	উৎপাদন সম্ভাবনার প্রান্তসীমা
Proletariat	নির্বিত্ত
Social Democracy	সামাজিক গণতন্ত্র

পরিশেষে উল্লেখ্য যে এই শব্দগুলোর ব্যবহারে মৌলিকতা দাবি করা হচ্ছে না। এর অধিকাংশের ব্যবহার ইতিপূর্বে অন্যরাও করেছেন বা করে থাকবেন। যেহেতু এই শব্দগুলোর বিকল্প সমার্থক প্রয়োগ প্রায়শই চোখে পড়ে, তাই আমার ব্যবহৃত ব্যতিক্রমের প্রধান উদাহরণগুলোর একটি তালিকার প্রয়োজন বোধ করেছি।

রাজনীতি

বাংলাদেশে গণতন্ত্র
প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ

আলী রীয়াজ

বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংকটাপন্ন বা সংকটাপন্ন হতে পারে—এ ধরনের কথা আমরা অহরহই শুনে থাকি। দেশের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলই শুধু নয়, বিশ্লেষক ও সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের সদস্যরা এ ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন। কমবেশি সবাই বলেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র টেকসই হয়নি বা তার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত নয়। দুই দশকের বেশি সময় ধরে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকলেও কোনো রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মতো গণতন্ত্র যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেটা সহজেই লক্ষণীয়। গণতন্ত্রের এই সংকট বা সম্ভাব্য সংকটের বিষয়টি যে কল্পনাপ্রসূত নয়, তা-ও বোধগম্য। এই বক্তব্যের পেছনে যুক্তি ও উদাহরণের অভাব হবে না। ২০০৬ সালে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভঙ্গুরতার একটা বড় উদাহরণ। অন্যান্য সূচকের মধ্যে রয়েছে পার্লামেন্টের অকার্যকারিতা, আইনের শাসনের অভাব, বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেহেতু বিশেষ কোনো একটি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সেহেতু বিশ্লেষকেরা যথাযথভাবেই দাবি করেন যে এগুলো দেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অব্যাহত আইনবহির্ভূত হত্যা এবং এ ধরনের কাজে যুক্ত অপরাধীদের দায় থেকে অব্যাহতি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের দুর্বলতার একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ। সাম্প্রতিক কালে 'নিখোঁজ' বা 'গুম' হওয়ার ঘটনার শঙ্কাজনক বৃদ্ধিও এই লক্ষণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক শ্রেণী, দল-নির্বিশেষে, এসব বিষয় চিহ্নিত করা এবং তা মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণে অনুৎসাহী।

বাংলাদেশের মানুষ যে গণতন্ত্রাকাঙ্ক্ষী, এ বিষয়ে সংশয় থাকার কোনো কারণ নেই। এ দেশের গণতন্ত্রাকাঙ্ক্ষী মানুষের অধিকারের প্রতি পাকিস্তানি শাসকেরা সম্মান জানাতে

ব্যর্থ হয়েছে বলেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে কমপক্ষে তিনটি সুস্পষ্ট সূচক এই গণতন্ত্রাকাঙ্ক্ষার প্রমাণ বহন করে: অসংখ্য রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সময়ে গণ-আন্দোলন এবং জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ। এই আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট অব্যাহত রয়েছে বলেই আমরা একমত হতে পারি।

এই পটভূমিকায় বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশে বিরাজমান 'গণতন্ত্র'-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। আমি এই যুক্তি তুলে ধরব যে বিরাজমান ব্যবস্থায় 'অগণতান্ত্রিক' বলে সহজে শনাক্তযোগ্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য একটি বিশেষ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ (Defective) গণতন্ত্রের লক্ষণ। যদিও এই বিশেষ ধরনের 'গণতন্ত্র' গণতন্ত্রায়ণ (Democratization) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উদ্ভূত হয়েছে। তবু তা গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়ার একটি স্তর কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এই প্রবন্ধে গত দুই দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির বর্ণনা উপস্থাপন করা আমার লক্ষ্য নয়। বরং, আমার লক্ষ্য হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বিষয়ে ভূয়োদর্শনলব্ধ উপাত্তের (Empirical Data) ভিত্তিতে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিচার করা।

আমার বক্তব্য অনুধাবনের জন্য গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়ণ, বিশেষত গণতন্ত্রায়ণ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে গত এক দশকে বিপরীত স্রোতে গণতন্ত্রের যাত্রা (Reverse wave) বিশ্লেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।[১] বিশেষ করে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থার উত্থান, যাকে বিশ্লেষকেরা হাইব্রিড রেজিম বলে বর্ণনা করছেন। এই আলোচনায় আমি এ ধরনের শাসনকে 'সংকর শাসনব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করব। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিষয়ে আলোচনায় এই সংকর শাসনব্যবস্থার প্রসঙ্গটি সোপান হিসেবে বিবেচিত হবে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

গণতন্ত্রের কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। কেননা, কাল ও স্থানভেদে গণতন্ত্রের পার্থক্য ঘটে। সহজ ভাষায়, যেকোনো দুটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ফারাক লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞার প্রশ্নটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচিত ও বিতর্কিত। কয়েক দশক ধরে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়ণ-বিষয়ক গবেষণা, আলোচনা ও পর্যবেক্ষণে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানে, বিশেষত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, গণতন্ত্রের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনার মধ্যে দুটি প্রধান ধারা রয়েছে। এর একটি ধারায় গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে, যা নির্দিষ্ট 'নির্বাচনী' ও 'পদ্ধতিগত' মানদণ্ড (বা নির্ণায়ক) অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অন্য ধারাটিতে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়ণকে সমাজে কতগুলো সঠিক গণতান্ত্রিক 'সাংস্কৃতিক' উপাদান অর্জিত হওয়ার নিরিখে বিবেচনা করা হয়। পদ্ধতিগত গণতন্ত্রের ধারণার জনক জোসেফ সুম্পিটারকে বলা যেতে পারে। সুম্পিটারের ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ *ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি*-এর (সুম্পিটার, ১৯৪৬/১৯৫০) লক্ষ্য হচ্ছে, গণতন্ত্র-সম্পর্কিত 'অস্পষ্ট ধারণা' থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থাকে পরিমাপ করা যায়, এমন সব সুস্পষ্ট নির্ণায়ক চিহ্নিত করা। তিনি গণতন্ত্রকে বর্ণনা করেন নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা হিসেবে। সুম্পিটার লিখছেন:

> The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for people's vote. (সুম্পিটার, ১৯৫০: ২৬৯)।
>
> (গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে।)

সহজ ভাষায় সুম্পিটারের কাছে গণতন্ত্র হলো, যারা সিদ্ধান্ত নেবে, তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা (সুম্পিটার, ১৯৫০: ২৯৬)। এই সংজ্ঞায় পদ্ধতিগত দিকটিই যে প্রাধান্য পেয়েছে, তা সহজেই লক্ষণীয়।

গণতন্ত্রের এই পদ্ধতিগত ধারণাকে রবার্ট ডাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *পলিয়ার্কি: পার্টিসিপেশন অ্যান্ড অপজিশন*-এ বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করেন। ডাল যে ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন, সেটাকে তিনি বর্ণনা করেন 'পলিয়ার্কি' বা 'বহুজনের শাসনব্যবস্থা' হিসেবে। রবার্ট ডাল (১৯৭২) পদ্ধতিগত গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্ধারকের তাগিদ দিয়ে বলেন যে বহুজনের শাসনব্যবস্থার কতগুলো মৌলিক উপাদান রয়েছে। সেগুলো হলো: সরকারে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা থাকা; নিয়মিত, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন; সব পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; সরকার বা কোনো একক গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন উৎসের বিকল্প থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ এবং সংগঠনের স্বাধীনতা। ডালের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে বহুজনের শাসন হলো শাসনব্যবস্থার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। ডালের এই সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিস্তর সমালোচনা থাকলেও এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গুণাগুণ বিচারে এগুলোই সবচেয়ে ব্যবহৃত মাপকাঠি। সুম্পিটার ও ডালের এই মাপকাঠিকে গণতন্ত্রের পদ্ধতিগত (Procedural) এবং সবচেয়ে সীমিত (Minimalist) সংজ্ঞা বলা হয়ে থাকে।

পদ্ধতিগত এই সংজ্ঞার বিপরীতে অনেকেই সাংস্কৃতিক দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনের ওপর জোর দেন। গত কয়েক দশকে অনেক দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সমস্যা বিদ্যমান থাকার ফলে নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রের বদলে অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার তাগিদ সৃষ্টি হয়। এই ধারণার প্রবক্তারা নাগরিকদের অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নির্ধারকের জায়গায় স্থান দেওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ল্যারি ডায়মন্ড (ডায়মন্ড, ১৯৯৩, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৮)। তিনি বলেন, নির্বাচনী গণতন্ত্রের (Electoral Democracy) ওপর গুরুত্বারোপের ফলে গণতন্ত্রের সাফল্যের ব্যাপারে যে বিভিন্ন ধরনের চিত্র রয়েছে, তা ঠিক বোঝা যায় না। তাই তিনি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সুশীল সমাজ ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের বিষয় বিবেচনায় নিতে বলেন। ডায়মন্ড

ও অন্য গবেষকদের (যেমন : চ্যান্ডলার, ২০০০) দেওয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে গণতন্ত্রের সম্প্রসারিত সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গণতন্ত্র সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাকে আমরা আরও দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। তা হলো : আদর্শিক (Normative) এবং ভূয়োদর্শনলব্ধ (Empirical)। প্রথম ধারা বলে গণতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, দ্বিতীয় ধারা ব্যাখ্যা করে কার্যত গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করে। তা ছাড়া গণতন্ত্রের সীমিত সংজ্ঞা ও পরিবর্ধিত সংজ্ঞার পার্থক্যকে অনেকে ব্যাখ্যা করেন গণতন্ত্র একটি শাসনব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র একগুচ্ছ মূল্যবোধ—এই দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গির তফাত হিসেবে।

গণতন্ত্রসংক্রান্ত এই দুই ধরনের ধারণার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা একেবারে হয়নি তা নয়, বরং অনেকের ধারণা, এই দুই ধারণার সমন্বয়েই আমরা কতগুলো নির্ণায়ক তৈরি করতে পারি, যা একটি দেশের গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিচারে সাহায্য করতে পারে। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলে বিবেচনা করা যায়। এগুলো হলো : ১. সর্বজনীন ভোটাধিকার; ২. আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদের জন্য নিয়মিত, অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন; ৩. মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতাসহ সব ধরনের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি সম্মান এবং আইনের শাসন, যার আওতায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও নাগরিক আইনিভাবে প্রকৃত অর্থেই সমানভাবে বিবেচ্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি পক্ষপাত সীমিত সংজ্ঞার প্রতি থাকলেও, এটা জোর দিয়ে বলা আবশ্যক যে এই তিনটি উপাদান পরস্পর সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে এর একটি উপাদানের সাফল্য গণতন্ত্রের আংশিক সাফল্যের পরিচায়ক নয়। গণতন্ত্রের জন্য এই তিনটি উপাদানকে সমভাবে কার্যকর থাকতে হবে এবং সাফল্য লাভ করতে হবে। তা ছাড়া এই উপাদানগুলোকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না; বিবেচনা করতে হবে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে।

গণতন্ত্রায়ণ

কোনো দেশে গণতন্ত্র থাকা অথবা না-থাকা কোনো নিশ্চল বিষয় নয়। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দীর্ঘদিন ধরেই এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে কীভাবে একটি দেশ অগণতান্ত্রিক অবস্থা (বিভিন্ন ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসন, যেমন সামরিক আইন) থেকে গণতন্ত্রে উত্তরিত হয়। প্রশ্নগুলো সহজ ভাষায় বললে : কেন কিছু দেশ গণতান্ত্রিক এবং কিছু দেশ গণতান্ত্রিক নয়? কী করে একটি অগণতান্ত্রিক দেশ 'অগণতন্ত্র' থেকে 'গণতন্ত্রে' যেতে পারে? শেষ প্রশ্নের উত্তরের বিষয়টি গণতন্ত্রে উত্তরণ-প্রক্রিয়া বা গণতন্ত্রায়ণ বলে বর্ণনা করা হয়।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের (Modernization Paradigm) আলোকে গণতন্ত্রায়ণ-সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেশি (লিপসেট, ১৯৫৯; এলমন্ড ও ভারবা, ১৯৬৩; মুর, ১৯৬৩)। যদিও লিপসেট তাঁর আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে (যেমন : নগরায়ণ, সম্পদ ও শিক্ষা) 'আবশ্যক' (Requisite) বলেছেন, 'পূর্বশর্ত' (Pre-requisite) বলেননি। পরবর্তী আলোচনায় এগুলো পূর্বশর্ত বলে বিবেচনা করা হতে থাকে।[২] এমনকি ১৯৯০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত আমরা এই ধারায় ভূয়োদর্শনলব্ধ গবেষণা (Empirical Study) পরিচালনা হতে দেখি (যেমন : ভ্যানহানেন, ১৯৯৭)। বাস্তবে ১৯৭০-এর দশকে এসে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধারা তৈরি হয় তখন এই যুক্তি কার্যত বাতিল হয়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে দক্ষিণপন্থী একনায়কত্বের অবসানের মধ্য দিয়ে যে ধারার শুরু, ১৯৮০-র দশকে লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর এশিয়ায় তার প্রভাব রাখে এবং দশকের শেষ নাগাদ পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলো, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নেও এর বাতাস লাগে। অব্যাহতভাবে দেশে দেশে একনায়কি শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সামরিক শাসন, একদলীয় ব্যবস্থা ইত্যাদির বদলে নির্বাচিত সরকারের উত্থানকে ১৯৯১ সালে স্যামুয়েল হান্টিংটন বর্ণনা করেন 'গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ' (Third Wave of Democracy) বলে (হান্টিংটন, ১৯৯১)। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সাফল্য এবং নেপালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'জন-আন্দোলন'কে এই তৃতীয় ঢেউয়ের প্রভাব বলেও ধারণা করা হয়ে থাকে। দেশে দেশে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার এই ঢেউ এতটাই নাটকীয় ও অভূতপূর্ব ছিল, কেউ কেউ এরই আলোকে বিংশ শতাব্দীকে গণতন্ত্রের শতক বলে বর্ণনা করেন। এ নিয়ে আশাবাদ ও অতিশয়োক্তির ঘটনাও ঘটে। ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা বিজয়দৃপ্ত মনোভঙ্গিতে ঘোষণা করেন যে আমরা ইতিহাসের 'অবসান' প্রত্যক্ষ করছি (ফুকুইয়ামা, ১৯৮৯, ১৯৯২)।

১৯৭০-এর দশকে গণতন্ত্র অভিমুখে বিভিন্ন দেশের যাত্রা বিশ্লেষকদের মধ্যে এই ধারণার জন্ম দেয় যে গণতন্ত্রায়ণ একটি প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তদুপরি এর প্রতিটি পর্যায়ের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদর্শন করা ও বিশ্লেষণ করা জরুরি। এই ধারণাই গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়ার বিষয়ে নতুন নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাত্ত্বিকভাবে গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়া বোঝার তাগিদকে জোরদার করে। এগুলোকে উত্তরণ তত্ত্ব (Transition Thesis) বলে চিহ্নিত করা হয়। কারও কারও মতে, গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়ার চারটি পর্যায় রয়েছে : কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার ক্ষয়, উত্তরণ, সংহতকরণ (Consolidation) এবং দৃঢ়করণ (Deepening)। কারও কারও মতে রয়েছে তিনটি স্তর : সুযোগ সৃষ্টি (Opening), ব্যূহভেদ (Breakthrough) এবং সংহতকরণ (Consolidation) (ক্যারোথারস, ২০০২)।

গণতন্ত্রায়ণের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন, খানিকটা অবচেতনভাবেই তাঁরা একধরনের একরৈখিক পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতির ধারণাকে গ্রহণ করে নেন। অর্থাৎ গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তা উত্তরণ পর্যায় হয়ে সংহতকরণ বা দৃঢ়করণ পর্যায়ে উপনীত হবে। ক্যারোথারস (২০০২ : ৭) যথার্থই শনাক্ত করেন যে এই মতের প্রবক্তারা অস্বীকার করলেও এই ধারণার মধ্যে পরমকারণবাদের (Teleology) প্রভাব সুস্পষ্ট। গণতন্ত্রায়ণ, বিশেষত উত্তরণ পর্যায়ের দিককে যাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁদের

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরও অনেক ধরনের সমালোচনা ইদানীং প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যতম দুটি প্রধান সমালোচনা হলো, উত্তরণবিষয়ক আলোচনা সব সময়ই পরিবর্তনের সূচনাটি ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে শুরু হয়েছে বলে ধারণা দিয়েছে (সেটা অর্থনৈতিক সংকট বা অভ্যন্তরীণ মতভিন্নতা, যে কারণেই ঘটুক না কেন)। তাঁরা কার্যত পরিবর্তনের চাপ যে নিচে থেকে অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায় থেকে আসতে পারে, সেদিকটায় খুব গুরুত্ব দেননি। কিন্তু অনেক দেশেই তা লক্ষ করা গেছে। দ্বিতীয় সমালোচনা হলো, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও তার ভূমিকা মোটেই আলোচিত হয়নি। কোনো দেশের গণতন্ত্রায়ণে বাইরের পরিস্থিতি, শক্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আদৌ প্রভাব ফেলেছে কি না, তা অনালোচিতই থেকেছে। জেওফ্রি প্রিধাম একে গণতন্ত্রায়ণের 'বিস্মৃত মাত্রা' বলে বর্ণনা করেছেন (প্রিধাম, ২০০৫)।

গণতন্ত্রায়ণের, বিশেষত পর্যায়ক্রমিক কিন্তু একরৈখিক ধারার ধারণা কেবল যে গবেষকদেরই প্রভাবিত করেছে তা নয়, বিভিন্ন দেশের এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমকেও তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

এই পটভূমিকায়ই আরেকটি প্রশ্ন ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে, তা হলো—গণতন্ত্র কী করে পরিমাপ করা যায়? প্রশ্নটি কেবল এই নয় যে কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ, প্রশ্নটি হলো, মর্মবস্তুর বিবেচনায় কোনটি গণতন্ত্র? প্রশ্ন ওঠে, 'গণতন্ত্র' এবং 'অগণতন্ত্র' কি দ্বিমূল (Binary) ধারণা? (অর্থাৎ একটির অবস্থান অন্যটিকে নাকচ করে দেয়, একটি থাকলে অন্যটি উপস্থিত থাকতে পারে না।) নাকি গণতন্ত্র হচ্ছে স্তর বিন্যস্ত পরম্পরার (Continuum) একটি অবস্থান (অর্থাৎ গণতন্ত্রের ক্রমবিন্যাস করা সম্ভব)? অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্র-অগণতন্ত্রকে দ্বিবিভাজিত বলে মনে করেন এবং গণতন্ত্র পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্তরবিন্যাসের পক্ষে নন (সারটোরি, ১৯৮৭)। অন্যদিকে অনেকের ধারণা, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হওয়া দরকার চলমান ক্রমবিন্যাস-প্রক্রিয়া হিসেবে (বোলেন ও জ্যাকম্যান, ১৯৮৯)। এই বিতর্কের কোনো ধরনের সমাপ্তি না হলেও ক্রমবিন্যাসের ধারণার সমর্থকেরা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন গত কয়েক দশকে।

বিপরীত স্রোত

গণতন্ত্রের 'তৃতীয় ঢেউ' নিয়ে যে ধরনের উৎসাহ, আগ্রহ ও আশাবাদ দেখা দিয়েছিল এক দশকের মধ্যে তাতে ভাটার টান লাগে। ২০০০ সালের কিছু আগে থেকেই গবেষকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকেন যে প্রত্যাশা ও অর্জনের মধ্যে ফারাক তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকলে এবং বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ লক্ষ করে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলতে শুরু করেন যে গণতন্ত্র সংহত হওয়ার বদলে অনেক দেশ গণতন্ত্র গুটিয়ে ফেলছে বা পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ছে। ২০০৮ সালে *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* সাময়িকীতে ল্যারি ডায়মন্ডের 'গণতন্ত্রের পিছু হটা' শীর্ষক রচনাটি সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও থমাস ক্যারোথারস (২০০২), মেরিনা ওটাওয়ে (২০০৩) এবং এন্ড্রু নেথ্যানসহ (২০০৩) অনেকেই এ কথা দশকের গোড়াতেই বলতে শুরু করেন।

গবেষকেরা সে সময় থেকেই এটা চিহ্নিত করেন যে গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার পর কিছু দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে, কিছু দেশ উল্টো পথে কর্তৃত্ববাদী শাসনে ফিরে গেছে। আর কিছু দেশ গণতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও হয় স্বেচ্ছায় বা অন্য কারণে নিশ্চল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি উত্তরণ বা গণতন্ত্রায়ণ তত্ত্বের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই এ অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করেন।

উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করিয়ে দেন যে গণতন্ত্রায়ণ নিয়ে আশাবাদের জোয়ারের মধ্যেও ১৯৮৬ সালে গুয়েলারমো ও'ডানেল এবং ফিলিপ স্মিটার এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে উত্তরণের ফল হতে পারে তুলনামূলক উন্মুক্ত কর্তৃত্ববাদী শাসন অথবা নিয়ন্ত্রণমূলক অনুদার (Illiberal) গণতন্ত্র (ও'ডানেল এবং স্মিটার, ১৯৮৬: ৯)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা আরও স্পষ্ট হয়, অনেক সরকারই সাংবিধানিক পথ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন (এই অর্থে যে নিয়মিতভাবে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সীমিত আকারে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার চর্চার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে), কিন্তু গণতন্ত্রের যে মর্মবস্তু (শাসন পরিচালনায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন, তাদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া) তা অপূরিতই থেকে যাচ্ছে। এই অপূর্ণতা রাজনৈতিক শ্রেণীর আদর্শিক অবস্থানের পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় এটাও স্পষ্ট হয়ে যায়, গণতন্ত্র-অগণতন্ত্রের এই বিভাজন দিয়ে গণতন্ত্রের অবস্থা বোঝা সম্ভব নয়। ফলে প্রশ্ন ওঠে, এসব গণতন্ত্রকে কীভাবে বর্ণনা করা হবে?

বিশেষণসমৃদ্ধ গণতন্ত্র

এ ধরনের গণতন্ত্রকে বর্ণনা করার জন্য বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে আধা গণতন্ত্র (Semi-democracy), প্রায়-গণতন্ত্র (Virtual democracy), নির্বাচনী গণতন্ত্র (Electoral democracy), ছদ্ম গণতন্ত্র (Pseudo-democracy), অনুদার গণতন্ত্র (Illiberal democracy), আধা কর্তৃত্ববাদ (Semi-authoritarianism); কোমল কর্তৃত্ববাদ (Soft authoritarianism) এবং নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ (Electoral authoritarianism) (লেভিটস্কি এবং ওয়ে, ২০০২)। ল্যারি ডায়মন্ড এ ধরনের শাসনকে হাইব্রিড রেজিম (Hybrid regime) বা সংকর শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন (ডায়মন্ড, ২০০২)। গোড়ার দিকে এসব শাসনব্যবস্থার সঙ্গে 'আধা', 'প্রায়' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করে একে গণতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদী শাসনের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্তর বলে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হলেও পরবর্তী সময় বিশ্লেষকেরা ক্রমেই স্বীকার করে নেন যে এগুলো গণতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদের কোনো উপরূপ নয়। বরং এগুলো হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের শাসন, নিজেই একটা বিশেষ রূপ। ফলে এদের গণতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদ বলে বর্ণনার সুযোগ নেই (বোগার্ড, ২০০৯)। ডায়মন্ড ২০০২ সালে খুব জোর দিয়ে বলেন যে সংকর শাসনকে, উত্তরণের পথে রয়েছে এমন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে, গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। উত্তরণ পর্যায় হচ্ছে শাসনব্যবস্থা এক ধরন থেকে অন্য ধরনে

যাওয়ার অন্তর্বর্তী অবস্থান—হাইব্রিড রেজিম তা নয়, এগুলো নিজেই একধরনের শাসনব্যবস্থা।

এক অর্থে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সংকর শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যটি হলো আনুষ্ঠানিক (Formal) গণতন্ত্র ও প্রকৃত (Substantive) গণতন্ত্রের পার্থক্য। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র হলো, যেখানে গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সব বা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান উপস্থিত থাকে, কিন্তু সেগুলো নিয়ন্ত্রিত বা অপব্যবহৃত হয় সংখ্যালঘু এলিটদের দ্বারা, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে। এই ব্যবস্থা নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, আপাতদৃষ্টে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা এবং আইনের শাসনের কিয়দংশ বহাল রাখে; কিন্তু কার্যত তা তস্করের শাসন (Kleptocracy)। আন্দ্রিয়াস সেডলারের ভাষায় বললে, এরা ঠিকঠাক নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজটি করতে পারে, কিন্তু গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন: আইনের শাসন, রাজনৈতিক জবাবদিহি, আমলাতান্ত্রিক সততা এবং উন্মুক্ত আলাপ-আলোচনা—এসবের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয় (সেডলার, ২০০২: ৩৭)।

প্রকৃত গণতন্ত্র, বিপরীতক্রমে, গণতন্ত্রের যে মর্মবস্তু—জনগণের ক্ষমতায়ন, যাতে করে তারা সমাজের সুরক্ষিত কাঠামোর স্বার্থ এবং সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তাদের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে—তাই অর্জন করতে চায়। প্রকৃত গণতন্ত্র চায় জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, আইনের শাসন পালন করতে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে।

কোনো কোনো বিশ্লেষক, যেমন ফরিদ জাকারিয়া, এই দুই বিপরীতধর্মী ব্যবস্থাকে অনুদার (Illiberal) ও উদার (Liberal) গণতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন (জাকারিয়া, ১৯৯৭, ২০০৭)। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অনুদার গণতন্ত্রে নির্বাচনের সঙ্গে সহাবস্থান করে নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক অধিকার এবং আইনবহির্ভূতভাবে জনগণের কোনো কোনো অংশের ভোটাধিকার হরণ। কিন্তু জাকারিয়ার এই শ্রেণীর বিভাজন ও বর্ণনা অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারেনি; সেডলার (২০০২: ৪৩) মন্তব্য করেছেন, 'অনুদার—অবশ্যই, কিন্তু গণতান্ত্রিক কি?' আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের যাঁরা সুবিধাভোগী, তাঁরা নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানকে কেবল গণতন্ত্রের প্রমাণ হিসেবেই উপস্থাপন করেন না, তাঁরা নির্বাচনকে গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখান এবং তার উপস্থিতির কারণে অন্য সব অপূর্ণতাকে অস্বীকার করতে চান।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রকৃতি

নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের বিভিন্ন ধরনসংক্রান্ত আলোচনা ও তাদের পার্থক্য বিবেচনা করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রায়ই 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' (Electoral Democracy) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই বর্ণনা ১৯৯১-পরবর্তী সব নির্বাচিত সরকারের শাসনকেই বোঝায়। এটা এই অর্থে সঠিক যে ১৯৯১-পরবর্তীকালে (একটি ব্যতিক্রম বাদে) নিয়মিতভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সময়ের শাসনব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী সেনাশাসন (১৯৭৫-৯০) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ উদাহরণ ও

গবেষণালব্ধ উপাত্ত রয়েছে, যা থেকে দেখা যায় যে, সব সরকারই নাগরিক অধিকার সীমিত করতে আইনি ও আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া জবাবদিহির বিষয়টি এখনো 'সোনার হরিণ'ই থেকে গেছে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রকৃতি বোঝার জন্য এসব ঘটনা ও সীমিত উপাত্তের পুনরালোচনা না করে আমরা ব্যবহার করব গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের সমন্বিত (Composite Indices) উপাত্ত। এসব উপাত্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে: ১. ইতিমধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশিত (Public Domain); ২. একাধিক বছরের উপাত্ত; ৩. একাধিক সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন উপাত্ত। যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে, আমরা একই সূচকের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার দিকে নজর দিয়েছি এবং একাধিক বছরের গড় সংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়েছি। একই সূচকের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক সূত্রও ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা ছয়টি সূচক নির্ধারণ করেছি, যেগুলো সংকর শাসনব্যবস্থার উপস্থিতি প্রমাণ দিতে পারে বা তাকে নাকচ করে দিতে পারে। এই সূচক নির্বাচনে আমরা অনুসরণ করেছি জোয়াকিম একম্যানকে (২০০৯)।[৩] সূচক নির্বাচনে ইতিমধ্যে সংকর শাসনব্যবস্থা-বিষয়ক আলোচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব পেয়েছে, সেগুলোকে খতিয়ে দেখা (অর্থাৎ নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, কিন্তু সহজে লক্ষ্যযোগ্য কতক দুর্বলতা থাকা) আমাদের লক্ষ্য। নির্বাচিত ছয়টি সূচক হলো: ১. প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন; ২. উঁচু মাত্রার দুর্নীতি; ৩. জবাবদিহির অনুপস্থিতি; ৪. গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি; ৫. নাগরিক অধিকার পরিস্থিতির দুর্বলতা; ৬. আইনের শাসনের অনুপস্থিতি।

উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ছয়টি সূত্র থেকে। এগুলো হলো ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের 'ডেমোক্রেসি ইনডেক্স', ফ্রিডম হাউসের 'ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স', রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স', অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতে 'পলিটিক্যাল টেরর স্কেল'-এর উপাত্ত।

এ পর্যায়ে আমরা প্রতিটি সূচকের ব্যাপারে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব। তারপর এগুলোকে একটি সারণিতে সমন্বয় করব।

গণতন্ত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো—অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। সংকর শাসনব্যবস্থায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তা আমরা আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনায়ই জানি। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দিক হলো, নির্বাচন কোনো রকম পার্থক্য তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে কি না। এখানে আমরা *ইকোনমিস্ট*-এর ডেমোক্রেসি ইনডেক্স থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদিতা-বিষয়ক স্কোরটি ব্যবহার করেছি। *ইকোনমিস্ট*-এর 'ডেমোক্রেটিক ইনডেক্স'-এ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশ কয়েকটি দিক দেখা হয়; যেমন দেশের আইনসভা ও সরকারের প্রধান নির্ধারণের জন্য যে নির্বাচন হয়, তা কি অবাধ? বিরোধী দলের কি সরকার গঠনের বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে? এসব উত্তরের ভিত্তিতে ০-১০ স্কোরিং করা হয়। আমরা ছয় বা তার বেশিকে ধরে নিয়েছি ইতিবাচক বলে। চার বছরের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের গড় স্কোর হচ্ছে সাত (দ্রষ্টব্য: সারণি-১)।

সারণি-১
ইকোনমিস্ট-এর গণতন্ত্র সূচক

বছর	অবস্থান	সামগ্রিক স্কোর	নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদিতা	সরকারের কার্যক্রম	রাজনৈতিক অংশগ্রহণ	রাজনৈতিক সংস্কৃতি	নাগরিক অধিকার
২০১১	৮৩	৫.৮৬	৭.৪২	৫.৪৩	৫.০০	৪.৩৮	৭.০৬
২০১০	৮৩	৫.৮৭	৭.৪২	৫.৪৩	৪.৪৪	৫.০০	৭.০৬
২০০৮	৯১	৫.৫২	৭.০০	৫.০৭	৪.৪৪	৩.৭৫	৭.৩৫
২০০৬	৭৫	৬.১১	৭.৪২	৫.০৭	৪.৪৪	৬.২৫	৭.৩৫

সূত্র : ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ডেমোক্রেসি ইনডেক্স, বিভিন্ন বছর

দুর্নীতির মাত্রা নিরূপণের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের করাপশন 'পারসেপশন ইনডেক্সে'র স্কোর। এখানে ১-১০-এর তুলাদন্ডে ১০ হচ্ছে সবচেয়ে কম দুর্নীতির এবং ১ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির পরিচায়ন। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নয় বছরে বাংলাদেশ ২ দশমিক ৭ বা তার চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে (দ্রষ্টব্য : সারণি-২)। নয় বছরের উপাত্ত প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচু।

সারণি-২
দুর্নীতির উপস্থিতির সূচক

২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
২.৭	২.৪	২.১	২.০	২.০	১.৭	১.৫	১.৩	১.২

সূত্র : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স, বিভিন্ন বছর

আমাদের তৃতীয় সূচক হলো জবাবদিহির অনুপস্থিতি। *ইকোনমিস্ট*-এর 'ডেমোক্রেসি ইনডেক্স' একে সরকারের কার্যক্রম হিসেবে সারণিবদ্ধ করেছে। এই স্কোরের জন্য *ইকোনমিস্ট* অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তরের একটি গড় তৈরি করে। এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে আছে—দুই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে সরকারি কর্তৃত্ব (authority) প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য নিশ্চিত করার কোনো পদ্ধতি রয়েছে কি না? জনপ্রশাসন সরকারি নীতি বাস্তবায়নে আগ্রহী ও সক্ষম কি না? আমরা এ ক্ষেত্রে চার বছরের যে চারটি স্কোর রয়েছে তার একটি গড় তৈরি করেছি। আমরা ছয় বা তার কমকে দুর্বলতা বলে শনাক্ত করেছি। চার বছরের সবগুলোতেই বাংলাদেশ ৬-এর কম স্কোর পেয়েছে (দ্রষ্টব্য : সারণি-১)।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিষয়ক সূচকটির উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স' থেকে। এ ক্ষেত্রে স্কোর হচ্ছে ০ থেকে ১১০। এতে ০ (শূন্য) হচ্ছে কোনো ধরনের বাধানিষেধ না থাকা। অন্যদিকে ১১০ হচ্ছে সবচেয়ে বিরূপ পরিবেশ। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০-এর অধিক হওয়ার অর্থই হচ্ছে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি'।

২০০২ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম (৩৭.৩৩) ছাড়া সব সময়ই ৪০-এর ওপরে থেকেছে। দুই বছর (২০০৪ ও ২০০৫ সালে) বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৬০-এর বেশি। ২০১১-১২ সালে বাংলাদেশের স্কোর ৫৭.০০ (দ্রষ্টব্য : সারণি-৩)।

সারণি-৩
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

বছর	অবস্থান	স্কোর
২০১১-১২	১২৯	৫৭.০০
২০১০	১২৬	৪২.৫০
২০০৯	১২১	৩৭.৩৩
২০০৮	১৩৬	৪২.৭০
২০০৭	১৩৪	৫৩.১৭
২০০৬	১৩৭	৪৮.০০
২০০৫	১৫১	৬১.২৫
২০০৪	১৫১	৬২.৫০
২০০৩	১৪৩	৪৬.৫০
২০০২	১১৮	৪৩.৭৫

সূত্র : রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স। বিভিন্ন বছর

নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি সূচক বিবেচনার জন্য আমরা ফ্রিডম হাউসের 'ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর উপাত্ত ব্যবহার করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা তিন প্রস্থ দীর্ঘমেয়াদি উপাত্ত ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এগুলো হলো : ক. ২০ বছরের (১৯৯১-২০১০) মানবাধিকার পরিস্থিতির রেটিং (০ থেকে ৭ স্কেলে গড় স্কোর হয়েছে ৩.৯) (দ্রষ্টব্য : সারণি-৪); খ. ১০ বছরের (২০০৩-২০১২) বার্ষিক সামষ্টিক স্কোর (০ থেকে ৬০ স্কেলে গড় স্কোর ৩১.৮) (দ্রষ্টব্য : সারণি-৫); গ. সাত বছরের (২০০৬ থেকে ২০১২) উপশ্রেণী বিন্যস্ত উপাত্ত যাতে একটি উপশ্রেণী ৬০ শতাংশের বেশি স্কোর পেয়েছে (দ্রষ্টব্য : সারণি-৬)। তিনটি সারণিতে দেওয়া উপাত্ত থেকে এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা মিশ্র।

সারণি-৪
নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি
ফ্রিডম হাউস বার্ষিক স্কোর, ১৯৯১-২০১০

বছর	রাজনৈতিক অধিকার স্কোর	নাগরিক অধিকার স্কোর
২০১০	৩	৪
২০০৯	৩	৪
২০০৮	৪	৪
২০০৭	৫	৪
২০০৬	৪	৪
২০০৫	৪	৪
২০০৪	৪	৪
২০০৩	৪	৪
২০০২	৪	৪
২০০১	৩	৪
২০০০	৩	৪
১৯৯৯	৩	৪
১৯৯৮	২	৪
১৯৯৭	২	৪
১৯৯৬	২	৪
১৯৯৫	৩	৪
১৯৯৪	২	৪
১৯৯৩	২	৪
১৯৯২	২	৩
১৯৯১	২	৩

সূত্র : ফ্রিডম হাউস, 'ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড', বিভিন্ন বছর

সারণি-৫
নাগরিক অধিকার বার্ষিক সামষ্টিক স্কোর ২০০৩-২০১২

বছর	রাজনৈতিক অধিকার (০-৪০)	নাগরিক অধিকার (০-৬০)
২০১২	২৫	৩৩
২০১১	২৬	৩৪
২০১০	২৬	৩৩
২০০৯	২২	৩০
২০০৮	১২	২৮
২০০৭	২২	৩১
২০০৬	২২	৩১
২০০৫	২২	৩২
২০০৪	২১	৩৩
২০০৩	২১	৩৩

সূত্র : ফ্রিডম হাউস 'ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড', বিভিন্ন বছর

সারণি-৬
নাগরিক অধিকার, উপশ্রেণী বিন্যস্ত
২০০৬-২০১২

বছর	**রাজনৈতিক অধিকার**			**নাগরিক অধিকার**			
	নির্বাচনী প্রক্রিয়া	রাজনৈতিক অংশগ্রহণ	সরকারের কার্যক্রম	মত প্রকাশের স্বাধীনতা	সংগঠনের অধিকার	আইনের শাসন	ব্যক্তিগত অধিকার
২০১২	৯	১১	৫	৯	৮	৭	৯
২০১১	৯	১১	৬	৯	৯	৭	৯
২০১০	৯	১১	৬	৯	৮	৭	৯
২০০৯	৯	৯	৪	৮	৮	৫	৯
২০০৮	৩	৫	৪	৭	৬	৬	৯
২০০৭	৮	১০	৪	৮	৮	৬	৯
২০০৬	৮	১০	৪	৮	৮	৬	৯

সূত্র : ফ্রিডম হাউস, 'ফ্রিডম অব দ্য ওয়ার্ল্ড', বিভিন্ন বছর

হাইব্রিড রেজিম বা সংকর শাসনব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো দুর্বল আইনের শাসন। কেননা এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকার আইন তার অনুকূলে এবং বিরোধীদের হয়রানির জন্য প্রয়োগ করে থাকে। তা ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সংকর শাসনব্যবস্থায় আইনবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটে। লক্ষণীয়ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সরকার হয় সরকারি আধা সামরিক গোষ্ঠী অথবা সরকার-সমর্থকদের দ্বারা তৈরি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কর্মকাণ্ড চালাতে দিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা

সারণি-৭
সন্ত্রাস পরিমাপক স্কেল ১৯৯১-২০০৭

বছর	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল স্কোর	যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর স্কোর
২০১০	৪	৪
২০০৯	৪	৪
২০০৮	৪	৪
২০০৭	৪	৪
২০০৬	৪	৪
২০০৫	৪	৪
২০০৪	৪	৪
২০০৩	৩	৪
২০০২	৩	৪
২০০১	৪	৩
২০০০	৩	৩
১৯৯৯	৩	৩
১৯৯৮	২	৪
১৯৯৭	৩	৪
১৯৯৬	৩	৪
১৯৯৫	৩	৩
১৯৯৪	৩	৩
১৯৯৩	৩	৩
১৯৯২	৪	৪
১৯৯১	৩	৪

সূত্র : পলিটিক্যাল টেরর স্কেল, দেখুন : http://politicalterrorscale.org/ptsdata.php?start=0

পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা তিন প্রস্থ উপাত্ত ব্যবহার করেছি। এগুলো হলো : ক. ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের ফ্রিডম অব দ্য ওয়ার্ল্ডের 'আইনের শাসন' উপশ্রেণীর তথ্য (০ থেকে ১৫ স্কেলে যত বেশি স্কোর পরিস্থিতি ততটা ভালো; বাংলাদেশের গড় স্কোর ৬.২) (দ্রষ্টব্য : সারণি-৬); খ. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সন্ত্রাস পরিমাপক স্কেলের স্কোর, ১৯৯১ থেকে ২০১০ (১ থেকে ৫ স্কেলে গড় ৩.৪; যত বেশি স্কোর পরিস্থিতি ততটা আশঙ্কাজনক) (দ্রষ্টব্য : সারণি-৭); গ. যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের সন্ত্রাস পরিমাপক স্কেলের স্কোর, ১৯৯১ থেকে ২০১০ (১ থেকে ৫ স্কেলে গড় ৩.৭) (দ্রষ্টব্য : সারণি-৭)। এই তিনটি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে আমাদের উপসংহার হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

সাতটি সারণিতে উপস্থাপিত উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা সমন্বিত গুণবাচক সারণি-৮ তৈরি করেছি, যাতে সংকর শাসনব্যবস্থার নির্দেশক সূচকগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান দেখা হয়েছে। এই সারণির ছয়টি সূচকের মধ্যে পাঁচটি সূচকই নির্দেশ করে যে বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তাকে যথার্থভাবেই সংকর গণতন্ত্র বলা যায়।[৪]

সারণি-৮
সংকর গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক নির্বাচন	উঁচুমাত্রার দুর্নীতির উপস্থিতি	জবাবদিহির অনুপস্থিতি	গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি	নাগরিক অধিকার পরিস্থিতির দুর্বলতা	আইনের শাসনের অনুপস্থিতি	মোট সূচক
হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	৫

সূত্র : লেখকের তৈরি।

সংকর গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে এ ধরনের ব্যবস্থায় সবগুলোই একধরনের শাসন হয় না। সংকর গণতন্ত্র বললে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার কথাই বলা হয়। এই বিন্যাস বা বিভাগটি এত ব্যাপক যে গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় পড়ে না, এমন সব শাসনকেই সম্ভবত এর আওতায় আনা যায়। সে কারণেই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আরও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা এবং তার প্রভাব খতিয়ে দেখা।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বিরাজমান সংকর গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুটি প্রত্যয় আমাদের সাহায্য করতে পারে : অভিভাবকসুলভ নিয়ন্ত্রণ (Tutelary Control) এবং প্রতিভূ গণতন্ত্র (Delegative Democracy)। অভিভাবকসুলভ নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই গণতান্ত্রিক রাজনীতির কর্তৃত্বকে দুর্বল করে তোলে। কেননা 'নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের জবাবদিহিহীন মালিকদের খেয়ালখুশির দাস হয়ে পড়ে' (সেভলার, ২০০২ : ৪৭)। হ্যান্স

ইয়ুরগান পোহল বলেন, ত্রুটিযুক্ত গণতন্ত্রের একটি লক্ষণই হচ্ছে যে সেখানে অগণতান্ত্রিক শক্তি গণতন্ত্রবহির্ভূত (Extrademocratic) ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে বা ভেটো ক্ষমতা নিয়ে কাজ করতে পারে (পোহল, ২০০৫)। নতুন গণতন্ত্রে এ ধরনের অভিভাবকসুলভ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে সেনাবাহিনীর হাতে (যেমন গুয়াতেমালা, এল সালভাদর) অথবা ধর্মীয় নেতাদের হাতে (যেমন ইরান)। এই প্রত্যয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিচার করতে। ফলে তার বিশ্লেষণী মূল্য ইতিমধ্যেই বহুভাবে পরীক্ষিত হয়েছে (বিস্তারিত দেখুন: রাবকিন, ১৯৯২)। বাংলাদেশে এই অভিভাবকসুলভ ক্ষমতা অর্জনের জন্য সেনাবাহিনীর একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় জেনারেল এরশাদের শাসনামলে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীগতভাবে একদল মানুষ এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি উত্তরাধিকারের রাজনীতি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি প্রধান দল—আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জাতীয় পার্টি—তিনজন নেতার কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়। দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাবই তার একমাত্র কারণ নয়, দলের নেতা পর্যায়ে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ—অভিভাবক বলেই বিবেচিত হন (উত্তরাধিকারের রাজনীতিবিষয়ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: রীয়াজ, ২০১০)। দলের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেই দেখা যায় যে শীর্ষ পর্যায়ের কমিটিগুলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার একজন ব্যক্তির ওপরই ন্যস্ত করে।

প্রতিভূ গণতন্ত্রের প্রবক্তা গুয়েলারমো ও'ডানেল অভিভাবকসুলভ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এই প্রত্যয়কে যুক্ত করেননি। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ করলেই এদের সম্পর্ক বোঝা যাবে। ও'ডানেলের দেওয়া তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী ক্যারিশমাসম্পন্ন, দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং অধিকাংশ সময়ই মেরুকরণ করার মতো (Polarizing) নেতৃত্ব যখন একটি সংকটকালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখনই প্রতিভূ গণতন্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নেতা-নেত্রী দেশকে রক্ষার এক বিশেষ লক্ষ্যের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নেন এবং অত্যন্ত আবেগপ্রবণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে প্রভাবিত করতে চান। অর্থাৎ প্রতিভূ গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি এবং এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যে নেতা-নেত্রী হচ্ছেন জাতির মূর্ত রূপ। বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী যখন সুস্পষ্টভাবে বলেন যে তাঁর চেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক আর কেউ নেই তখন তিনি নিজেকে জাতির মূর্ত রূপ বলেই হাজির করেন।[৫]

যদিও এই ব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এ কথা বিস্মৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে এই ব্যবস্থা নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর, নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর জোর দিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় 'নির্বাচন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা' (ও'ডানেল, ১৯৯৪)। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো যে নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলীর (অর্থাৎ ভোটারদের) ভূমিকা নির্বাচন-উত্তরকালে খুবই সীমিত, প্রায় নেই বললেই চলে। কেননা একবার নির্বাচিত হওয়ার পর প্রার্থীরা 'নগ্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সম্পর্কের আরোপিত বাধানিষেধ' ছাড়া আর কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা শাসন করেন ও'ডানেলের ভাষায়

'virtually free of all constraints', কার্যত সব রকম বাধানিষেধমুক্তভাবে। ও'ডানেল বলছেন, প্রতিভূ গণতন্ত্রে নির্বাচিতরা সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যেভাবে তাঁরা সঠিক মনে করেন সেভাবেই শাসন করতে চান।

সাধারণত রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায়ই এ ধরনের ক্ষমতার ও প্রতিভূ গণতন্ত্রের উত্থান সম্ভব বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থায়ও তা সম্ভব হয়ে উঠেছে একাধিক কারণে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান ও তা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা না থাকা। তদুপরি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একাধারে তিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী, সংসদীয় দলের প্রধান এবং তাঁর দলের প্রধান। উপরন্তু এই ব্যবস্থা যখন অভিভাবকসুলভ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তখন তার ভারসাম্যের আর কোনো পথই খোলা থাকে না।

ডেলিগেটিভ ডেমোক্রেসি নিয়ে এ যাবৎ যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতিকেই উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁরা দেখান যে প্রেসিডেন্ট প্রায় সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে আইনসভা ও বিচার বিভাগকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'উপদ্রব' বলেই তাঁরা মনে করেন। যাঁরা একদা ক্ষমতাসীন ছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এটা অনেকটাই প্রযোজ্য। অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে, জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনে একজন বিরোধীদলীয় নেত্রী ট্রেজারি বেঞ্চকে লক্ষ করে 'চুপ বেয়াদব' বলে ধমক দেন।[৬]

সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্রে প্রাপ্ত সীমাহীন ক্ষমতা, জাতির মূর্ত রূপ হওয়া এবং অভিভাবকসুলভ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার ফলে নেতা-নেত্রীরা জবাবদিহিকে কোনোভাবেই গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তাঁদের কাছে জবাবদিহি মানে উল্লম্ব (Vertical) জবাবদিহি; অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে ভোটারদের কাছে ব্যালট বাক্সে জবাবদিহি। কিন্তু যেসব দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে, সেখানে জবাবদিহির আরেক রূপ হলো আনুভূমিক (Horizontal) জবাবদিহি। সমাজের অন্যান্য স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের ক্ষমতা প্রয়োগকে প্রশ্ন করতে পারবে এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হলে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাস্তিও দিতে পারবে (ও'ডানেল ১৯৯৪ : ৬১-২)।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত অন্য এক প্রবন্ধে ও'ডানেল জোর দিয়ে বলেন যে নতুন গণতন্ত্রে যত সুষ্ঠু নির্বাচনই হোক, তা শক্তিশালী উল্লম্ব জবাবদিহি নিশ্চিত করে না। অসংহত দল-ব্যবস্থা, ইস্যুভিত্তিক নির্বাচন না হওয়া ইত্যাদি কারণে কয়েক বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। এসব ক্ষেত্রে বেশি দরকার আনুভূমিক জবাবদিহি। আনুভূমিক জবাবদিহির অনুপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে বলে তিনি হুঁশিয়ার করেন (ও'ডানেল, ১৯৯৮)।

আনুভূমিক জবাবদিহির জন্য প্রয়োজনীয় যেসব প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়ে থাকে, তার অধিকাংশই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা হলো এই যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শ্রেণী, দল-নির্বিশেষেই, এ ধরনের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছে। বিএনপির সর্বশেষ শাসনের সময় (২০০১-২০০৬) আন্তর্জাতিক

চাপের মুখে দুর্নীতি দমন কমিশন তৈরি হলেও তাকে অকার্যকর করে রাখা হয়। অন্যদিকে বর্তমান সরকারের গোড়া থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের প্রধান ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে এক সংবাদ সম্মেলনে একে 'দন্তহীন বাঘ' বলে বর্ণনা করেন। সাম্প্রতিক কালে কমিশনের কার্যকলাপ একে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। একইভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনে সরকারি অনীহা, প্রতিষ্ঠার পর তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অনাগ্রহ ও কমিশনের অনুরোধ উপেক্ষা করার ঘটনা প্রমাণ করে যে সরকারের জবাবদিহির ধারণায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কোনো মূল্যই নেই।

সাম্প্রতিক কালে আনুভূমিক ও উল্লম্ব জবাবদিহির পাশাপাশি সামাজিক জবাবদিহির ধারণা তৈরি হয়েছে। এই সামাজিক জবাবদিহি হলো উল্লম্ব জবাবদিহি কিন্তু তা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কাছে নয়, বরং নাগরিকদের সংগঠন ও আন্দোলনের কাছে এবং গণমাধ্যমের কাছে (স্মুলোভিজ ও পেরুজোটি, ২০০০)। এ ধরনের জবাবদিহি যে ক্ষমতাসীন দলের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য তা প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট। ২০১১ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন কৃতী চিত্রনির্মাতা তারেক মাসুদ ও আশফাক মুনীরসহ পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনার পর তরুণদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য এবং নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমের সমালোচনাই এ কথা প্রমাণ করে।

উপসংহার

এই আলোচনায় আমি দেখাতে চেয়েছি, বাংলাদেশে যে শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে তাকে সংকর শাসনব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করা যায়। ওপরের আলোচনায় এই শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন সূচক বিবেচনা করে এই কথাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে অন্যান্য কতিপয় দেশের মতোই গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়ে এসে এই ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। তদুপরি দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে এই ব্যবস্থা প্রতিভূ গণতন্ত্র বা ডেলিগেটিভ ডেমোক্রেসির রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সংকর শাসনব্যবস্থার যেকোনো রূপই আসলে আর উত্তরণের একটি পর্যায় নয়, এটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। যার অর্থ এই অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণ বা কর্তৃত্ববাদী শাসনে প্রত্যাবর্তন করা পূর্বনির্ধারিত নয়। ফলে খুব সহজে এ ধরনের ব্যবস্থার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন মহলে যে শঙ্কার কথা আমি প্রবন্ধের গোড়াতে উল্লেখ করেছি, তার আংশিক কারণও এই।

সংকর শাসনব্যবস্থা বা হাইব্রিড রেজিমের যেসব রূপ তাত্ত্বিকভাবে আলোচিত হয়েছে, তার কোনোটিই খুব দীর্ঘ সময় ধরে বাস্তব রূপ নেয়নি। এদের অধিকাংশরই উদ্ভব ঘটেছে এক দশক বা তার কিছু বেশি সময় ধরে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও বিশ্লেষকদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ ভূয়োদর্শনলব্ধ উপাত্ত নেই, যা থেকে এ ধরনের ব্যবস্থার স্থায়িত্বের মেয়াদ বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা যেতে পারে।

তবে রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা ও তানজানিয়া নিয়ে জোয়াকিন একম্যানের গবেষণা থেকে আমরা খানিকটা ইঙ্গিত পেতে পারি (একম্যান, ২০০৯)। ওই গবেষণায় সংকর শাসনব্যবস্থা সংরক্ষণে কী কী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে নির্বাচন, নির্বাহী/আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একম্যান বলছেন যে এর বাইরে জনসাধারণের ভূমিকা অপরিসীম।

সংকর শাসনব্যবস্থার বৈধতার ভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নির্বাচন খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে থাকে। ফলে এসব নির্বাচন প্রভাবিত করার চেষ্টা সহজেই লক্ষণীয়। তদুপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তারের প্রবণতাও সহজেই দেখা যায়। নির্বাচনকে প্রভাবিত করা, স্বীয় স্বার্থে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের সাফল্য নির্ভর করে বিরোধী দলগুলোর এবং সিভিল সমাজের শক্তির ওপর। নির্বাচন প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সংকর শাসনব্যবস্থায় সরকারের প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং কৌশলী দুই ধরনেরই হয়েছে। সাংবিধানিক ব্যবস্থাও যে ব্যবহৃত হয়েছে তা সর্বসাম্প্রতিক রাশিয়ার নির্বাচন ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ভ্লাদিমির পুতিনের প্রত্যাবর্তন থেকেই স্পষ্ট।

আইনসভা/নির্বাহী বিভাগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দুর্বল আইনসভা ক্ষমতাসীনদের অনুকূলেই যায়। তবে আইনসভা থাকা এবং তাকে কার্যকর রাখা যেহেতু ক্ষমতাসীনদের জন্য বাধ্যতামূলক (তাদের বৈধতা ও গণতান্ত্রিক আবহ বজায় রাখতে) সেহেতু তা বিরোধীদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়।

তৃতীয় ক্ষেত্র—বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংকর শাসনব্যবস্থা, বিশেষত প্রতিভূ গণতন্ত্র, অব্যাহত রাখার একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। লেভিৎস্কি এবং ওয়ে (২০০২) বলছেন যে এটা সাধারণত করা হয়ে থাকে উৎকোচ প্রদান বা জোর করার মাধ্যমে এবং যদি সম্ভব হয় তবে বিচারক ও আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং চাকরিচ্যুতির মাধ্যমে। ব্রাউন এবং ওয়াইজ (২০০৪) ইউক্রেনের ওপর গবেষণার ভিত্তিতে বলেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট বা সাংবিধানিক আদালত কেবল সাংবিধানিক বিষয় ও আইনের মৌলিক নীতির সালিসকারীই হয় না, বরং ক্ষমতাসীনদের অধিবক্তা/সমর্থক হিসেবেও কাজ করে।

একম্যান তাঁর গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন যে এ ধরনের ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কাঠামোগত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভূমিকা হচ্ছে সাহায্যকারীর। কাঠামোগত উপাদান হচ্ছে দুর্বল বা অকার্যকর বিরোধী শক্তি এবং 'সাধারণ নাগরিক ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যোগাযোগের অভাব' (একম্যান, ২০০৯ : ২৫)। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সিভিক কালচার বা বহুত্ববাদী সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এবং রাজনীতির ব্যাপারে হতাশা/অনুৎসাহিতা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

যেসব পদ্ধতি ও সহায়ক কারণ এ ধরনের সংকর শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে তা কোনো অবস্থাতেই এর ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্দেশ করে না। এসব থেকে বাংলাদেশে যে প্রতিভূ গণতন্ত্র বিরাজ করছে তার ভবিষ্যৎও নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে প্রতিভূ গণতন্ত্র থেকে ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে চাইলে এসব পদ্ধতির বাস্তবায়ন রোধ ও সহায়ক কারণগুলো মোকাবিলা করা যে জরুরি, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সাম্প্রতিক কালে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সত্ত্বেও গত দুই দশকে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 'সাফল্য' এখনো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়।

২. সিমের লিপসেটের এই প্রবন্ধের কতিপয় দিক ভুলভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে বলেই আমার ধারণা। লিপসেট তাঁর লেখায় প্রত্যক্ষভাবে মাথাপিছু আয় ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক দেখাননি। বরং তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতিকে একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় বলেই যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'যে সমাজ ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও ছোট আকারের সুবিধাভোগী এলিটে বিভক্ত সেখানে গোষ্ঠী শাসন (Oligarchy) বা পীড়নমূলক ব্যবস্থা (Tyranny) তৈরি হবে' (লিপসেট, ১৯৫৯ : ৭৫)।

৩. জোয়াকিম একম্যান তাঁর প্রবন্ধে সম্ভাব্য ৫৯টি সংকর শাসনব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে ছয়টি সূচকের ভিত্তিতে এই দেশগুলোকে বিবেচনা করেন। এর মধ্যে তিনটি দেশ—রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা ও তানজানিয়া—নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর এই তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি যেসব উৎস ব্যবহার করেছেন এই প্রবন্ধে তার বাইরে একাধিক সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সূচকের জন্য একম্যান একটি সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আমরা অনেক সূচকের ক্ষেত্রে একাধিক সূত্রকে বিবেচনা করেছি। একম্যানের ব্যবহৃত একটি সূচক 'গণতান্ত্রিক মানের অনুপস্থিতি'কে সুনির্দিষ্টকরণের জন্য আমরা 'জবাবদিহির অনুপস্থিতি' বলে বর্ণনা করেছি।

৪. প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, একম্যানের তালিকায় যে পাঁচটি দেশে পাঁচটির বেশি সূচক সে দেশে সংকর গণতন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। অন্য দেশগুলো হলো : রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, জর্জিয়া ও মালাওয়াই।

৫. ২০১১ সালের ১৮ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের (বিওআই) প্রধান কার্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে বলেন, 'আমার প্রশ্ন হলো, কে বেশি দেশপ্রেমিক এবং দেশের স্বার্থের বিষয়টি আমার চেয়ে কে বেশি ভাবে?' (*প্রথম আলো*, ১৯ জুন, ২০১১)

৬. সপ্তম সংসদে (১৯৯৬-২০০১) এই কথাটি বলেছেন বেগম খালেদা জিয়া। স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে বেগম জিয়া ট্রেজারি বেঞ্চকে উদ্দেশ করে এই কথাটি বলেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

Almond, Gabriel and Verba, Sidney. 1963. *The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ : Princeton University Press.

Bogaards, Matthijs. 2009. 'How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism', *Democratization*, 16 (1) : 399-423.

Bollen, Kenneth and Robert Jackman. 1989. 'Democracy, Stability and Dichotomies', *American Sociological Review*, Vol. 54, no. 4 : 612-621, 1989.

Brown, Trevor L and Charles R. Wise, 2004. 'Constitutional Courts and Legislative-Executive Relations : The Case of Ukraine', *Political Science Quarterly* 119 (1) : 143-69.

Carothers, Thomas. 2002. 'The End of the Transition Paradigm?', *Journal of Democracy*, 13(1) : 5-12.

Chandler, David. 2000. *Bosnia : Faking Democracy After Dayton*. London : Pluto Press.

Dahl, Roberts. 1972. *Polyarchy : Participation and Opposition*. New Haven : Yale University Press.

Diamond, Larry. 2008. *The Spirit of Democracy*. New York : Times Books.

Diamond, Larry. 2006. 'Is the Third Wave Over?', *Journal of Democracy* 7 (July): 20-37.

Diamond, Larry. 2002. 'Thinking about Hybrid Regimes', *Journal of Democracy*, 13(2): 21-35.

Diamond, Larry. Ed. 2001. *The Global Divergence of Democracy*. London : Johns Hopkins University Press.

Diamond, Larry. 2000. 'The end of the third way and the start of the fourth'. In *Democratic Invention*, edited by Marc F. Plattner, and Joao Carlos Espada. London : Johns Hopkins University Press.

Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy* : Toward Consolidation. London : Johns Hopkins University Press.

Diamond, Larry. 1993. 'Three paradoxes of democracy'. In *The Global Resurgence of Democracy*, edited by Larry Diamond, and Marc Plattner. London : Johns Hopkins University Press.

Ekman, Joakim. 2009. 'Political Participation and Regime Stability : A Framework for Analyzing Hybrid Regimes', *International Political Science Review* 30(1): 7-21.

Fukuyama, Francis. 1991. *The End of History and the Last Man*. New York : Free Press.

Fukuyama, Francis. 1989. 'The End of History?', *The National Interest*, Summer.

Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century.,* Norman : University of Oklahoma Press.

Levitsky, Steven and Lucan Way. 2002. 'The Rise of Competitive Authoritarianism', *Journal of Democracy*, 13(2): 51-65.

Lipset, Seymour Martin. 1959. 'Some Social Requisites of Democracy, Economic Development and Political Legitimacy', *American Political Science Review* 53(1): 69-105.

Moore, Barrington. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston, MA : Beacon Press.

Nathan, Andrew J. 2003. 'Authoritarian resilience'. *Journal of Democracy*, 14(1), 6-17.

O'Donnell, Guillermo. 1998. 'Horizontal Accountability in New Democracies', *Journal of Democracy*, 9(3): 112-126.

O'Donnell, Guillermo. 1994. 'Delegative Democracy', *Journal of Democracy*, 5(1): 55-69.

O'Donnell, Guillermo and Philippe Schmitter, 1986. *Transitions from Authoritarian Rule : Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1986.

Ottaway, Marina. 2003. 'Promoting democracy after conflict : the difficult choices'. *International Studies Perspectives*, 4(3), 314-322.

Pridham, Geoffrey, 2005. *Designing Democracy : EU Enlargement and Regime Change in Post Communist Europe*. New York : Palgrave Macmillan.

Puhle, Hans-Jurgen. 2005. 'Democratic Consolidation and "Defective Democracies"', Madrid : Universidad Autonoma de Madrid, Working Papers Online Series Working Paper 47.

Rabkin, Rhoda. 1992. 'The Aylwin Government and "Tutelary" Democracy : A Concept in Search of a Case?', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 34(4): 119-194, 1992-1993.

Riaz, Ali. 2010. 'Dynastic Politics and the Political Culture of Bangladesh', *Journal of International Relations*, 8(II): 1-16.

Sartori, Giovanni. 1987. *The Theory of Democracy Revisited*. New Jersey : Chatam House.

Schedler, Andreas. 2002. 'The Menu of Manipulation', *Journal of Democracy*, 13(2): 36-50.

Schumpeter, Joseph. 1946/1950. *Capitalism, Socialism and Democracy*, 3rd edition. London : Allen and Unwin.

Smulovitz, Catalina and Enrique Peruzzotti, 2000. 'Societal Accountability in Latin America', *Journal of Democracy*, 11(4): 147-158.

Vanhanen, Tatu. 1997. *Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries*. London : Routledge.

Zakaria, Fareed. 1997. 'The Rise of Illiberal Democracy', *Foreign Affairs*, November-December.

Zakaria, Fareed. 2007. *The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and Abroad*, New York : W.W. Norton & Company.

রাজনীতি

নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি

নজরুল ইসলাম*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারত। ভৌগোলিকভাবে তিন দিক থেকে ভারত বাংলাদেশকে ঘিরে আছে। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও ভারত ও বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ব্রিটিশ শাসনের শেষাবধি এ দুই দেশ একই ইতিহাসের অংশীদার ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাফল্যের পেছনে ভারতের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক সে কারণে খুবই প্রত্যাশিত এবং আবশ্যক। ভারত একটি বৃহৎ দেশ। অর্থনৈতিক সক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে ভারত সমৃদ্ধ। বিগত দুই দশক ধরে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম একটি বৃহৎ এবং দ্রুত ধাবমান দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে বাংলাদেশ বেশ উপকৃত হওয়ার আশা করতে পারে বৈকি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আশানুরূপ ধারায় অগ্রসর হয়নি। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে, একটি অন্যতম কারণ হলো নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা।

বাংলাদেশ মূলত বিভিন্ন নদ-নদী দ্বারা গঠিত একটি ব-দ্বীপ। এসব নদ-নদীর বেশির ভাগ ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং শেষাবধি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ভারত এসব নদ-নদীর পানি অপসারণ করে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং এ

---

* সহসভাপতি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বিশ্ব সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব।
লেখকের ই-মেইল ঠিকানা : sr.n.islam@gmail.com

দেশের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফারাক্কা এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গজালডোবাসহ অন্যান্য বহু বাঁধ। সে জন্য ভারতের কথা উঠলে এখন বাংলাদেশিদের এসব বাঁধের কথাই বেশি মনে পড়ে। নদ-নদী বিষয়ে ভারতের আচরণ বাংলাদেশের মানুষের কাছে অন্যায্য বলে অনুভূত হয় এবং এই অনুভূতিই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে কাজ করছে।

কিন্তু যে ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ভারত বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিতে পারছে, সেই একই ভৌগলিক কারণে ভারত স্বীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে সহজে পৌঁছানোর প্রয়োজনে ট্রানজিট পেতে বাংলাদেশের কাছে মুখাপেক্ষী। অন্যথায় এসব রাজ্যে পৌঁছাতে ভারতকে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার মাত্র ২২ মাইল প্রস্থের সরু অংশের ওপর নির্ভর করতে হয়। দীর্ঘ ও সমস্যাসংকুল এ পথের ওপর নির্ভর করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন অর্জন দুরূহ। অথচ, উন্নয়নের অভাব এসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম কারণ। ফলে, ট্রানজিটের ইস্যু ভারতের জন্য স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বের; এর সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ইস্যু জড়িত।

সুতরাং, নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি হতে পারে। এই ফর্মুলার মাধ্যমে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অর্জিত স্বীয় সুবিধা পরস্পর বিনিময় করে নিতে পারে। এ ফর্মুলার অধীনে ভারত বাংলাদেশে প্রবাহিত সব নদ-নদী উন্মুক্ত করে দেবে, যাতে সেসব নদীর স্বাভাবিক পূর্ণ প্রবাহ বাংলাদেশে পৌঁছাতে পারে। বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেবে। নিঃসন্দেহে ট্রানজিট ইস্যুর আরও বহু দিক আছে এবং সেসব ইস্যুর যথাযথ সমাধান হতে হবে। কিন্তু এখানে মূল সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক। বাংলাদেশের জন্য এ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি কেবল তখনই নেওয়া সঙ্গত, যখন এর বিনিময়ে সে কোনো স্ট্র্যাটেজিক সুফল অর্জন করবে। একইভাবে ফারাক্কা, গজালডোবা প্রভৃতি বাঁধ অপসারণ করে নদ-নদীগুলো উন্মুক্ত করা ভারতের জন্যও একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও ভারতকে বিনিময়ে একটা স্ট্র্যাটেজিক সুফল পেতে হবে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিটের সুযোগ ভারতের জন্য তেমনই একটি স্ট্র্যাটেজিক সুফল।

বলা দরকার যে নদীর-বিনিময়ে-ট্রানজিট ফর্মুলার প্রতি বিরোধিতা প্রবল। বাংলাদেশের অনেকে মনে করেন যে নদ-নদীর বাধাহীন প্রবাহ বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক, প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার ও প্রাপ্য। এ প্রাপ্য আদায়ের জন্য বিনিময়ে কিছু দেওয়ার প্রস্তাব তাঁরা সংগত মনে করেন না। তদুপরি তাঁরা মনে করেন যে ট্রানজিট একটি স্বতন্ত্র বিষয়, এবং সে বিষয়ে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত হতে হবে। এ বক্তব্য প্রসঙ্গে বলা দরকার যে নদ-নদীর বাধাহীন প্রবাহ বাংলাদেশের প্রাপ্য হলেও বাস্তবে ভারত এ প্রাপ্য স্বীকার করছে না এবং ক্রমাগতভাবে এ প্রবাহ আরও হ্রাস করছে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ এযাবৎ এই প্রাপ্য আদায় করতে পারেনি। অন্যদিকে ভারত এ সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণেরও বিরোধী। ভারতের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এ সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে পারে ঠিকই। কিন্তু ভারতের সম্মতি ভিন্ন

এসব ফোরাম এ ইস্যু আলোচনার জন্য গ্রহণ করবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। তদুপরি, তা করলেও এসব ফোরামের (স্বীয় অভিমতবিরোধী) কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেবে বলে কোনো লক্ষণ ভারত এযাবৎ প্রদর্শন করেনি। এই অবস্থায় নদ-নদীবিষয়ক প্রাপ্য আদায়ে বাংলাদেশের নিকট আর কী পথ খোলা আছে? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার যাঁরা বিরোধীতা করছেন তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে ভারতের অনেকে মনে করেন যে যেহেতু তাদের ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেহেতু নদ-নদীর প্রবাহ অপসারণের অধিকার তাঁদের আছে। তদুপরি, তাঁরা মনে করেন যে বর্তমান যুগে ট্রানজিট একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রীতি। সুতরাং, ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশ মাশুল, শুল্ক ইত্যাদি দাবি করতে পারে; কিন্তু নদ-নদীর প্রবাহ একটা ভিন্ন বিষয় এবং ট্রানজিটের বিনিময়ে নদ-নদীর প্রবাহ দাবি করা যৌক্তিক নয়।

দেখা যাচ্ছে, নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরা কোনো কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করতে পারছেন না। তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও এ দুই ইস্যুর উৎস একই। সেটি হলো র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে নির্ধারিত ভৌগোলিক সীমানা। এই ভৌগলিক সীমানাই নদ-নদীর পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতকে নির্ধারণী ভূমিকা প্রদান করেছে, এবং এর ফলে, ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার সম্ভব হচ্ছে। আবার এই সীমানার কারণেই বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট লাভ করা ভারতের পক্ষে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে ট্রানজিট প্রদানে অস্বীকৃত হবার সুযোগ থাকছে। সুতরাং, এ দুই ইস্যু একই সমস্যার এপিঠ-ওপিঠ; এবং এ দুয়ের যুগপৎ সমাধান সম্ভব। নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট হলো সেই সমাধানের ফর্মুলা। যত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ ও নীতিনির্ধারকেরা এই ফর্মুলার উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারেন ততই মঙ্গল, কেননা তার ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কোন্নয়নের পথে মূল বাধাটি অপসারিত হবে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার কাঠামোটি নিম্নরূপ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও তার প্রভাবের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসবে যে ভূরাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সবটা নির্ধারণ করে না; বরং দ্বিপক্ষীয় বহু সমস্যাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে এরূপ দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির ইস্যু। চতুর্থ অনুচ্ছেদে এ ইস্যুটি আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। পঞ্চম অনুচ্ছেদে আমরা দেখবো যে এ সমস্যার উদ্ভবের কারণ হলো নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি' (Commercial Approach), যা শিল্পবিপ্লবেরই একটি ফলশ্রুতি। কিন্তু কালক্রমে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কুফলগুলো প্রকট হয়ে ওঠায় এর বিপরীতে নদ-নদীর প্রতি 'প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি' (Ecological Approach) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে

এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে দেখা যাবে, শুরুতে কেবল উন্নত বিশ্বে প্রসার লাভ করলেও ক্রমান্বয়ে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নশীল বিশ্বেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত ফারাক্কা ও গজালডোবাসহ অভিন্ন নদ-নদীর ওপর ভারত কর্তৃক নির্মিত বাঁধগুলোর অভিজ্ঞতা আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে সামগ্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি বিচারে এসব বাঁধ কল্যাণকর নয়। অষ্টম অনুচ্ছেদে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বিশেষ পরিস্থিতির আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এসব রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য ট্রানজিট সুযোগের স্ট্র্যাটেজিক মূল্যটি পরিস্ফুট করা হয়েছে। নবম অনুচ্ছেদে দেখানো হবে যে জলবায়ু পরিবর্তন নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণকে আরও জরুরি করে তুলেছে। এদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের ক্ষেত্রে ভারতের উজানে রয়েছে চীন। এ উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে চীন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি উত্তরাভিমুখী অপসারণের পরিকল্পনা করছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। দশম অনুচ্ছেদে দেখানো হবে যে কেবল নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমেই ভারত চীনের এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে পারে এবং বাংলাদেশকে সে বিরোধিতায় পাশে পেতে পারে। একাদশ অনুচ্ছেদে নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট প্রস্তাবটি তুলে ধরা হবে। দ্বাদশ অনুচ্ছেদে দেখানো হবে যে নদীবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলাকে সমর্থন করে। সবশেষে ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে কিছু উপসংহার পরিবেশনের মাধ্যমে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা হবে।

২. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষিত

আশির দশকের শেষ পর্যন্ত পৃথিবী মূলত দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবির। অন্যটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলেও সাধারণভাবে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গেই অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক একটা ঘনিষ্ঠতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সংবিধান সংশোধন করে 'সমাজবাদ'কে একটি লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভ্যুদিত বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হিসেবেও 'সমাজতন্ত্র' গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর মস্কো সফরকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশেরও দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুতরাং সে সময় ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ও বাংলাদেশ একই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তা এ দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য সহায়ক হয়।

সোভিয়েত-ভারত-বাংলাদেশ এক্সিসের বিপরীতে ছিল যুক্তরাষ্ট্র-চীন-পাকিস্তান এক্সিস। মতাদর্শগত ও অন্যান্য কারণে সোভিয়েতবিরোধিতার সূত্রে চীন সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র তাতে ইতিবাচক সাড়া দেয়। মার্কিন-ঘনিষ্ঠ পাকিস্তান চীন-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়নের এ প্রচেষ্টায় দূতিয়ালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সে কারণেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হেনরি কিসিঞ্জারের এত বেশি বিরক্তির উদ্রেক করে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহরও ভারত মহাসাগর অভিমুখে রওনা করায়। কেবল সোভিয়েতের পাল্টা সামরিক হুমকি এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোই যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিজয় অর্জন করে।

কিন্তু ১৯৭১ সালের এ পরাজয় মার্কিনেরা সহজে মেনে নেয় না এবং বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে।[১] এই ষড়যন্ত্রের ধারাতেই অবশেষে ১৯৭৫ সালে সামরিক ক্যুর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি মার্কিনপন্থী সরকার অধিষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯৭৫ সালের পর থেকে ভারত এবং বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে অবস্থান নেয়। ভারত থেকে যায় সোভিয়েত শিবিরে; অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রকারান্তরে মার্কিন শিবিরে প্রবেশ করে। এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ভূরাজনৈতিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এ দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ডেকে আনে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর দুই পরাশক্তিভিত্তিক দ্বিমেরুসম্পন্ন পৃথিবীর অবসান ঘটে। ভারতও সে সময় থেকে পূর্বতন সমাজতন্ত্রভাবাপন্ন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী মুক্তবাজারমূলক নীতিমালা গ্রহণ করতে শুরু করে। এ দুই ধারার পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সুতরাং, নব্বইয়ের দশক থেকে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই আবার একই ভূরাজনৈতিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সে কারণে এ দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু গোটা পরিস্থিতি এত সরলও নয়। বাংলাদেশ-ভারত সংশ্লিষ্ট ভূরাজনীতিতে আরেক শক্তি হলো পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের সম্প্রসারণবাদী ইসলামি মতাদর্শ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে এ শক্তির সম্পর্ক বৈপরীত্যমূলক। ধর্মীয় সূত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে ঐতিহাসিক বৈরিতা, তা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকেন্দ্রিক দ্বিমেরুসম্পন্ন পৃথিবীর অবসানের সঙ্গে তিরোহিত হয় না। ১৯৭৫ সালের পর থেকে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলের অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট সম্প্রসারণবাদী ইসলামি শক্তি বাংলাদেশের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো ভারতের জন্য একটি সমস্যাসংকুল এলাকা। এ এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান ও সম্প্রসারণবাদী ইসলামি শক্তি বাংলাদেশকে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র তৎপরতাকে সহায়তা দেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকেন্দ্রিক দ্বিমেরুসম্পন্ন পৃথিবীর অবসান এবং আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ও বাংলাদেশ সাধারণভাবে একই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জটিল থেকে যায়।

৩. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সমস্যাবলি

কিন্তু ভূরাজনৈতিক সমস্যাবলিই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা নয়। এ ক্ষেত্রে রয়েছে আরও বহু স্বার্থের সংঘাত। এর মধ্যে একটি হলো সীমান্তসংক্রান্ত। ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যে সীমান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে বেশ কিছু বিষয় অমীমাংসিত থাকে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিভিন্ন ছিটমহলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যাতায়াতসংক্রান্ত। সমুদ্রসীমার বিষয়েও সংঘাত রয়েছে। সীমান্তের একটা বড় অংশজুড়ে ভারত ইতিমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে। সীমান্ত ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত হলো সীমান্তরক্ষীদের আচরণ। বাংলাদেশের অভিযোগ রয়েছে যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা অযাচিত ও অন্যায্যভাবে বাংলাদেশিদের ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যা করে। কিছুকাল আগে গুলি করে হত্যা করার পর ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা ফেলানী নামের এক বাংলাদেশি কিশোরীকে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়েও রাখে। সম্প্রতি ঘুষ না দেওয়ার কারণে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের এক বাংলাদেশি যুবককে উলঙ্গ করে নির্বিচার প্রহার করার ঘটনা বাংলাদেশিদের অনুভূতিকে আঘাত করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা হলো বাণিজ্যসংক্রান্ত। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে যে বিভিন্ন শুল্ক ও শুল্কবহির্ভূত বিধিনিষেধ দ্বারা ভারত স্বীয় দেশে বাংলাদেশের পণ্য আগমনকে বাধাগ্রস্ত অথবা নিরুৎসাহিত করছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের বিশাল উদ্বৃত্ত বিরাজ করছে। চোরাচালানির মাধ্যমে সম্পাদিত অবৈধ বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে এ উদ্বৃত্ত আরও অনেক বেশি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।[২] বাণিজ্যে ক্রমাগতভাবে একতরফা উদ্বৃত্ত স্থিতিশীলতার জন্য অনুকূল নয়।

বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হলো বিভিন্ন ধরনের প্রবেশাধিকার। এর একটি উদাহরণ হলো টেলিভিশনের সম্প্রচারের ক্ষেত্র। যেখানে ভারতীয় চ্যানেলগুলো বাংলাদেশে অবাধে সম্প্রচারিত হতে পারছে, সেখানে বাংলাদেশি চ্যানেলগুলো ভারতে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং, ভূরাজনৈতিক অবস্থান থেকে উদ্ভূত সমস্যাদি ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ সমস্যার ক্ষেত্রে বহুবিধ দ্বিপক্ষীয় সমস্যা রয়েছে। এসব দ্বিপক্ষীয় সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা।

৪. নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা

বাংলাদেশ মূলত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা দ্বারা গঠিত একটি ব-দ্বীপ। কিন্তু এসব নদ-নদী (অথবা তাদের উৎস নদীগুলো) ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং শেষাবধি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ভারত এসব নদ-নদীর পানি অপসারণ করে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং এ দেশের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধের মাধ্যমে ভারত গঙ্গা নদীর পানির একটা বড় অংশ বাংলাদেশের পদ্মা থেকে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি-ভাগীরথী নদীতে প্রবাহিত করছে। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীগুলো ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। একই ধারার দ্বিতীয় উদাহরণ হলো গজালডোবা বাঁধ। এ বাঁধের মাধ্যমে তিস্তাপ্রবাহের একটা বড় অংশ ভারত অপসারণ করে নিচ্ছে। ফারাক্কা ও গজালডোবা ছাড়াও অভিন্ন নদ-নদীর প্রায় সব কটির ওপরই ভারত পানি প্রত্যাহার কিংবা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো নির্মাণ করেছে, নির্মাণে রত কিংবা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে (চিত্র-১)। ভারতের এই আচরণের ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে এবং তীরবর্তী জনপদগুলোর প্রকৃতি ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (চিত্র-২, ৩, এবং ৪ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এযাবৎ নদ-নদী ভাগাভাগি সমস্যার বিশেষ সুরাহা হয়নি। ১৯৭৪ সালে ভারত যখন ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ক্ষমতায়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব তখন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এ সত্ত্বেও ভারত ফারাক্কা বাঁধসংক্রান্ত স্বীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিধা করেনি। এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভূরাজনৈতিক বলয়গত অবস্থান অথবা রাজনৈতিক বন্ধুত্বের ঘাটতিই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

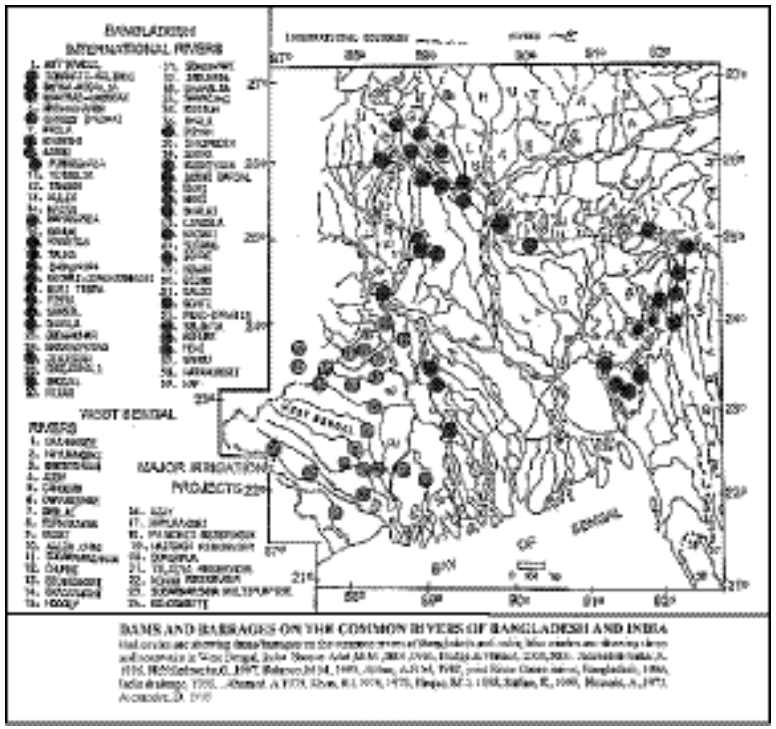

চিত্র-১ : বাংলাদেশের চারপাশে অভিন্ন নদ-নদীর ওপর ভারতের নির্মিত, নির্মাণাধীন এবং পরিকল্পিত প্রবাহ বিঘ্ন ও অপসারণকারী কাঠামো

চিত্র-২ : ফারাক্কার কারণে শুকিয়ে যাওয়া পদ্মা নদী (হার্ডিঞ্জ সেতুর নিচে)

চিত্র-৩ : ফারাক্কার কারণে শুকিয়ে যাওয়া গড়াই নদী (গড়াই সেতুর নিচে)

উন্নয়নের পথে একমাত্র বাধা নয়। তারপর থেকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তিস্তা নদীর পানির ভাগাভাগি ও বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধের ইস্যু এ দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নের প্রয়াসকে একটা অচলাবস্থায় উপনীত করেছে।

চিত্র-৪ : গজালডোবা বাঁধের কারণে শুকিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের তিস্তা নদী (কাউনিয়ার কাছে)

ভারতের প্রস্তাবিত 'নদী সংযোগ প্রকল্প' (River Linking Project, RLP) (চিত্র-৫) নদী ভাগাভাগির সমস্যা আরও কঠিন সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে ব্রহ্মপুত্র নদ ও গঙ্গা নদী ও তাদের বিভিন্ন উপনদীর পানি ১৪টি নতুন খনন করা খালের মাধ্যমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত অভিমুখে প্রবাহিত করা হবে। ফারাক্কার কারণে গঙ্গাপ্রবাহ হ্রাসের পর এখন ব্রহ্মপুত্র নদই বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রায় ৭০ শতাংশের উৎস। নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে যদি ভারত ব্রহ্মপুত্র নদের পানিও অপসারিত করে, তাহলে বাংলাদেশের বাকি অধিকাংশ নদ-নদী শুকিয়ে যাবে এবং এ দেশের অর্থনীতি ও প্রতিবেশ এক গভীর সংকটে নিপতিত হবে।

রণজিৎ কুমার নামের একজন আইনজীবীর প্ররোচনায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০০২ সালে একবার নদী সংযোগ প্রকল্পের সুপারিশ করেছিল।[৩] কিন্তু বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে এবং এ ব্যয়বহুল প্রকল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয়ের কারণে ভারতের তদানীন্তন সরকার এ প্রকল্পের সর্বাত্মক অনুমোদন ও বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ২৭

ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে রণজিৎ কুমার আবার ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে নদী সংযোগ প্রকল্পের পক্ষে রায় প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। এবারের রায়টি আরও বেশি কড়া। এ রায়ে ভারত সরকারকে ৩০ দিনের মধ্যে নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে ২০১৬ সালের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারক করার জন্য আদালত নিজেই একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন এবং মান্যবর রণজিৎ কুমারকে তার একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ কোটি রুপি।[৪]

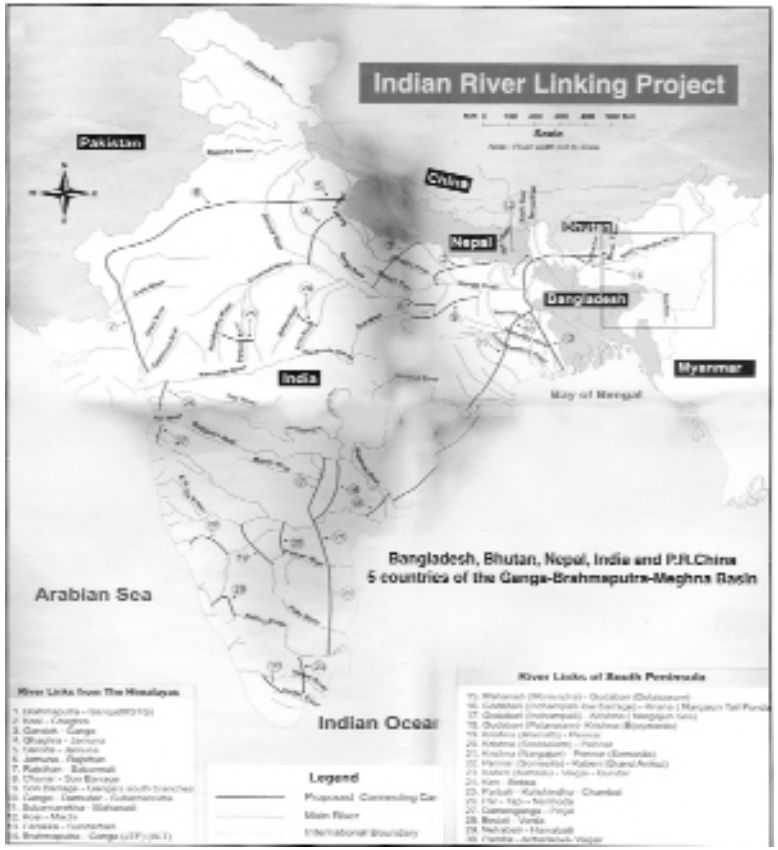

চিত্র-৫ : ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প

এ প্রকল্পের অধীনে মোট ৩০টি সংযোগ খালের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা এবং এই অববাহিকার অন্যান্য উপনদী থেকে পানি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত করা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের মূল কাজ হলো নিম্ন আদালতগুলোর বিভিন্ন রায় দেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা ও নিশ্চিত করা। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ সম্প্রসারণ কীভাবে অর্জিত হতে পারে, তার জন্য প্রকল্প নির্বাচন করা তার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। বিচারকদের সে পারদর্শিতা থাকার কথা নয়। এ কাজ করার দায়িত্ব দেশের সরকারের। তদুপরি নদী সংযোগ প্রকল্প দ্বারা যেসব হিমালয়প্রসূত নদ-নদীর পানি ভিন্নমুখে প্রবাহিত করার কথা, সেগুলো আন্তর্জাতিক নদী; ভারতের অভ্যন্তরীণ নদী নয়। কাজেই এসব নদ-নদীর বিষয়ে বাংলাদেশের সম্মতি ভিন্ন কোনো পদক্ষেপ ভারত নিতে পারে না। এ সত্ত্বেও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে এরূপ একটি অবিবেচনাপ্রসূত ও অপরিণামদর্শী আদেশ দিতে পারলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

ভারত সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে নির্মিত পানি প্রত্যাহারমূলক প্রকল্পগুলো এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নদী সংযোগ প্রকল্পবিষয়ক ওপরে আলোচিত আদেশের পেছনে রয়েছে নদ-নদীর প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ভিন্ন ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার নদীর পানি ভাগাভাগি সমস্যার সমাধান অর্জন করা কঠিন। কাজেই এ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এবার নজর দেওয়া যাক।

৫. নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি'

ভারত কর্তৃক অভিন্ন নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো নির্মাণের অন্যতম তলবর্তী কারণ হলো নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি'।[৫] এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নদ-নদীর পানি সমুদ্রে চলে যেতে দেওয়া অপচয়; বরং সবটা পানিই বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শুষে নিতে হবে। নদ-নদীর প্রতি এ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে আরও আছে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ওপর অর্জিত প্রভুত্বকে আরও অগ্রসর করার বাসনা। শিল্পবিপ্লবের আগপর্যন্ত প্রকৃতির ওপর মানুষের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ; বরং প্রকৃতির কাছে মানুষ বেশ অসহায়ই ছিল। তখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তির জন্য মানুষ মূলত নিজের এবং পশুর কায়িক শক্তির ওপরই নির্ভর করত। শিল্পবিপ্লবের আগেও বায়ু ও জলপ্রবাহ শক্তির কিছু ব্যবহার অর্জিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তার চরিত্র ও ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ ছিল।

শিল্পবিপ্লব প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকে সুগম করে। উৎপাদনের চালিকাশক্তি হিসেবে যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমাবস্থায় এসব যন্ত্র জলপ্রবাহজনিত শক্তি নির্ভর হলেও দ্রুতই তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই অগ্রগতি আরও উঁচু স্তরে উন্নীত হয়।

প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব অর্জনের এ ধারাতেই মানুষ নদ-নদীকে জয় করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয় এবং বৃহদাকার বাঁধ দ্বারা নদীপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপের সূচনা ঘটে। বাঁধ দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় এসব প্রচেষ্টা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

শিল্প-পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বাঁধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতায় পরিণত হয়।

একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংঘটিত কতিপয় পরিবর্তনও নদ-নদীকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। শিল্পবিপ্লবসৃষ্ট প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব অর্জনের ধারা কৃষিক্ষেত্রেও অগ্রসর হয়। কৃত্রিম উপায়ে উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় এবং এসব বীজ দ্বারা ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম সেচব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে ওঠে। এ ছাড়া শিল্পবিপ্লব জনসংখ্যার স্ফীতি ডেকে আনে; এবং বর্ধিত এ জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্যও আরও বেশি জমিতে চাষাবাদের প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য সেচের পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রবাহনিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচ সম্প্রসারণ এ ত্রিমুখী উপকারের প্রত্যাশায় নদ-নদীর ওপর ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সত্যিই নদীর পানিকে আর সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তার আগেই প্রবাহের সবটুকু শুষে নেওয়া হয়। আমেরিকার কলোরাডো নদী এ প্রক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ। প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছানোর আগেই এ নদী এখন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে প্রাণ হারায়। একই পরিণতি ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার ডার্লিং-মারে নদীর।

শিল্প-পুঁজিবাদী দেশগুলোতে উদ্ভূত নদ-নদীর প্রতি এ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে উন্নয়নশীল, উপনিবেশিত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও বিস্তৃত হয়। বিশেষত ভারত এবং চীন নদ-নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে; বাঁধের সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুই দেশ উন্নত, শিল্প পুঁজিবাদের দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়।

ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প এ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রকল্পের প্রস্তাবকদের মতে কোনো কোনো নদী অববাহিকা উদ্বৃত্ত পানিসম্পন্ন, আর কোনো কোনো নদী অববাহিকা পানির ঘাটতিসম্পন্ন। সে কারণে প্রথমোক্ত অববাহিকাগুলো থেকে পানি কৃত্রিম খাল খননের মাধ্যমে শেষোক্ত অববাহিকাগুলোতে স্থানান্তর করতে হবে।

বলাবাহুল্য, এ ধরনের চিন্তা হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধচারিতা; বলা যেতে পারে, 'খোদার ওপর খোদকারি করা'র প্রয়াস। ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রকৃতিরই একটি অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ বৈচিত্র্যের অঙ্গ হিসেবে পৃথিবীর কোথাও পাহাড় আবার কোথাও নিম্নভূমি। তাই বলে কি পাহাড় কেটে নিম্নভূমি ভরাট করে পৃথিবীর সর্বত্র একই উচ্চতা অর্জন করতে হবে? তদ্রূপ, পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়; আবার কোথাও বৃষ্টিপাত কম হয়। প্রথমোক্ত অঞ্চলের নদ-নদীতে শেষোক্ত অঞ্চলের নদ-নদী থেকে প্রবাহ বেশি থাকে। আবার একই অঞ্চলে বছরের সব ঋতুতে একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না। সে কারণে একই নদী অববাহিকায় বর্ষাকালে প্রবাহ বেশি থাকে; আবার শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ কমে যায়। প্রতিটি অববাহিকার প্রতিবেশ, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি এসব স্থান-কাল-ভেদসম্পন্ন বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। ভূপ্রাকৃতিক এ বৈচিত্র্যই উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং 'উদ্বৃত্ত' এবং 'ঘাটতি' অববাহিকা বলে কিছু নেই। প্রতিটি অববাহিকাই তার নিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা মণ্ডিত ও স্বকীয়। প্রতিটি অববাহিকার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখাই মানবজাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা প্রকৃতিবিষয়ক এ মৌল সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। তাঁরা কেবল নদীর পানির সাক্ষাৎ উপযোগ মূল্যের সন্ধান করেন। তাঁরা ভুলে যান যে এক অববাহিকার পানি অন্য অববাহিকায় স্থানান্তরিত করা হলে উভয় অববাহিকারই ক্ষতিসাধিত হবে। ফলে তাঁরা প্রকৃতি-সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারই প্রতিফলন দেখা যায় ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্পের মধ্যে।

তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু অভিজ্ঞতা নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থার করুণ পরিণতির সাক্ষ্য দেয়। যেমন সে দেশের মধ্য এশিয়া অঞ্চলের আমু দরিয়া ও সির দরিয়া নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদী অনাদিকাল থেকে আরল সাগর অভিমুখে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ষাট ও সত্তর দশকে কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রে তুলাচাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ দুই নদীর প্রবাহের গতিমুখ পরিবর্তিত করা হয়েছিল। এতে সাময়িকভাবে তুলাচাষের কিছু বৃদ্ধি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু দ্রুত জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা প্রভৃতি সমস্যার উদ্রেক ঘটে। অন্যদিকে আমু দরিয়া ও সির দরিয়ার প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে আরল সমুদ্র ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে ও মৃত্যুমুখে উপনীত হয় (চিত্র-৬ এবং ৭ দ্রষ্টব্য)। পৃথিবীর আরও বহু স্থানেই নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের এরূপ করুণ ফলাফলের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

৬. নদ-নদীর প্রতি 'প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি'

কিন্তু ভারত ও চীনসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে যখন নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে এবং এসব দেশ বাঁধ নির্মাণে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হয়, তত দিনে খোদ উন্নত দেশগুলোতে বাঁধের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তার উদ্রেক ঘটে। অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয় যে বাঁধের লাভের দিকটিকে বাড়িয়ে দেখা হয়েছে এবং বাঁধের ক্ষতির দিকগুলোর দিকে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বাঁধবিষয়ক বিশ্ব কমিশনের রিপোর্টে (World Commission on Dams, 2000) এই উপলব্ধিটিই বেরিয়ে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাঁধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যায়, প্রায়ই ঘোষিত মাত্রার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়নি; বন্যানিয়ন্ত্রিত না হয়ে অনেক সময় বাঁধ বাড়তি বন্যার কারণ হয়েছে; সেচের নামে পানির অপচয় সাধিত হয়েছে এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে, বাঁধ দ্বারা সৃষ্ট জলাধার বিপুল এলাকাকে নিমজ্জিত করে সে এলাকার প্রকৃতিকে বিনষ্ট করেছে; নিমজ্জিত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে এবং জলাধারগুলোকে মিথেন এবং অন্যান্য উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস উদ্‌গিরণের উৎসে পরিণত করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব বাঁধ দ্বারা উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ নিমজ্জিত এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়নি; এবং যে উন্নয়নের নামে বাঁধ নির্মাণ তা এসব জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেনি। বাঁধ নদীবাহিত পলিমাটির বিচ্ছুরণকে বাধাগ্রস্ত করে একদিকে প্লাবনভূমির স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অন্যদিকে জলাধারে অতিরিক্ত পলিমাটিভরণের জন্ম দিয়েছে। বাঁধ নদীকে বিভক্ত করেছে এবং অবাধ চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে অনেক জলজ প্রাণীকে নিশ্চিহ্নতাপ্রাপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এসব ক্ষতিকারক প্রতিফলের আলোকে দেখা যায় যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিচারে

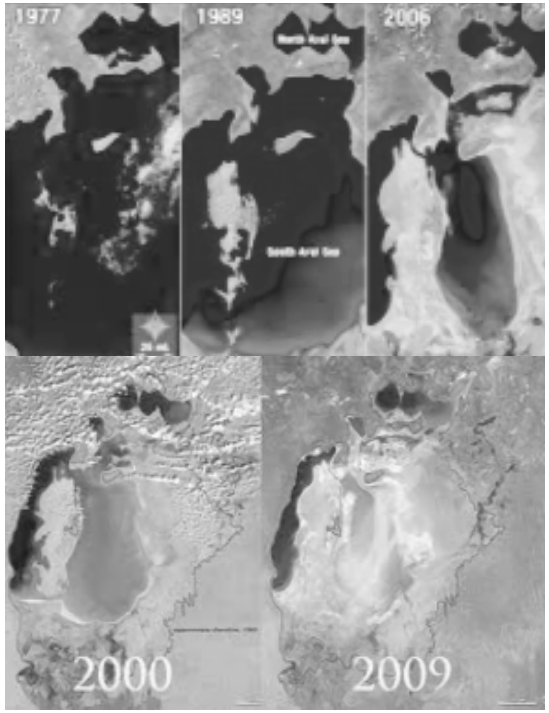

চিত্র-৬ : ক্রমহ্রাসমান আরল সমুদ্র

জলবিদ্যুৎ মোটেও সস্তা প্রমাণিত হয়নি; বরং জলবিদ্যুতের জন্য অর্থনীতি ও সমাজকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

এসব অভিজ্ঞতার কারণেই আশির দশক থেকে নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাধাগ্রস্ত না করে বরং নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের পরিমাণ ও গতিমুখ অক্ষুণ্ন রাখাই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি কৃষি কিংবা নগরায়ণের জন্য পানির প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। কিন্তু লক্ষ্য করা হয় যে এসব উদ্দেশ্যে পানির অনেক সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্ভব। বিশেষত সেচের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ হ্রাস করা যায়। যেমন, ড্রিপ পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক কম পানি দিয়েও একই মাত্রার সেচ অর্জন করা যায়। পানি-সাশ্রয়ী ফসল আবাদের মাধ্যমেও সেচের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি-সাশ্রয়ী ফসলের নতুন বীজের উদ্ভাবন করাও সম্ভব। ফলে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে সেচ সম্প্রসারণ অপরিহার্য নয়। সেচের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের মাধ্যমে জমিকে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা থেকেও রক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং, পানি-সাশ্রয়ী কৃষির মাধ্যমে শুধু নদী নয়, জমির স্বাভাবিক গুণাগুণও রক্ষা করা যায়।

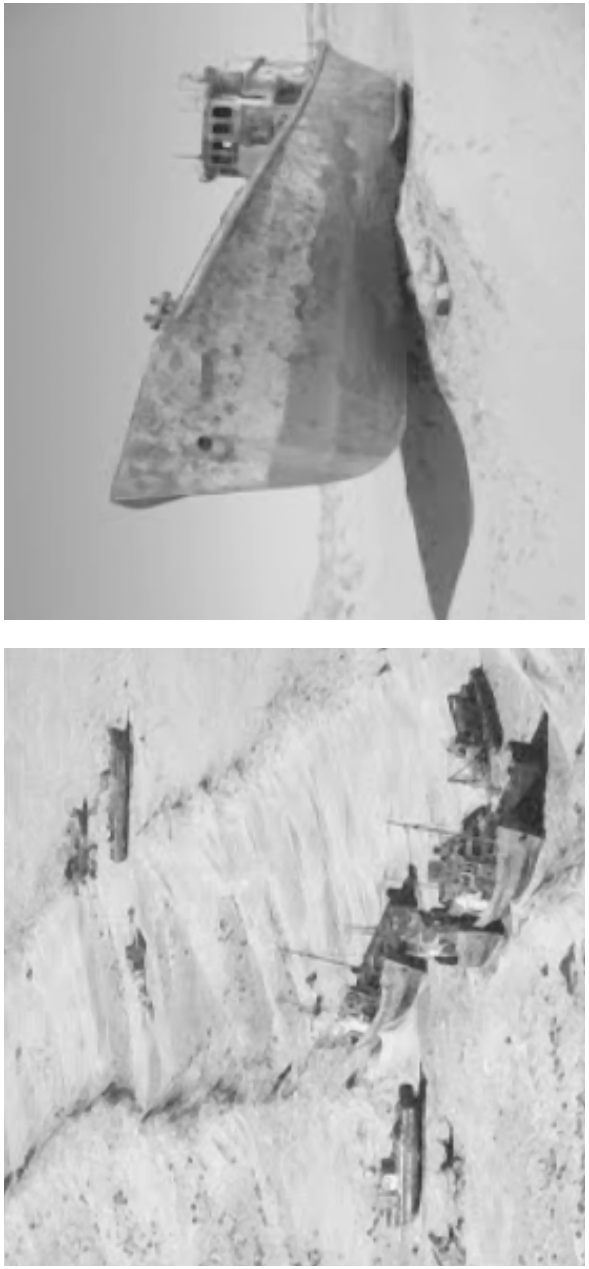

চিত্র-৭ : শুষ্ক আরল সমুদ্রের বক্ষে আটকে পড়া বহু জাহাজ

একইভাবে নগরায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণও হ্রাস করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পানির পুনর্ব্যবহার পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যায়। সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের মাধ্যমে নগরায়ণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস করা সম্ভব।

লক্ষ করা প্রয়োজন যে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধি অনেকটা আনুভূমিক থেকে উল্লম্বিক চরিত্র অর্জন করেছে (চিত্র-৮ এবং ৯ দ্রষ্টব্য)। এই উল্লম্বিক প্রবৃদ্ধি পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বিপুল চাপের সৃষ্টি করেছে। এ চাপ ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাসের উদ্‌গিরণ বৃদ্ধি ও তদ্বারা সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ (চিত্র-১০ এবং ১১ দ্রষ্টব্য)। এসব পরিণতি থেকে স্পষ্ট যে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী না হয়ে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আশার কথা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং এ দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত কর্মতৎপরতার সূচনা ঘটেছে। যেমন, উন্নত দেশগুলোতে নদ-নদীর ওপর নির্মিত বাঁধ ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে পাঁচ শতাধিক বাঁধ অপসারিত করে নদ-নদীকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে দেওয়া হয়েছে। জাপান এবং ইউরোপের অন্যান্য উন্নত দেশেও এখন নতুন বাঁধ নির্মাণ নিরুৎসাহিত হয়েছে এবং এর আগে নির্মিত বাঁধ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার আলোকে এ দৃষ্টিভঙ্গি দিন দিন আরও জোরালো হচ্ছে।

নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নশীল বিশ্বেও প্রসার লাভ করছে। তারই উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখি যে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের (বার্মা) সরকার সে দেশের ইরাবতী নদীর ওপর প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছে। চীনের সহযোগিতায় এ বাঁধটি নির্মাণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল এবং তা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট চীনা কোম্পানি আর্থিকভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কারণে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চীনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদও করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নদী, প্রকৃতি, পরিবেশ ও স্থানীয় জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়ে মিয়ানমার সরকার বাঁধ নির্মাণ বাতিলের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

একই ধারার আরেক উদাহরণ দেখা যায় সম্প্রতি লাওস সরকার কর্তৃক সে দেশে মেকং নদীর ওপর প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তের মধ্যে। বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক নদ-নদী ভাগাভাগি আলোচনায় এ উদাহরণটি আরও প্রাসঙ্গিক এ কারণে যে মেকং নদী ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল উন্নত বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়। তা ভারত ও বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী দেশগুলোতেও পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় আহরণ নিতান্তই জরুরি।

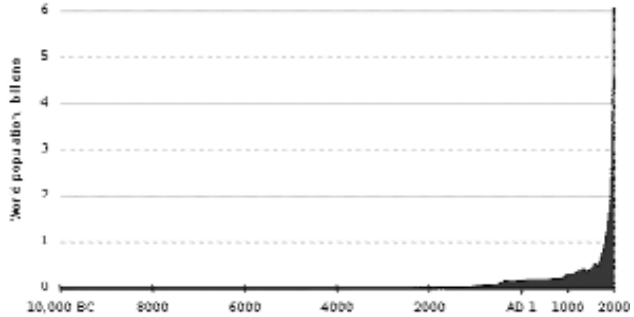

চিত্র-৮ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস
(অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা অত্যন্ত শ্লথগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এ বৃদ্ধি যেন আনুভূমিক থেকে উল্লম্বিক চরিত্র গ্রহণ করে।)
সূত্র : United Nations (2011, p. 2)

চিত্র ৯ : মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ইতিহাস
(অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের আগ পর্যন্ত মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত শ্লথগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এই বৃদ্ধি যেন আনুভূমিক থেকে উল্লম্বিক চরিত্র গ্রহণ করে।)
সূত্র : DeLong (1998) and Maddison (2007)

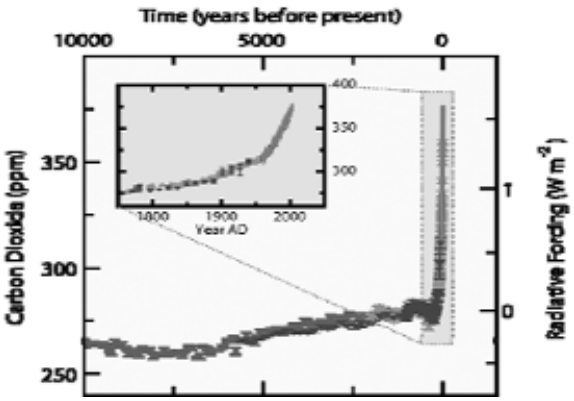

চিত্র-১০ : বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ইতিহাস
(অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের আগ পর্যন্ত বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অত্যন্ত শ্লথগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এ বৃদ্ধি যেন আনুভূমিক থেকে উল্লম্বিক চরিত্র গ্রহণ করে।)
সূত্র : Nakichenovic (2009)

৭. ফারাক্কা ও গজালডোবা বাঁধের অভিজ্ঞতা

নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ভারত কর্তৃক নির্মিত ফারাক্কা, গজালডোবা প্রভৃতি বাঁধের অভিজ্ঞতার আলোকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমেই ফারাক্কা বাঁধের (ব্যারাজের) কথা ধরা যাক। এ ব্যারাজের মূল ঘোষিত লক্ষ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধি, যাতে তা সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে কাজ করতে পারে। ফারাক্কা বাঁধের প্রায় ৪০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। দীর্ঘ এই অভিজ্ঞতার আলোকে আজ স্পষ্ট যে ফারাক্কা তার কথিত মূল লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। ফারাক্কা ভাগীরথী-হুগলি চ্যানেলে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি করলেও কলকাতাকে সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে কার্যক্ষম রাখতে পারেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ মাইল অভ্যন্তরে কলকাতা বন্দরের পত্তন করেছিল। তখনকার পালতোলা সমুদ্রগামী জাহাজের আকৃতি এবং গভীরতা ছিল স্বল্প। ৩০০ বছর পরে বর্তমানকালের সমুদ্রগামী জাহাজের আকৃতি ও গভীরতা অনেকগুণ বেশি। পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে কলকাতার পক্ষে সমুদ্রবন্দর হিসেবে কার্যক্ষম থাকা অসম্ভব ছিল এবং ফারাক্কা সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেনি। অন্যদিকে ফারাক্কা এখন বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অপ্রত্যাশিত বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বিহারের মানুষ এখন ফারাক্কা ভেঙে দেওয়ার জন্য হাতুড়ি, শাবল নিয়ে নিয়মিত মিছিল করছে।

এদিকে প্রকৃতিবিরোধী ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে এখন খোদ গঙ্গা নদীই প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। ফারাক্কায় বাধাগ্রস্ত হয়ে গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ এখন আরও উত্তরে সরে

যাচ্ছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে একসময় গোটা গঙ্গা নদীই ফারাক্কা ব্যারাজের বাইরে দিয়ে প্রবাহিত হবে; এবং তখন ফারাক্কা বাঁধ শুষ্ক নদীবক্ষে ভারতীয় অহমিকার একটি নিষ্ফলা দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।[৬]

বাঁধের হতাশাকর ফলাফলের বিষয়টি গজালডোবা ব্যারাজের জন্যও প্রযোজ্য। কোনো বন্দরের নাব্যতা রক্ষা গজালডোবা বাঁধের লক্ষ্য নয়। এ বাঁধের পেছনে কেবল একটিই যুক্তি; তা হলো সেচের সম্প্রসারণ। কিন্তু আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে এ জাতীয় সেচ প্রকল্প পানির অপচয় ডেকে আনে; জমিকে অনুপযোগী আবাদের দিকে ঠেলে দেয়; জমিতে লবণাক্ততার সৃষ্টি করে; এবং জমির গুণাগুণ বিনষ্ট করে। গজালডোবার ক্ষেত্রেও তা-ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জল-সাশ্রয়ী ফসলের নির্বাচন, ড্রিপ-সেচের মতো অধিকতর দক্ষ সেচব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে গজালডোবার মতো নদীর পানির বৃহদাকার অপসারণভিত্তিক সেচব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়াই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এসব বিকল্প পদ্ধতি শুধু পরিবেশবান্ধবই নয়, অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিচারেও অধিকতর দক্ষ।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পরিষ্কার যে অভিন্ন নদ-নদীর ওপর ভারত কর্তৃক নির্মিত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত বাঁধগুলো দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক বিচারে সুফল বয়ে আনতে পারেনি। একদিকে তা বাংলাদেশের প্রকৃতি ও অর্থনীতির সমূহ ক্ষতি ডেকে

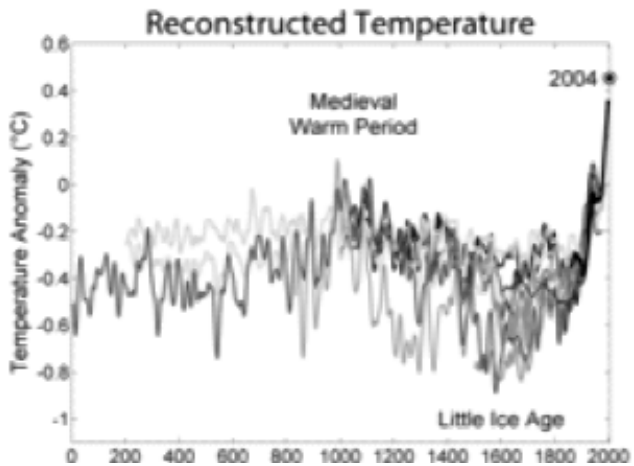

চিত্র-১১ : বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ইতিহাস
(অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের আগ পর্যন্ত বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অত্যন্ত শ্লথগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এ বৃদ্ধি যেন আনুভূমিক থেকে উল্লম্বিক চরিত্র গ্রহণ করে।)
সূত্র : United Nations (2011, p. 6)

এনেছে, অন্যদিকে তা ভারতের নিজের জন্যও বিনিয়োজিত সম্পদের অপচয় সংঘটিত করেছে। এসব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সময় এসেছে। আরও এক কারণে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তন প্রয়োজন, তা হলো ট্রানজিট।

৮. ভারতের জন্য ট্রানজিটের প্রয়োজনীয়তা

যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিতে পারছে, সে একই কারণে ভারত স্বীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পৌঁছানোর প্রয়োজনে ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। অন্যথায় এসব রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য ভারতকে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যবর্তী মাত্র ২২ মাইল প্রস্থের তথাকথিত হংস-গ্রীবার (goose neck) ওপর নির্ভর করতে হয় (চিত্র-১২)। এ সরু ও দীর্ঘ পথ দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পৌঁছানো অনেক সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। যোগাযোগের এ সমস্যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। কিন্তু আর্থসামাজিক উন্নয়নের অভাব ভারতের এসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম কারণ। সুতরাং, ট্রানজিটের ইস্যুর সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ইস্যুও জড়িত।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি সম্প্রসারণবাদী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ শক্তি ভারতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। ২০০৬ সালে চট্টগ্রামে চোরাচালান করা ১০ ট্রাক অস্ত্র আটক এবং পূর্বাপর অন্যান্য ঘটনার আলোকে স্পষ্ট যে এ প্রচেষ্টায় এ শক্তি যথেষ্ট সফলও হয়েছিল। সুতরাং, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে উন্নয়ন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রশমনের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা ভারতের বিশেষভাবে প্রয়োজন।

২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতকে এ সহযোগিতা প্রদানে স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই এগিয়ে আসে। ভারত বিভিন্ন সময়েই অভিযোগ করে আসছিল যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহিত ও সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশে, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অনেক ঘাঁটি নির্মিত হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণামতে, বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের লক্ষ্যে এসব ঘাঁটি বিলুপ্ত করে।

শুধু তা-ই নয়। বর্তমান সরকার ট্রানজিটের ইস্যুতেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করে। বস্তুত এরূপ চুক্তিতে উপনীত হওয়ার আগেই বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের তালপতাতে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পরিবহনের অনুমতি দেয়, যদিও এর জন্য প্রয়োজনীয় ধরনের সড়ক ও সেতু নির্মিত হয়নি। এ পরিবহন সুগম করার জন্য বাংলাদেশের তিতাস নদীর ওপর অবৈধভাবে ক্রসবাঁধও নির্মিত হয় (চিত্র-১৩ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু দুঃখজনক যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এতখানি ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার পরও ভারত নদ-নদীর প্রশ্নে নমনীয়তা প্রদর্শন করছে না। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে অর্ধেক-অর্ধেক ভাগাভাগির ভিত্তিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল, শেষাবধি তা হতে পারেনি। বলা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্ধেক ভাগে সন্তুষ্ট নন। তিনি ৭৫ কিংবা ৮০ ভাগ পানি চান। তাঁর বিরোধিতার কারণে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারেনি। এদিকে খবরে প্রকাশ, সম্ভবত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে উৎসাহিত হয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমার দাবি জানিয়েছেন, ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গা চুক্তির পুনর্নিরীক্ষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ তিনি মনে করছেন যে এ চুক্তির অধীনে বাংলাদেশকে যতটুকু পানি দেওয়ার কথা, সেটা আরও কমানো প্রয়োজন। অথচ, ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে সর্বনিম্ন প্রবাহসংক্রান্ত কোনো গ্যারান্টি ধারা নেই এবং সে কারণে অধিকাংশ বছরেই এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের যতটুকু পানি পাওয়ার কথা, তা দেওয়া হয়নি।

চিত্র-১২ : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এবং বাংলাদেশ
(বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট ছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য [তথা আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরামে] পৌঁছানোর একমাত্র পথ হচ্ছে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার সংকীর্ণ পরিসর। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহারের সুযোগ এসব রাজ্যে প্রবেশ ও উন্নয়নকে বিপুলভাবে সহায়তা করতে পারে।)

চিত্র-১৩ : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের তালপতা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের তিতাস নদীর ওপর নির্মিত ক্রসবাঁধ

সুতরাং, পরিষ্কার যে নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে নদ-নদী বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ সমঝোতা অর্জন দুরূহ। বরং দিন দিন এ সমস্যা আরও কঠিন হবে, কেননা বাংলাদেশের সীমান্তে পৌঁছানোর অনেক আগেই এসব নদ-নদী থেকে ক্রমাগতভাবে পানি প্রত্যাহৃত হবে। ফলে সীমান্তে ভাগাভাগি করার মতো তেমন পানি আর অবশিষ্ট থাকবে না। গঙ্গা ও তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের সমস্যার মধ্যে এ সত্যটিই প্রতিফলিত হচ্ছে।

নদ-নদী বিষয়ে ভারত কর্তৃক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুধু যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ট্রানজিট পাওয়ার জন্যই প্রয়োজন, তা-ই নয়। এটা আরও প্রয়োজন, কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভারত আরও এক ধরনের নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তা মোকাবিলার জন্যও এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে সমস্যা আলোচিত হবে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তন এবং নদ-নদী ভাগাভাগির সমস্যা

সুবিদিত যে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন বিশ্বের ও মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যদিও এ পরিবর্তন ডেকে আনার পেছনে বাংলাদেশের বস্তুত কোনো ভূমিকাই নেই, কিন্তু এ পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেসব বিভিন্ন ধারায় বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা, তার মধ্যে নিম্নের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, নিমজ্জন। যেহেতু বাংলাদেশ মূলত একটি নিচু ব-দ্বীপ, সেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা আহূত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা (চিত্র-১৪ এবং ১৫)। দ্বিতীয়ত, লবণাক্ততার প্রসার।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের যে অংশ নিমজ্জিত হবে না, সেখানেও লবণাক্ততা বিস্তৃত হবে। তার ফলে কৃষিসহ সমগ্র অর্থনীতির সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। তৃতীয়ত, নদ-নদীপ্রবাহের আন্তঋতু চরমভাবাপন্নতার বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের হিমবাহ গলে যাওয়ার কারণে হিমালয় উৎসের নদ-নদীগুলোর শীতকালীন প্রবাহ আরও হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা (চিত্র-১৬)। অন্যদিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগর থেকে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহে আরও বেশি জলীয় বাষ্প থাকার কারণে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ফলে নদীপ্রবাহ একদিকে শুষ্ক মৌসুমে আরও হ্রাস, অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে আর বৃদ্ধি পাবে। চতুর্থত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলির সংখ্যা, ব্যাপ্তি ও প্রকটতা বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমত, বিভিন্ন রোগ ও মহামারি বৃদ্ধি পাবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে দিতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখনই ১৬ কোটির বেশি। ভবিষ্যতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২১ কোটিতে পৌঁছানোর কথা। এত বহুল জনসংখ্যার দেশের যদি এক-পঞ্চমাংশও নিমজ্জিত হয়, তাহলে প্রায় চার কোটি মানুষের বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়ার আশঙ্কা। এ কোটি কোটি মানুষ আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাতে পারবে না। তারা নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশেই আশ্রয় খুঁজবে। কোটি কোটি বেপরোয়া মানুষের জনস্রোতের মুখে কাঁটাতারের বেড়া ধসে পড়বে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা ভারতকেও আক্রান্ত করবে। সুতরাং স্বীয় উন্মীলিত স্বার্থের কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদানে ভারতের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

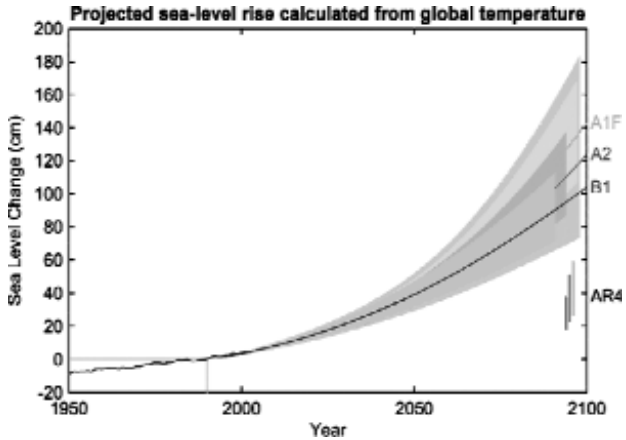

চিত্র-১৪ : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ইতিহাস ও প্রক্ষেপণ
সূত্র : IPCC (2007) এবং Vermeer (2009)

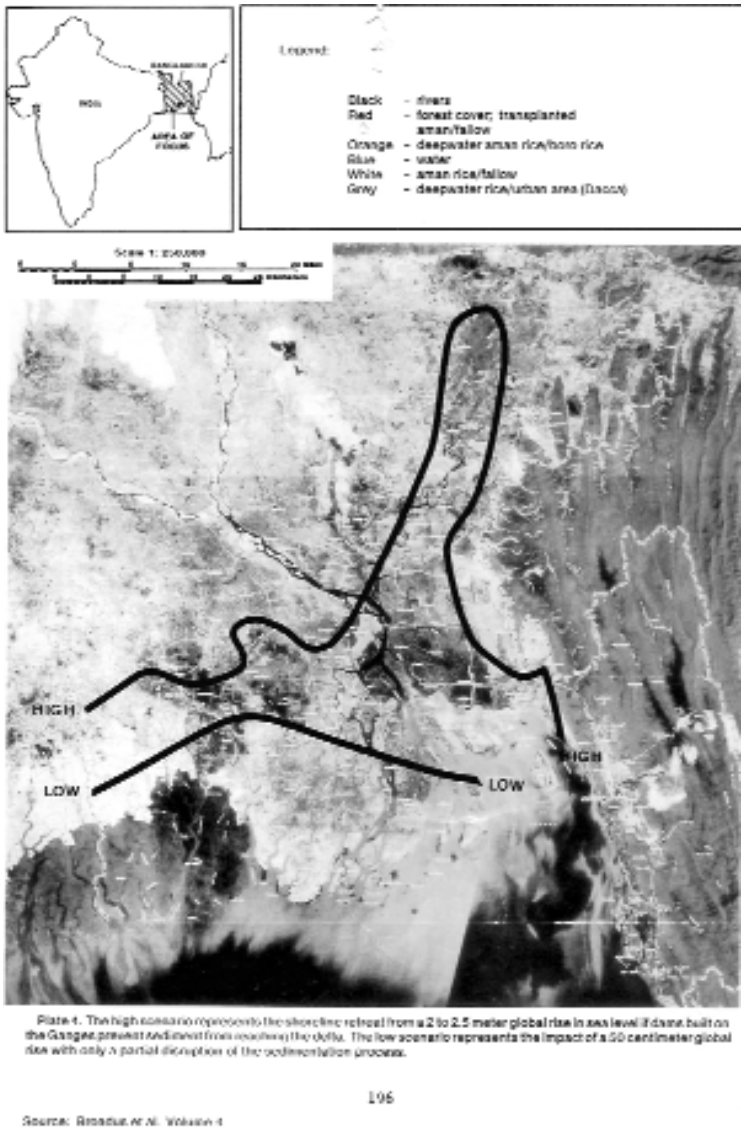

চিত্র-১৫ : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের নিমজ্জনের সমস্যা
(চিত্রে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অধিক মাত্রাসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য প্রমাণিত হয়, সে ক্ষেত্রে সমুদ্র বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার ভাটি অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হবে।)

লক্ষণীয়, ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি বর্তমান বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণই এরূপ সহযোগিতা প্রদানের সর্বোত্তম পন্থা। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে নদীবাহিত পলিমাটিভরণের মাধ্যমেই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মোকাবিলা করেছে। যুগ যুগ ধরে এসব নদ-নদী প্রতিবছর প্রায় দুই কোটি টন পলি এ ব-দ্বীপে বহন করে এনেছে এবং প্লাবনভূমিতে ও বঙ্গোপসাগর উপকূলে জমা করেছে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রতিবছর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় দুই মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষণীয় যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ বার্ষিক দুই মিলিমিটার করেই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং, পলিভরণের প্রক্রিয়া যদি আগের মতো অব্যাহত রাখা যায়, তবে বাংলাদেশ নিমজ্জনের বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে; অন্তত নিমজ্জনের পরিধি সংকুচিত রাখতে পারে।

কিন্তু দুঃখজনক যে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং প্রবাহ বিঘ্নকারী অন্যান্য কাঠামো নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে বাহিত পলিমাটির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে পলিমাটির পরিমাণ দুই কোটি থেকে প্রায় এক কোটিতে হ্রাস পেয়েছে (চিত্র-১৭)। যদি ভারত নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং

চিত্র-১৬ : হিমালয়ের ক্রমহ্রাসমান গাঙ্গোত্রী হিমবাহ
(বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হিমালয় পর্বতমালার অন্যতম বড় গাঙ্গোত্রী হিমবাহ ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। চিত্রে ২০০৪ সাল পর্যন্ত হ্রাসের প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে এ হ্রাসের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।)

এ দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত নদীর প্রবাহ বিঘ্নকারী কাঠামো নির্মাণ অব্যাহত রাখে, তাহলে ভবিষ্যতে এ পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের নিমজ্জনের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, জলবায়ু পরিবর্তনসৃষ্ট বিপদের আলোকেও ভারত কর্তৃক নদ-নদীগুলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

১০. চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারের বিপদ

লক্ষণীয়, ভারত যেমন উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করছে, তেমনি চীনও উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি অপসারণ করতে পারে। বস্তুত বিভিন্ন সময় চীনের এমন পরিকল্পনার কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। চীন দাবি করে, উত্তর চীনে পর্যাপ্ত পানি নেই এবং সে কারণে দক্ষিণের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি উত্তরমুখে অপসারণ করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য যে চীনের এ চিন্তার পেছনেও নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে। কীভাবে পানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যায়, সেদিকে চিন্তা ধাবিত না করে বরং নদীর পানি কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন দিকে ধাবিত করে সে পানি শুষে নেওয়ার মাধ্যমে পানির অধিক চাহিদা মেটানোর চিন্তা করা হচ্ছে (চিত্র-১৮)।

প্রণিধানযোগ্য যে ভারত ব্রহ্মপুত্র নদ সম্পর্কে চীনের এ চিন্তার ঘোর বিরোধী। শুধু তা-ই নয়। ভারত চায় যে বাংলাদেশও চীনের এ পরিকল্পনার বিরোধিতায় ভারতের সঙ্গে যোগ দিক। ভারতের এই অবস্থান ও প্রত্যাশা যে কত স্ববিরোধী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের বোঝা প্রয়োজন যে উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের নদ-নদী

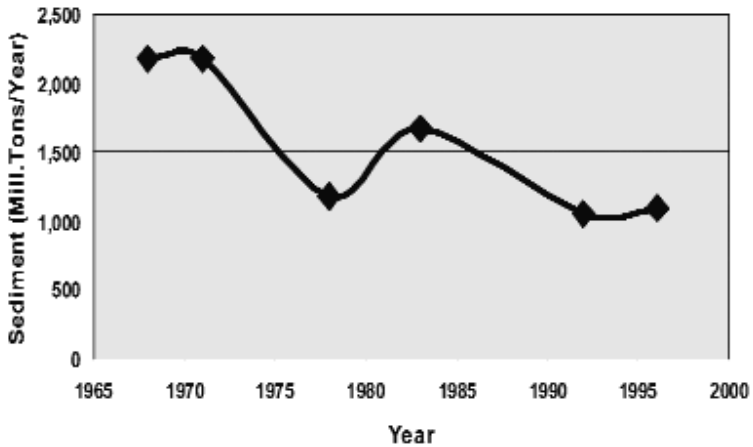

চিত্র ১৭ : ক্রমহ্রাসমান পলিমাটি প্রবাহ
(ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রবাহ বিঘ্ন এবং অপসারণকারী কাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে প্রবাহিত পলির পরিমাণ দুই কোটি টন থেকে ২০০০ সাল নাগাদ এক কোটিতে হ্রাস পেয়েছে।)

থেকে পানি ক্রমাগতভাবে অপসারণ করে নেওয়ার মাধ্যমে সে চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারমূলক পরিকল্পনার বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুত ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প যে যুক্তিতে রচিত, ব্রহ্মপুত্র নদবিষয়ক চীনের প্রস্তাবিত প্রকল্পের পেছনে সেই একই যুক্তি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কত ক্ষতিকর। একই কারণে নদ-নদীগুলো ভারতের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নদ-নদীর পানি

চিত্র ১৮ : চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ উত্তরমুখী অপসারণের সম্ভাব্য পরিকল্পনা

ভাগাভাগির সমস্যা দীর্ঘকালের। অধুনাকালে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা তীব্র হচ্ছে।

সুতরাং, ভারত যদি ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারমূলক চীনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে চায় এবং আশা করে যে বাংলাদেশ তার সঙ্গে এ বিরোধিতায় যোগ দিক, তাহলে প্রথমে ভারতকে তার নদ-নদীর ব্যাপারে যে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটি পরিত্যাগ করতে হবে; বাংলাদেশে প্রবাহিত নদ-নদীর ওপর নির্মিত সব প্রবাহ বিঘ্নকারী কাঠামো অপসারণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাঠামো নির্মাণ না করায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। ভারতকে প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প (অন্তত পক্ষে এ প্রকল্পের হিমালয়প্রসূত নদ-নদীসংক্রান্ত অংশ) বাতিল করতে হবে। তাহলেই কেবল নদ-নদীসমূহ প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত ও বৈরিতার উৎসের পরিবর্তে মৈত্রীর রাখিবন্ধনে পরিণত হতে পারবে।

১১. নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট

কিন্তু ভারত সহসাই নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে, এমন আশা করা দুরূহ। এটা ঠিক যে ভারতেও নাগরিক পর্যায়ে

প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠছে। নর্মদা বাঁধের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলনই তার একটি বড় প্রমাণ। বর্তমানে টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধেও মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও আসামে নাগরিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

কিন্তু নাগরিক পর্যায়ের এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও প্রবল। এ প্রতিরোধের পেছনে রয়েছে স্বার্থ। এ স্বার্থ দুই ধরনের। একটি হলো প্রকৃত অর্থের বস্তুগত স্বার্থ। এ স্বার্থের অন্যতম প্রতিভূ হলো বাঁধ নির্মাণশিল্প। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে বহু কোম্পানি। মুনাফার প্রত্যাশায় এসব কোম্পানি ক্রমাগতভাবে বাঁধ নির্মাণের প্রকল্পকে উৎসাহিত করে। বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পেশার লোকজনও স্বাভাবিক কারণেই বাঁধ নির্মাণকে সমর্থন করে। সরকারের ভেতরেও বাঁধের পক্ষে শক্তিশালী লবি কাজ করে। যত বেশি বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়, ততই নদী ও পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর বাজেট ও অর্থ সমাগম বাড়ে। সুতরাং কায়েমি বস্তুগত স্বার্থ নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পথে বড় বাধা। রাজনীতিবিদেরাও নিজ নিজ এলাকায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রত্যাশায় বাঁধের সমর্থকে পরিণত হন।

দ্বিতীয় ধরনের স্বার্থ হলো ভ্রান্ত স্বার্থবোধ, যার দ্বারা বহু রাজনীতিবিদ, আমলা, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হন, যদিও তাঁরা হয়তো বাঁধ নির্মাণের বাজেট থেকে সরাসরিভাবে উপকৃত হবেন না। তাঁরা ভাবেন, বাঁধ হলে বিদ্যুৎ হবে, সেচ হবে, উন্নয়ন হবে। কিন্তু বাঁধ ছাড়াও যে বিদ্যুৎ হতে পারে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে, উন্নয়ন হতে পারে সে ব্যাপারে তাঁদের সচেতন মনে হয় না। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সচেতনতা বিস্তারের মাধ্যমে এ ভ্রান্তবোধ হ্রাস করা যেতে পারে। কিন্তু তা সময় সাপেক্ষে এবং তার দ্বারা প্রথমোক্ত ধরনের কায়েমি স্বার্থ হ্রাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং, দ্রুত ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থা গ্রহণ এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের জন্য নদ-নদীগুলোর প্রবাহ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক আচরণ থেকে এ সত্যটি আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। তিস্তা নদীবিষয়ক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি সম্পাদনকে সুগম করার পরিবর্তে তিনি এখন আরও অভিযোগ তুলেছেন যে ফারাক্কা বাঁধের কতিপয় কপাট জীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে বেশি পানি বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে চলে যাচ্ছে। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর দাবি তুলেছেন যাতে অবিলম্বে এসব জীর্ণ কপাট মেরামত করা হয় এবং বাংলাদেশে গঙ্গার পানিপ্রবাহ হ্রাস করা হয়। বলা বাহুল্য, যেখানে জীর্ণ ফারাক্কা বাঁধটি সম্পূর্ণ অপসারণের সময় এসেছে, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ উল্টো দাবি উত্থাপন করছেন। আরও আশ্চর্য যে বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীর পানি হ্রাস করাই যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন সরকারের মুখ্য করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় যেন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না!

সুতরাং, অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার যে কায়েমি ও ভ্রান্ত, এই উভয়বিধ স্বার্থের মুখে শুধু অনুরোধ-উপরোধ এবং শুভেচ্ছার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নদ-নদী উন্মুক্ত হবে না। বরং দিন দিন এসবের প্রবাহ আরও বেশি করে অপসারিত হতে থাকবে। এ অবস্থায় নদ-নদীগুলো ফিরে পাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য আর কি উপায় খোলা আছে?

উপায় একটিই এবং তা হলো, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বিনিময়। এ উপলব্ধি থেকেই নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।[৭] যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো থেকে পানি প্রত্যাহার করতে পারছে, সেই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ভারত বাংলাদেশের ওপর ট্রানজিটের জন্য নির্ভরশীল। ওপরের আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে ট্রানজিটের মধ্যে ভারতের গভীর স্বার্থ নিহিত। ট্রানজিট ছাড়া ভারতের ওপর প্রভাব বিস্তারের অন্য কোনো আইনি উপায় বাংলাদেশের জন্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। সুতরাং, নদ-নদীর পূর্ণ প্রবাহ ফিরে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের ট্রানজিট ইস্যুকে ব্যবহারের কোনো বিকল্প ভারত খোলা রাখেনি।

পরিতাপের বিষয় যে নদ-নদীর ইস্যুতে বাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের সরকারই এখন সবচেয়ে বৈরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ট্রানজিট ইস্যুতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বার্থ ও কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্যের স্বার্থ এক নয়। বিশেষত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের সরকার ও জনগণ ট্রানজিট ও বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগের জন্য বিশেষভাবে উদগ্রীব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না এলেও এসব রাজ্যের বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরকালে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলা তাঁদের জন্য বিশেষভাবে স্বার্থানুকূল। সুতরাং বাংলাদেশের অবস্থানের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থানই এ ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ণায়ক নয়। সঠিক প্রচার ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে ভারতের বহু মহলেরই নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার পক্ষে সমর্থন অর্জন সম্ভব। আশা করা যায় যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও এ ফর্মুলার যৌক্তিকতা ও আকর্ষণীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বুঝতে হবে যে বাংলাদেশে নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস করার প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পকালের জন্য সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু তাতে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কোনো প্রগতি সাধিত হবে না; এবং তাঁর নিজের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্যও তা বিশেষ সহায়ক হবে না।

কিন্তু ভারতের সরকার ও জনগণকে নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা বোঝানোর আগে বাংলাদেশের সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদেরই আগে তা বুঝতে হবে।

অনেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং ট্রানজিটের বিনিময়ে প্রাপ্য হিসেবে বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দেন। এর পেছনে যুক্তি আছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশের বিপুল ঘাটতির কথা ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। ভারতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ঘাটতি হ্রাসের প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাণিজ্য প্রসারের জন্য ঋণ বা এজাতীয় সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে ভারতের ওপরই নির্ভর করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ভারত ভিন্ন অন্য দেশের সঙ্গেও বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রয়াসী হতে পারে। এটা ঠিক যে প্রতিবেশী হওয়ার কারণে ভারতে এবং ভারত থেকে পণ্য পরিবহন খরচ তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। কিন্তু পরিবহন ব্যয়ই বাণিজ্যের একমাত্র অথবা মূল নির্ধারক নয়। সে কারণেই দেখা যায় যে ভারতের তুলনায় দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও চীনের

সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে মিয়ানমার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ বাণিজ্য বৃদ্ধি করায় প্রয়াসী হতে পারে।

একই কথা প্রযোজ্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও কারিগরি সহায়তার বিষয়ে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য আরও কম গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে অবকাঠামো নির্মাণে চীন অথবা কোরিয়ার ভূমিকা ইতিমধ্যেই ভারতের ভূমিকার তুলনায় অনেক বেশি। সে জন্য এ বিষয়েও ভারতের ওপর বাংলাদেশের কোনো বিশেষ নির্ভরশীলতা নেই।

কিন্তু নদ-নদীর প্রবাহের জন্য বাংলাদেশ ভারতের ওপরই মূলত নির্ভরশীল। এ বিষয়ে ভারতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের কোনো বিকল্প নেই। সে জন্য ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছে যা দাবি করতে পারে, তার মধ্যে নদীপ্রবাহই সবচেয়ে মূল্যবান ও স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বের। এ বিষয়টি বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে।

পরিতাপের বিষয় যে এ বিষয়ে পরিস্থিতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। ট্রানজিট ইস্যুর স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকেরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন বলে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট আমলা ও উপদেষ্টাদের কেউ কেউ ট্রানজিটের বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের কিছু পাওয়ার আছে, সেটাই যেন ভাবতে উৎসাহী নন। তাঁদের অনেকে ট্রানজিট ইস্যুর সঙ্গে নদীপ্রবাহের ইস্যুর কোনো সংযোগ দেখেন না। অন্যরা যখন এ সংযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। এ ধরনের মনোভঙ্গি নিয়ে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের নদ-নদীর অধিকার আদায় যে দুরূহ, তা বলাই বাহুল্য।

ট্রানজিটের ইস্যুতে সরকারি আমলা ও উপদেষ্টাদের মূল মনোযোগ এখনো যেন মূলত মাশুল, শুল্ক, অবকাঠামো, ইত্যাকার ইস্যুর ওপর নিবদ্ধ। এসব ইস্যু নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করতে ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই এক দেশের ওপর দিয়ে আরেক দেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হচ্ছে। ইউরোপের জন্য এটা খুব সাধারণ ঘটনা। লাতিন আমেরিকার জন্যও তা প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে মেক্সিকো ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় এর উদাহরণ আছে। এসব বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট মাশুল, শুল্ক, অবকাঠামো ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে সমাধানে পৌঁছানো খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। লক্ষ্য করা দরকার, যে হারেই নির্ধারিত হোক না কেন, ট্রানজিট থেকে মাশুল, শুল্ক ও অবকাঠামো ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আদায় করা অর্থের পরিমাণ খুব বেশি হবে না। বিশেষত, প্রতিবছর প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স অর্থের তুলনায় এর পরিমাণ নগণ্যই হবে। সুতরাং, এই অর্থের পরিমাণের মধ্যে ট্রানজিট ইস্যুতে বাংলাদেশের মূল স্বার্থ দেখা ঠিক হবে না। ট্রানজিট ইস্যুতে বাংলাদেশের মূল স্বার্থ নদীপ্রবাহ ফিরে পাওয়ার মধ্যে নিহিত।

কিন্তু আমলা ও উপদেষ্টারা না বুঝতে পারলেও দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বোধকরি অনেকটা স্বজ্ঞাগতভাবেই ট্রানজিট ও নদীর মধ্যকার সম্পর্কটি কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সে কারণেই দেখা যায় যে মনমোহন সিংয়ের ঢাকা

সফরকালে যখন শেষ মুহূর্তে স্পষ্ট হয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতার কারণে তিস্তা নদীবিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে না, তখন বাংলাদেশ সরকার ট্রানজিটবিষয়ক চুক্তি সম্পাদনে বিরত থাকে।

এটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু এ বিষয়ে অবস্থান আরও স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনগণের কাছে ও ভারতের সরকার ও জনগণের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন। নদীর পূর্ণপ্রবাহের দাবিটি বাংলাদেশকে সাহসের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। যদি জোরের সঙ্গে দাবি তোলাই না হয়, তাহলে সে দাবির পূরণ আশা করা বৃথা। ভারতকে পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন যে নদীপ্রবাহ উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ট্রানজিট ইস্যুতে অগ্রগতি সম্ভব নয়। শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ট্রানজিট ইস্যুতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, সেগুলো স্থগিত এবং প্রত্যাহার করে নেওয়া প্রয়োজন। কেবল এ ধরনের পদক্ষেপই ভারত সরকারকে নদীবিষয়ক বাংলাদেশের দাবিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় প্রবুদ্ধ করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মান ভাঙানো বাংলাদেশের দায়িত্ব নয়। ট্রানজিটের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ স্বার্থ নেই। কিন্তু ট্রানজিট ও বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহারের মধ্যে সামগ্রিকভাবে ভারত, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশেষত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের স্বার্থ প্রকট। এ স্বার্থের জন্যই শেষ পর্যন্ত ভারত নদ-নদীগুলোকে উন্মুক্ত করায় সম্মত হতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে পরস্পরের স্বার্থ রক্ষায় নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার কোনো বিকল্প নেই।

১২. নদ-নদীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন এবং নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলা

লক্ষণীয় যে নদ-নদীবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা ও অভিমত নদীপ্রবাহসংক্রান্ত নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলাকে সমর্থন করে।

১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির ৫২তম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদীবিষয়ক আইন প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে 'আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহার-সম্পর্কিত হেলসেঙ্কি নিয়মাবলি' (Helsinki Rules on the Uses of Waters of International Rivers) (International Law Association 1967) গৃহীত হয়। পরে ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আরও বিস্তারিত 'আন্তর্জাতিক নদীর পরিবহন ভিন্ন অন্যান্য ব্যবহারসংক্রান্ত কনভেনশন' (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) (United Nations 2005) গৃহীত হয়। যদিও পর্যাপ্তসংখ্যক দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হওয়ার কারণে এ কনভেনশন এখনো আরোপযোগ্য আইনি মর্যাদা লাভ করেনি, তা সত্ত্বেও তা সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রতিফলিত করে। (১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১০৬ দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ এ কনভেনশনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।) এ কনভেনশনের 'নদীর অংশীদার দেশসমূহের প্রণিধানযোগ্য ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতা' শীর্ষক সপ্তম অনুচ্ছেদে বলা হয় :

১. অভিন্ন নদীর তীরবর্তী দেশসমূহ নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে নদীর ব্যবহার সাধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদার দেশের প্রণিধানযোগ্য ক্ষতিসাধনমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

২. যদি এরূপ কোনো তৎপরতা দ্বারা অংশীদার কোনো দেশের প্রণিধানযোগ্য ক্ষতিসাধিত হয়, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধনকারী দেশ (যদি এ ধরনের ক্ষতিসাধনমূলক ব্যবহারসংক্রান্ত কোনো চুক্তি না থাকে) এ কনভেনশনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ওই ক্ষতি নিবারণ ও প্রশমনের জন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের বিষয় আলোচনা করবে।

এ কনভেনশনের ২০তম অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয় :

আন্তর্জাতিক নদীর অংশীদার দেশগুলো এককভাবে এবং যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে, যৌথভাবে নদীর ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশের সুরক্ষা করবে।

এ কনভেনশনের ২৩তম অনুচ্ছেদে বলা হয় :

আন্তর্জাতিক নদীর অংশীদার দেশগুলো এককভাবে এবং যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ম ও মান অনুসরণ করে নদীর মোহনা অঞ্চল ও সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা করবে।

বলাবাহুল্য, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদ-নদীগুলোর প্রবাহ বিঘ্ন ও অপসারণকারী প্রতিটি পদক্ষেপ ও কাঠামো ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের কনভেনশনবিরোধী। এসব ব্যারাজ ও বাঁধ বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও অর্থনীতির যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব কাঠামো শুধু নদ-নদীর ইকোলজি ধ্বংস করেনি, আক্ষরিক অর্থে তাদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। এসব কাঠামো নদ-নদীর মোহনা অঞ্চলের এবং সামুদ্রিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করেছে। এ ক্ষতির মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলের সুন্দরবনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ফারাক্কা ব্যারাজ দ্বারা বাংলাদেশের পদ্মা নদী থেকে পানি অপসারণের ফলে ইউনেসকো চিহ্নিত বিশ্বের প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে অন্যতম এ সুন্দরবন হুমকির সম্মুখীন।

আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ভারত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের এ কনভেনশন স্বাক্ষর করেনি। এ কনভেনশন অনুযায়ী, নদীর ব্যবহার সম্পর্কে অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান আছে। কিন্তু পর্যাপ্তসংখ্যক দেশের এবং ভারতের নিজ কর্তৃক স্বাক্ষরের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য এ পথ খোলা নেই। এটাও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ভারত চায় না তার প্রতিবেশী অন্যান্য দেশও জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের কনভেনশন স্বাক্ষর করুক। প্রথমত, বেশি দেশ স্বাক্ষর করলে এ কনভেনশন আইনি মর্যাদা পাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের নিজের ওপর এ কনভেনশন স্বাক্ষরের চাপ বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়ত, স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশগুলো ভারতের সঙ্গে নদীবিষয়ক বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হওয়ায় উদ্বুদ্ধ হবে।

লক্ষণীয়, সম্ভবত ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নদ-নদীবিষয়ক ইস্যু নিরসনের আশায় এবং ভারতের ইচ্ছা উপেক্ষা করে বিরাগভাজন না হওয়ার চিন্তা থেকে বাংলাদেশও এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারসংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের কনভেনশন স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থেকেছে। বলাবাহুল্য যে অবিলম্বে এ নীতি ও অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজন। বাংলাদেশের নিজে এ কনভেনশন স্বাক্ষর করা এবং ভারত এবং উপমহাদেশের অন্যান্য দেশকেও এ কনভেনশন স্বাক্ষর করার অনুরোধ জানানো প্রয়োজন।

লক্ষণীয়, আন্তর্জাতিক নদীবিষয়ক জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের কনভেনশন নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকেই উৎসাহিত করে। আগের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে এ দৃষ্টিভঙ্গিই এক দেশকে নদীর অংশীদার অন্য দেশের ক্ষতিসাধন থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে; নদীর ইকোলজি রক্ষা করতে পারে; নদীর মোহনা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষা করতে পারে।

নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলা ভারতকে নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রবুদ্ধ করার একটি প্রচেষ্টা। যেহেতু ভারত নিজ থেকে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে এখনো প্রস্তুত নয়, সেহেতু একটি বড় স্বার্থবোধের তাগিদ দ্বারা এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে তাকে সম্মত করাই নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার অভীষ্ট লক্ষ্য। যত শিগগির ভারত এ স্বার্থবোধে সাড়া দিয়ে নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলা গ্রহণে এগিয়ে আসে, ততই ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের জন্যই মঙ্গল।

১৩. উপসংহার

বাংলাদেশ ও ভারত—এ দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সুসম্পর্কই কাম্য। কিন্তু বর্তমানে নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির ইস্যু এ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলা এ বাধা অপসারণ করে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে পারে। এ ফর্মুলা অনুযায়ী, ভারত বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদ-নদীর ওপর নির্মিত সব পানি অপসারণকারী বাঁধ ও কাঠামো অপসারণ করবে যাতে তাদের স্বাভাবিক পূর্ণ প্রবাহ বাংলাদেশে পৌঁছাতে পারে। ভারত প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প (অন্তত তার হিমালয়প্রসূত নদ-নদী সম্পর্কিত অংশ) বাতিল করবে। বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ট্রানজিট সুযোগ প্রদান করবে। ট্রানজিটের বিষয়ে শুল্ক, মাশুল, অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি অন্যান্য আরও অনেক ইস্যু নিশ্চয়ই আছে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেসব ইস্যুর মীমাংসা হতে হবে। কিন্তু মূল ইস্যুটি রাজনৈতিক এবং স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বের। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া হবে কি হবে না, সেটি বাংলাদেশের জন্য একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নিছক শুল্ক ও মাশুলের নয়। তেমনি ট্রানজিট ভারতের জন্য একটি স্ট্র্যাটেজিক প্রয়োজন; কেননা তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং এসব রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে প্রশমিত করতে সহায়ক হবে। কাজেই ট্রানজিটের সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ইস্যু জড়িত।

বিগত দশকগুলোতে ভারত তার উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মনে ভারতের এই আচরণ গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। ভারত বললেই বাংলাদেশের মানুষের এখন ফারাক্কা, গজালডোবা প্রভৃতি বাঁধের কথা মনে আসে। এসব বাঁধ বহাল রেখে বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে কারণেই ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া বাংলাদেশে ভারতের প্রতি বন্ধুমনোভাবাপন্ন সরকারের পক্ষেও কঠিন হচ্ছে। এসব বাঁধ অপসারণ করলে নদীর প্রবাহ যেমন বাধামুক্ত হবে, তেমনি বাংলাদেশের মানুষের মন গলে ভারতের প্রতি প্রীতি অনুভবের জোয়ার সঞ্চারিত হবে; এবং ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বাধা অপসারিত হবে।

বিভিন্ন নদীর ওপর নির্মিত বাঁধ অপসারণ করা ভারতের জন্যও কোনো সহজ কাজ নয়। এসব বাঁধকে কেন্দ্র করে প্রবল কায়েমি স্বার্থের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভারতের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ট্রানজিট ভারতকে এ ইস্যু মোকাবিলায় প্রভূত সহায়তা করবে।

সুতরাং, নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ফর্মুলার পেছনে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। আশা করা যায়, দুই দেশের জনগণ এবং নেতারা এ বাস্তবতা স্বীকার করে সাহসী সিদ্ধান্ত নেবেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Lifshultz (1979)
২. এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Rahman (2002)
৩. ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম এ প্রকল্পের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।
৪. এ রায় সম্পর্কে তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : *The Daily Star*, February 27, 2012
৫. নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি' এবং এর বিপরীত 'প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি' সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (1990, 1999, 2001, 2006a, 2006b)। এ প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Hughes et al. (1994) এবং Khalequzzaman (1994)
৬. বাংলাদেশের ওপর ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Islam (1997) এবং Khatun (2004)
৭. এ প্রস্তাবের জন্য দ্রষ্টব্য : ইসলাম (২০১১ক, ২০১১খ), Islam (2011)

নির্দেশিত রচনাবলি

Bhattacharya, Dipen, M. Feroze. Ahmed, Nazrul Islam, and Mohd. A. Matin (editors) (2009), *Climate Change and the Tasks for Bangladesh*, Dhaka : BAPA and BEN

DeLong, Bradford (1998), "Estimating World GDP, One Million B.C. - Present", Berkeley, California : University of California, Berkeley. Available from http://www.j-bradford-delong.net/TCEH/1998_Draft/World_GDP/ Estimating_World_GDP.html.

Hughes, R., Adnan, S. and Dala-Clayton, B. (1994), "Floodplains or Floodplans? A Review of Approaches to Water Management in Bangladesh", Institute of Environment and Development, London, and Research and Advisory Services, Dhaka, Bangladesh

International Law Association (1967), *The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers*, London.

Islam, Nazrul (1990), "Let the Delta Be a Delta! An Essay in Dissent on the Flood Problem of Bangladesh," *The Journal of Social Studies*, No. 48, April, pp. 18-41

Islam, Nazrul (1997), "Notes on Farakka : The Problem of Water Sharing between India and Bangladesh," *The Journal of Social Studies*, No. 76, April, pp. 1-9. Also in French as "Le barrage du Farakka ou le partage de l'eau entre l'Inde et le Bangladesh," in *Alternatives Sud*, Vol. VIII (2001), No. 4, pp. 257-64

Islam, Nazrul (1999), "Flood Control in Bangladesh : Which Way Now?" *Journal of Social Studies*, No. 83, January, pp. 1-31

Islam, Nazrul (2001), "Open Approach to Flood Control : The Way to the Future," *Futures : the journal of forecasting, planning, and policy*, Vol. 33, No. 8 (October), pp. 783-802

Islam, Nazrul (2006a), "The Commercial Approach vs. the Ecological Approach to Rivers : An Essay in Response to the Indian River Linking Project (IRLP)," *Futures : the journal of forecasting, planning, and policy*, Vol. 38, No. 5 (June), pp. 586-605

Islam, Nazrul (2006b), "IRLP, or the Ecological Approach to Rivers?" *Economic and Political Weekly*, Vol. 41, No. 17 (April-May), pp. 17-26

Islam, Nazrul (2009), "Climate Change and the Tasks for Bangladesh," in Bhattacharya et al. (ed.), *Climate Change and the Tasks for Bangladesh*, pp. 13-35, Dhaka : BAPA and BEN.

ইসলাম, নজরুল (২০১১ক), 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট', *প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ২০১১

ইসলাম, নজরুল (২০১১খ), 'মমতাহীনা মমতা?' *প্রথম আলো*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১

Islam, Nazrul (2011), "Transit in Exchange for Rivers?" *The Daily Star*, August 8, 2011.

Khalequzzaman, Mohamed (1994), "Recent Floods in Bangladesh : Possible Causes and Solutions," *Natural Hazards*, Vol. 9, pp. 65-80

Khatun, Tajkera (2004), "The Ganges Water Withdrawal in the Upstream at Farakka and Its Impact in the Downstream Bangladesh," in M. Feroze Ahmed, Qazi K. Ahmad, and M. Khalequzzaman (eds.), *Regional Cooperation on Transboundary Rivers : Impact of the Indian River Linking Project*, Dhaka : BAPA, BEN, BEA, IEB, BUET, DU, and BWP, BGS, BUP, BNGA, and ASB

Lifshultz, Lawrence (1979), *Bangladesh : Unfinished Revolution*, London : Zed Press

Maddison, Angus (2007), *Contours of the World Economy, 1-2030 AD : Essays in Macro-Economic History*, New York : Oxford University Press

Nakicenovic, Neboja (2009), "Supportive Measures and Policies for Developing Countries : A Paradigm Shift", Background Paper prepared for *World Economic and Social Survey 2009* : New York, United Nations

Rahman, Mustafizur (2002), "Bangladesh-India Bilateral Trade : An Investigation into Trade in Services," in T. N, Srinivason (editor), *Trade, Finance, and Investment in South Asia*, New Delhi : Social Science Press, pp. 183-238

United Nations (2005), *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses*, New York

United Nations (2011), *The Great Green Technological Transformation*, World Economic and Social Survey, 2011, New York : UN DESA (http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf)

World Commission on Dams (2000), *Dams and Development : A New Framework : The Report of the World Commission on Dams*, London and Sterling, VA : Earthscan (http://www.internationalrivers.org/files/world_commission_on_dams_final_report.pdf)

অনুস্মৃতি

আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

দেশভাগের আগে

[আবু সাঈদ চৌধুরীর জন্ম ১৯২১ সালের ৩১ জানুয়ারি। তাঁর শৈশব কেটেছে টাঙ্গাইলে। জীবনের নানা পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী সরকারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ১৯৮৭ সালের ২ আগস্ট লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় (৮, ৯ ও ১০ জুন ১৯৮৭—এই তিন দিন) তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ পরিমার্জিত আকারে এখানে ছাপা হচ্ছে।]

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন :
অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও **ড. এনামুল হক**

১. পরিবার ও বাল্যকাল

প্রশ্ন : জনাব চৌধুরী, আমরা শুরু করব আপনার জন্ম, বাল্যকাল ইত্যাদি দিয়ে। তার পরে আমরা তার থেকে প্রশ্ন করে অগ্রসর হব।

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমার জন্ম হয়েছিল একেবারে পদ্মা নদীর পাশঘেঁষা এলাচিপুর গ্রামে। তাই এই পৃথিবীতে আসামাত্রই সম্ভবত আমার কানে আছড়ে পড়েছিল পদ্মা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি। সেটা ছিল ১৯২১ সালের ৩১ জানুয়ারি। এলাচিপুর তখন বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল, আরিচা থেকে মাইল তিনেক দূরে। এখানে বসবাস করত বেশ কিছু মুসলিম পরিবার। বর্তমানে গ্রামটা পুরোপুরি পদ্মা নদীর গর্ভে চলে গেছে। পরিবারগুলো

পরে সরে এসে পাশের যে গ্রামে বসতি স্থাপন করে, তারও নাম এলাচিপুর। আমার মামা বা নানার বাড়ি, যা-ই বলুন, সেখানেই আমার জন্ম। ২১ দিন পর বাবা মাকে আর আমাকে নিয়ে আসেন আমাদের বাড়িতে, নাগবাড়ীর আমাদের পৈতৃক ভিটায়। এখানেই আমার শৈশব কাটে। এলাচিপুর গ্রামে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাসস্থান। মনে করা হয়, হজরত শাহ ছিলেন এসব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে নিয়ে একটা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর পদ্মা প্রথম ভাঙতে ভাঙতে যেদিন একেবারে এলাচিপুর গ্রামের কাছে চলে এল, তখন কেউ কেউ বলল যে মাজার শরিফের কাছে এসে পদ্মা ঠিক ঘুরে যাবে। কিন্তু সবাই সেটা ঠিক বিশ্বাস করল না। তারা তাঁর কবর খুঁড়তে শুরু করল। কবর খুঁড়ে কিছু পাওয়া গেল না। তাঁর দেহাবশেষ অন্যত্র সরিয়ে নিতেই কবর খুঁড়েছিল। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। অবশ্য সেদিন রাতেই (আমি অনেকের মুখেই শুনেছি) আলোর এক রশ্মি পদ্মার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখতে পায় লোকজন; এবং পুরো এলাচিপুর গ্রাম নদীগর্ভে চলে যায়।

আধুনিককালে বা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অনেক জায়গা থেকে অনেক মুসলমান পরিবার আধুনিকতার অনুসারী হয়েছে বা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে। এলাচিপুর হলো আশরাফউজ্জামান খান, আমানুজ্জামান খান, আনিসুজ্জামান খান, আদালত খানদের পৈতৃক ভিটা। তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের একজন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে লেখাপড়া করেছেন।

এলাচিপুরের সঙ্গে এ কে ফজলুল হক সাহেবেরও সম্বন্ধ ছিল। নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদাও বিয়ে করেছিলেন এই এলাচিপুরে। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে হজরত শফিউদ্দিন নামের আরেকজন আধ্যাত্মিক সাধনার দিক দিয়ে এখানে খুব খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি আমার নানার বাবা।

শিল্পী রশিদ চৌধুরীর বাবাও আমাদের আত্মীয় ছিলেন। আমার নানি ইন্তেকাল করার পর আমার নানা তাঁর আপন ফুফুকে বিয়ে করেন। আর রশিদ চৌধুরীর চাচা হারোয়ার খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী সেই ব্রিটিশ আমলেই কেন্দ্রীয় আইনসভায় একনাগাড়ে পঁচিশ বছর মেম্বার ছিলেন। ফরিদপুরে তাঁর নামে অনেক কিছুই আছে।

ফরিদপুর জেলা বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর থেকে তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। জেলায় তিনিই প্রথম বিএ পাস করেন। তাঁর কাছে শুনেছি যে বিএ পাস করার পর লোকজন তাঁকে অনেক দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে দেখতে এসেছিল। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন : আপনার বাবার দিকের কিছু বলুন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমার বাবার তরফের কথা যদি ধরি তাহলে বলতে হবে, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় 'ব্রাহ্মণ শাসন' বলে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শেখ নান্নু বলে একজন ইরাক থেকে আসেন এবং সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন। তো, ব্রাহ্মণদের উৎপাতে ওই এলাকার গরিব মুসলমানদের বেশ একটু অসুবিধা হচ্ছিল। উনি তাদের শাসন করে সেখানে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেন। তাতে করে ওই গ্রামের নাম হয়ে যায় 'ব্রাহ্মণ শাসন'। ঘাটাইলের রাস্তার পাশে এখনো সেই গ্রামটা আছে। শেখ নান্নুর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরিরা ক্রমে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদেরই একজন এসেছিলেন নাগবাড়ী গ্রামে। তাঁরাই বলতে গেলে আমাদের প্রথম পিতৃপুরুষ।

আমার পিতার নাম আব্দুল হামিদ চৌধুরী। তিনি ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। তবে পড়াশোনা শেষ না করেই চলে আসেন। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ শুরু হয়। তিনি তার প্রথম লোকাল বোর্ডের মেম্বার হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : সময়টা বলতে পারেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : এসবই প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরই বা তার একটু আগের ঘটনা। একনাগাড়ে তিনি ৪০ বছর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ছিলেন এবং এই মেম্বার থাকার সময়েই তিনি ভাইস চেয়ারম্যান হন। এর অর্থ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ৪০ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও বহু বছর ধরে তাঁর সক্রিয় সম্পর্ক ছিল। যেমন : ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট তিনি। ওই একই বোর্ডের প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, পরবর্তী সময়ে যিনি ডিপিআই হন। তারপর আমার মনে হয়, পরে শামসুল হক—সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী—তিনিও ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। কারণ, আইনে এটা ছিল যে যিনি ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল হবেন, পদাধিকারবলে তিনিই তার সেক্রেটারি হবেন। তারপর ১৯৩৭ সালে আমার বাবা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন।

প্রশ্ন : কোন দল থেকে—কৃষক প্রজা, না মুসলিম লীগ?

আবু সাঈদ চৌধুরী : মুসলিম লীগ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল যে তিনি তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কোনো দিন দলত্যাগ করেননি।

প্রশ্ন : তিনি কি প্রথম থেকেই রাজনৈতিক দলে ছিলেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : না, তখনকার দিনে রাজনীতিটা এ রকম ছিল যে যিনি লোকাল বোর্ডের মেম্বার, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরও মেম্বার। তারপর ১৯৩৬ সালে যখন ঠিক হলো যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে নির্বাচন হবে, তখন ফজলুল হক সাহেব ময়মনসিংহে গিয়েও কৃষক প্রজা পার্টির সংগঠন শুরু করলেন। কিন্তু তিনি ময়মনসিংহে গিয়েছিলেন সপ্তাহ খানেক কি ১৫ দিন দেরি করে। তাঁর আগে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত হওয়ার পর তিনি চার সদস্যের একটি কাউন্সিল অব অ্যাকশন গঠন করলেন। মুসলিম লীগ অর্গানাইজ করার জন্য ময়মনসিংহ জেলায় আমার বাবাকে তিনি তার একজন সদস্য হওয়ার অনুরোধ করেন। আর বাবা তাঁকে বলে দিলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আছি আপনার সঙ্গে।' তার দিন পনেরো পর ফজলুল হক সাহেব, আমার বেশ মনে আছে, সন্ধের সময় আগে থেকে না জানিয়ে আমাদের বাড়িতে হঠাৎ করেই উপস্থিত হলেন। আইনসভার সদস্য তৈয়বুদ্দিন আহম্মদও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। আমরা বাইরের ঘরে বসে সবকিছু দেখছিলাম।

প্রশ্ন : এটা কি ময়মনসিংহ শহরে?

আবু সাঈদ চৌধুরী : হ্যাঁ, ঘটনাটি ঘটেছিল ময়মনসিংহ শহরে। ওই যে যেটাকে ইউরোপিয়ান কোয়ার্টার বলা হতো, আমাদের বাড়িটা ছিল তার ওই কোনায় ঠিক নদীর

ধারে। সেখানে তো ফজলুল হক সাহেব গাড়ি থেকে নামলেন। আমার বাবাও বাইরেই বসেছিলেন। উনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন। ফজলুল হক সাহেব এলেন, চা খেলেন, ঘণ্টা খানেক গল্প করলেন; কিন্তু রাজনীতি প্রসঙ্গে কোনো কথা বললেন না। যখন উনি চলে যাচ্ছেন, তখন আমার বাবা কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ থেকে হঠাৎ করেই বলে ফেললেন, 'আপনি তো এসেছেন! হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এসেছিলেন। তিনি এখানে একটা মুসলিম লীগ সংগঠনের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাকে ওই কাউন্সিল অব অ্যাকশনের মেম্বার করেছেন।' তখন ফজলুল হক সাহেব বাবার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'আমি সব জানি। সব জায়গাতেই ভালো লোকের দরকার আছে। আপনি যেখানে আছেন, ওখানেই থাকুন না। ওখানে থেকে কাজ করতে থাকুন।' তারপর একসময় ফজলুল হক সাহেব সত্যিই মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে ফেললেন। আমার এখনো মনে আছে, তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এসেছিলেন তৈয়বুদ্দিন আহম্মদের সঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সময় তৈয়বুদ্দিন ছিলেন আইনসভার সদস্য। তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ফজলুল হক সাহেবের কথা শুনে তিনি হাসছিলেন। আমার বাবা কী রকম একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে। তিনিও বলেছিলেন, 'আমি সবই জানি। আমার সব জায়গাতেই লোকের দরকার হবে। ভালো লোক আইনসভায় এলেই হলো। কে কোথা থেকে আসছে, সেটা অত বেশি দেখবেন না। ভালো লোক সব জায়গা থেকে এলেই আমার কাজে লেগে যাবে।' এভাবে ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে বোধ হয় ইলেকশনটা হলো।

প্রশ্ন : তখন ময়মনসিংহ মুসলিম লীগের এই কাউন্সিল অব অ্যাকশনের সদস্য আর কে কে ছিলেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : তখন ময়মনসিংহ মুসলিম লীগের এই কাউন্সিল অব অ্যাকশনের সদস্য ছিলেন আরও তিনজন। তাঁরা হলেন এখনকার নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল সুলতান আহম্মদের বাবা খান বাহাদুর শরফুদ্দিন আহম্মদ এবং মি. নূরুল আমীন ও গিয়াসউদ্দিন পাঠান।

প্রশ্ন : তখন তাঁদের বয়স?

আবু সাঈদ চৌধুরী : শেষের দুজন বয়সে তখন খুবই নবীন ছিলেন। আমার বাবার বয়সের তুলনায় নবীন তো বটেই।

প্রশ্ন : আবুল মনসুর আহমদ সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণা করবেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আবুল মনসুর আহমদ সাহেব, উনি প্রজা সমিতির সংগঠক ছিলেন এবং আমার বাবার সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর মুখ থেকে গল্প শুনতে আমার অসম্ভব ভালো লাগত। আমি তাঁর বাড়িতে যেতাম। তিনিও চিরাচরিত কায়দায় হাসির গল্প বলতেন। আমার খুশির সীমা থাকত না। আমি মাঝেমধ্যেই তাঁর কাছে যেতাম।

মনসুর আহমদের সঙ্গে আমার বাবার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল এবং তখনকার দিনের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে হলে এটা বুঝতে হবে যে আবুল মনসুর আহমদ আমার বাবার গাড়িতে উঠে তাঁর জন্য ক্যানভাসে বেরোতেন। আইনসভার নয়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশন বা স্কুল বোর্ডের ইলেকশনে ব্যক্তিগতভাবে আবুল মনসুর আহমদও আমার

বাবার জন্য ক্যানভাস করেছেন। তখনকার দিনে এ রকম ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ রাজনীতিতে ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি টাঙ্গাইলে পড়েছিলেন, ময়মনসিংহে পড়েছিলেন—আপনার স্মৃতি থেকে তখনকার সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমি টাঙ্গাইলে থাকতে শুরু করেছিলাম সেই আটাশ-উনত্রিশ [১৯২৮-২৯] সাল থেকে। আমাদের মনে করার জন্য খুব গৌরবের সময় সেটা। সাম্প্রদায়িকতা একরকম ছিলই না বলতে গেলে।

তখন আমাদের ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল খুবই কম। কলকাতার সঙ্গেই ছিল বেশি। একটু অসুখে পড়লে প্রায়ই চিকিৎসার জন্য বাবা আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতেন। তারপর মাঝেমধ্যে এমনিতেও যেতাম। আমার মামা কলকাতায় থাকতেন। আমাদের নিয়ে যেতেন বেড়াতে। কলকাতায় যাতায়াতের তেমন সরাসরি সুবিধা না থাকলেও ময়মনসিংহ থেকে যাওয়ার তো সুবিধা ছিলই। ট্রেনে চেপে সোজা জগন্নাথগঞ্জ ঘাট। সেখান থেকে সিরাজগঞ্জে গিয়ে ট্রেনে উঠলেই শিয়ালদহ।

যা-ই হোক, ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে যখন আমি পড়তে এলাম, তখনকার কথা বলি। ক্লাস এইট, নাইন, টেন—এই তিন ক্লাস আমি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার সঙ্গে পড়েছি। জ্যোতির্ময় ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। সব সময় পড়াশোনা করত। অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র। অন্যের কাছে নিজের পরিচয় তাকে দিতে হতো না। ওই বয়সেই তার ছিল প্রখর ব্যক্তিত্ব, যেটা আপনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময়ও তার মধ্যে দেখেছেন। আমি তার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম, কিছুই বানিয়ে লিখিনি। ওটা ছিল একেবারেই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। ওই বয়সেই সবার চোখে পড়ত সে; পড়াশোনা করার লোক ছিল, অধ্যবসায় ছিল।

বিন্দুবাসিনী স্কুলে ড. এম এন হুদাও আমার ঠিক সহপাঠী নন, তিনি বোধ হয় আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন। তবে অবশ্যই সমসাময়িক। তার পরে মীর্জা সিরাজুল হক ভালোভাবে পাসটাস করেছিলেন। হয়েছিলেন পুলিশের ডিআইজি। বদরউদ্দিন আহম্মদ—ও আমার এক ক্লাস নিচে পড়ত আর কী। জুনিয়র ছিল। জ্যোতির্ময় আমার সহপাঠী ছিল ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে।

রাজনৈতিক সভা-সমিতি ছাড়াও টাঙ্গাইলে তখন প্রায়ই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। এই ছোট্ট মফস্বল শহর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসবের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। মাঝেমধ্যেই অপেশাদার শিল্পীদের দিয়ে নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এদের মানও বেশ উন্নত ছিল। তা ছাড়া খেলাধুলার পাশাপাশি নানা ধরনের প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হতো। আমার বাবা এসব কিছুকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে আমিও এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। যোগ দিয়েছি স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও। আবৃত্তি করেছি কবিতা। আরও একটি ঘটনার কথা মনে আছে। *কামাল পাশা* নাটকের অভিনয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশে আমি কামাল পাশার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম একবার এবং বেশ গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম, 'দুনিয়ার বুকে নয়, কোটি তুর্কি বেঁচে থাকতে তাদের প্রিয় মহামান্য খলিফাকে কোন উদ্ধত রাজশক্তি এই অপমানজনক সন্ধিতে স্বাক্ষর

করতে বাধ্য করেছে! তুর্কি জাতি আজ সে কথা জানতে চায়?' লেখক বললেন যে অভিনয়টা ভালো হয়েছে, কিন্তু খলিফার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। ওই বয়সেই বুঝেছিলাম, কামাল পাশার অভিব্যক্তি বোধ করি ভালোই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলাম।

অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে বা বিরতিতে কিছু না-কিছু নৃত্যানুষ্ঠান থাকত। অনুষ্ঠানের আয়োজন এভাবেই করা হতো। টাঙ্গাইলে যেসব সরকারি কর্মচারী গেছেন, তাঁরাও পরে আমাকে বলেছেন যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে টাঙ্গাইলের মান সত্যিই অত্যন্ত ভালো। আর রাজনীতির দিক থেকে তো টাঙ্গাইল তখন, আমি মনে করি, জনগণের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কেননা, প্রায়ই খুব বড় বড় সভা-সমিতি হতো এবং কংগ্রেসেরও বড় বড় সভা হয়েছে। ধরুন, আমি বসে আছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম দূর থেকে ভেসে আসা শব্দ 'আল্লাহু আকবার', 'বন্দে মাতরম', 'হিন্দু মুসলমান কি জয়' প্রভৃতি স্লোগান এবং সে সঙ্গে হাজার হাজার লোকের প্রসেশন। আর আমি সব সময় এসব প্রসেশনে যেতাম এবং সভা চলার সময় চুপ করে লোকজনের মধ্যে বসে থাকতাম। তখন আমার বয়স আর কত! আমার এসব বক্তৃতা শুনতে খুব ভালো লাগত।

প্রশ্ন : এসব তো সেই খেলাফত আন্দোলনের সময়কার কথা?

আবু সাঈদ চৌধুরী : হ্যাঁ, এসবই খেলাফত আন্দোলনের সময়কার কথা কি তার পরবর্তী সময়ের, অর্থাৎ ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০-এর মতো সময়ের কথা। টাঙ্গাইলে তখন এসব ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ডাকসাইটে লোক। এবং বাংলাদেশের কোথাও সাম্প্রদায়িকতা থাকলেও তাঁদেরকে তা স্পর্শ করেনি। তাঁরা তো অন্য জগতের মানুষ ছিলেন। তিনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। ফলে আমার বাবাকে উনি ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। তিনি আমার কাছে পরে গল্প করেছেন। আমি নাকি একবার তাঁকে বলেছিলাম যে আমি তাঁর কোলে উঠব। তিনি আমাকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তখন এ ধরনের সম্পর্ক ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে।

প্রশ্ন : এবার আসা যাক টাঙ্গাইলে বিশের দশকের শেষের দিকে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের কথায়?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমি বলছি, এই আন্দোলনে প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, আর নবীনদের মধ্যে ছিলেন পরেশচন্দ্র সান্যাল। তাঁর চেহারাও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। মানে, অত্যন্ত সুদর্শন। অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং আমি যে সময়ের কথা বলছি, তার ছয়-সাত বছর আগে থেকেই, অর্থাৎ ১৯১৮ ও ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের অধীনে যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ছিল, সেখানে উনি কংগ্রেসদলীয় সদস্য ছিলেন। মানে, দেশবন্ধু যখন কংগ্রেসে যেতে বলতেন, ওরা যেতেন। আর যখন বেরিয়ে আসতে বলতেন, তখন বেরিয়ে আসতেন। তিনি দেশবন্ধুর খুবই প্রিয় সহকর্মী এবং শিষ্য ছিলেন। দেবতুল্য মানুষ বলতে যা বোঝায়, তা-ই ছিলেন তিনি।

আমার জীবনে অনেক ভালো বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু এই টাঙ্গাইলের পরেশ সান্যালের বক্তৃতা মানেই একটা বিরাট শিল্প এবং সেটা একটা শেখার জিনিস

ছিল। পরেশ সান্যাল রবীন্দ্রনাথকে সমানে আবৃত্তি করে যেতেন। আর যখন সুভাষচন্দ্র এলেন, তখন ওর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হলেন পরেশ সান্যাল। একেবারে সামরিক পোশাক-টোশাক পরেই হয়ে গেলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য। মনে পড়ে, সুভাষ বসুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাদের একটা ঘোড়া পরেশ সান্যাল চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি ও অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ যখন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, মুসলিম নেতারা তখন কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে সরে গেছেন। আমি যখন কংগ্রেসের সভা ইত্যাদিতে গিয়ে জনতার মধ্যে ঢুকে চুপ করে ঘাসের ওপরে বসে থাকতাম, সে সময় চাঁদ মিয়া সাহেবেরা আর কংগ্রেসের সভায় আসতেন না। চাঁদ মিয়া সাহেব আমার বাবাকে খুবই ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। তিনি প্রায়ই করটিয়ায় যেতেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নীকেও আমি দেখেছি ওই অবস্থায়। টাঙ্গাইলে থাকতে আমি অনেকবার এই দানবীরের স্নেহস্পর্শ লাভ করি। আমার বাবা যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আমি আমার বাবার একমাত্র সন্তান ছিলাম। আমার ভাইও নেই, বোনও নেই। বাবার এ রকমের একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে উনি গুরুত্বপূর্ণ কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমাকে প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ফলে ওই বয়সেই আমি বলতে পারি যে এ রকম বড় মাপের সব মানুষের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। অল্প বয়সেই আমি তাঁর ব্যক্তিত্ব, মানে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিচয় পেয়েছিলাম। অনুভব করতে পেরেছিলাম তাঁদের মতো মানুষের হৃদয়ের ঔদার্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবদীপ্ত ভূমিকার প্রেক্ষাপটে তখন তিনি সমাজ-সংসারের কল্যাণ এবং শিক্ষার প্রসারে ব্রতী। একদিনের ঘটনার কথা বলছি। সেবার বাবার সঙ্গে তাঁর ওখানে বেড়াতে গিয়েছি, ময়মনসিংহে। তিনি আমার বাবাকে দেখে খুবই খুশি হলেন। বললেন, 'তোমরা এসেছ, খুবই ভালো হয়েছে।' তিনি তখন কী ধরনের কাজ করতেন, এ ঘটনা থেকে বুঝতে পারবেন। বাবাকে দেখেই পন্নী সাহেব বললেন, 'জানো আব্দুল হামিদ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বুঝতে পেরেছ, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এই ঢুলি—ওরাও মুসলমান, আমরাও মুসলমান। আমি শুনলাম, ঢুলিদের সঙ্গে বসে নাকি আহার করা যায় না, যেহেতু তারা ঢোল বাজায়। আরে ঢোল বাজালে খাওয়া যাবে না কেন, বলো দেখি? আমি ওদের আজকে দাওয়াত করেছি। এই যে ফরাস বিছিয়েছি, আমি ওদের নিয়ে একসঙ্গে বসে খাব। তুমিও বসে যাও আমাদের সঙ্গে।'

তারপর খাওয়ার সময় হলো, ঢুলিরা এল। ঢুলিদের সঙ্গে বসে চাঁদ মিয়া সাহেব খেলেন। আমরাও বসে খেলাম। উনি আমার বাবাকে পুত্রপ্রতিম বলব না, পুত্রাধিক স্নেহ করতেন এবং আমার এই কথাটা বস্তুনিষ্ঠও বটে। একবার তাঁর ছেলের সঙ্গে একটা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি আমার বাবাকে আমার সামনেই বলেছিলেন, 'ও তোমার সঙ্গে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। ও তো কোনো কথা শুনবে না। আমি ওই লোকাল বোর্ডের মতো ওকে টাকাও তো দিয়ে দিতে পারি না। ও করুক না, নিজেই কাজ করুক। সমাজ সংস্কারের কাজ করুক। তা না, তোমার সঙ্গে ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেছে! এখন আমার কথা তো শুনবে না। আমি আর কী করতে পারি! আমি তোমাকে দোয়া করছি।'

অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে তাঁর ছেলের এবং আমারও খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। স্থানীয় কিছু লোক তাঁর ছেলেকে বাবার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপস হয়ে যায়। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। আবার দুজন একসঙ্গে মিলেজুলে কাজ করতে থাকেন।

প্রশ্ন : আমরা সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। আপনি সে সম্পর্কে বলছিলেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : হ্যাঁ, টাঙ্গাইলে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন সম্পর্কে দুটো কথা না বললেই না। আব্দুল সামাদ বলে একজন যুবক ছিলেন। তাঁর একটি দোকান ছিল। দোকানটা বিকেলের দিকে পরিণত হতো ক্লাবে। এবং সেখানে আসতেন পরেশ সান্যাল। আসতেন ননী সেন আর আসতেন পিসি সরকার। তখন পিসি সরকার একজন যুবক মাত্র। তখনো তিনি ভুবনবিখ্যাত জাদুকর পিসি সরকার হয়ে ওঠেননি। তিনিও ওখানে আসতেন। আড্ডা দিতেন। টাঙ্গাইলে ঢোকার একটু আগেই ছিল তাঁদের বাড়ি। ওখানটায় অর্থাৎ ওই দোকানের সামনে বেঞ্চ ফেলা থাকত। বসে লোকজনের সঙ্গে তিনি আড্ডা দিচ্ছেন। এই ছিলেন তখনকার পিসি সরকার। একদিন বিকেলে ননী সেন, তারপর পরেশ সান্যাল এসে বসলেন ওই সামাদ সাহেবের দোকানে। সামাদ নামের ভদ্রলোক আবার আমার বাবার খুব ভক্ত ছিলেন। সে কারণে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বিকেলবেলা স্কুল থেকে এসে একটু বেড়াতে বেরোতাম। এক ফাঁকে তাঁর ওখানে গিয়ে বসতাম। তখন থেকেই যাঁদের গুণীজন বলা হয়, তাঁদের আমি ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। পিসি সরকার তখন থেকেই রুমাল-টুমালের কিছু কিছু খেলা দেখান। আমাদের চোখে তখনই তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাই আমিও ওখানে যেতাম। একদিন ওখানে বসে আছি। শুনলাম, ঢাকার ডিভিশনাল কমিশনার আলেকজান্ডার ক্যাসেলস টাঙ্গাইল পরিদর্শন করতে এসেছেন। উনি লোকাল বোর্ড অফিস পরিদর্শন করলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গেলেন সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকে। আমার বেশ মনে আছে, এটা হলো ঠিক সেই সময়কার কথা, যখন টাঙ্গাইল একটা বাগানে ভরা শহর। তখন এক বাড়ি আরেক বাড়ির ওপর ওঠেনি। স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা যায় পার্কে—সকালে-সন্ধ্যায়; শহরের সবাই মিলিত হন। কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেন। অবসর সময়ে ধীরেসুস্থে রিলাক্সড ওয়েতে আলাপ-আলোচনা হতো। এ রকমই ছিল টাঙ্গাইল। তো, যা-ই হোক, আমি যা বলেছিলাম, সে কথায় ফিরে আসা যাক। আলেকজান্ডার ক্যাসেলস যখন সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের দিকে যাচ্ছিলেন, সে সময় কয়েকজনকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। তারপর ছোটাছুটি, চিৎকার, ডাকাডাকি, হুড়োহুড়ি 'কী হয়েছে', 'কী হয়েছে' বলে। কে যেন ছুটে যেতে যেতে বলল, 'গুলি লেগেছে।' কার গায়ে গুলি লেগেছে, কে গুলি করেছে—জানার আগেই দেখা গেল ক্যাসেলস সাহেবকে লোকজন অন্যদিকে নিয়ে চলে গেলেন। টাঙ্গাইল থেকে লঞ্চে করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে তাক করা গুলিটা লেগেছিল আলেকজান্ডার ক্যাসেলসের উরুতে। টাঙ্গাইলের যে মহকুমা ডাক্তার, তিনি তাঁর সঙ্গে গেলেন। ক্যাসেলস তাঁকে বললেন, 'তুমি কিছু কোরো না। কেবল ব্যান্ডেজটা করে দাও, যাতে আমি ঢাকা পর্যন্ত যেতে পারি।'

পরে ঢাকায় এসে অপারেশন করে গুলিটা বের করে ফেলা হয়। উনি বেঁচে যান। ঠিক সন্ত্রাসবাদের মতো কেবল এই একটি ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি। টাঙ্গাইলে এ রকমের ঘটনার আর কিছু মনে পড়ছে না। এখানে টেররিজমের চেয়ে ন্যাশনালিজমই ছিল বেশি। সন্ত্রাসবাদের এক নেতার সঙ্গে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক নেতার সঙ্গে আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। তিনি হলেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, যাঁকে পুরো কংগ্রেসি মহলে, বিপ্লবী মহলে, 'যুগান্তর' মহলে 'মধুদা' বলে ডাকা হতো। তাঁকে দেখলে তিনি যে ওই ধরনের কাজে লিপ্ত আছেন, এটা মনেই হতো না। সব সময় তাঁর মুখজুড়ে একটা সহজ, সুন্দর মিষ্টি হাসি। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর কেটেছে জেলে। কিন্তু বাইরে কখনোই ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততা প্রকাশ করতেন না। কেবল এক ভাবনা, দেশকে স্বাধীন করতে হবে যেকোনোভাবেই হোক। এ ছাড়া অন্য আর কোনো ধরনের ভাবনা ছিল না তাঁর। তিনি এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে কাউকে যখন বলতেন 'তুই অমুক লোককে গুলি করতে যা', সে তা-ই করতে যেত। এবং যে এই কাজ করতে যেত, সে জানত যে এই কাজ করে ধরা পড়লে তার ফাঁসি হতে পারে। তার পরও সে মনে করত, মধুদা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন বলেই ফাঁসিতে লটকে মৃত্যুবরণ করার দায়িত্বটা আমাকেই তিনি দিয়েছেন। তখনকার দিনের যেসব ছেলে এ ধরনের কাজে নামত, তারা এ রকমের মনোভাব নিয়েই নামত। তো, এ রকমের যে টাঙ্গাইল, তার একটা কথা আপনাদের আমি বলি। আমি তখন যুব কংগ্রেসের মিটিংয়ে গেছি। তবে খোলা মন ছিল। আঞ্জুমানে ইসলামিয়ারও মিটিংয়ে একইভাবে গেছি। তো, সেই 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' যেবার শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আনল, তাঁকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াল, সেবারও আমি তাদের সেই মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। আমার অভ্যাস ছিল, বিখ্যাত মানুষজনের ভালো ভালো কথাবার্তা শোনা। মনোভাবটা ছিল এ ধরনের। কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিখ্যাত সাংবাদিক, টাঙ্গাইলে বাড়ি—উনি এলেন আর গেলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এলেন। তাঁকে আমি এই টাঙ্গাইলেই দেখি। তারপর তো তাঁর খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয় আমার। টাঙ্গাইলে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা শুনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। কেননা, তখনো আমি ছাত্র। তা-ও আবার নিচের ক্লাসের। মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন। হেডমাস্টারের রুমে তাঁর জন্য খাবার-দাবারের কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উনি বললেন, 'না না, এসব আমি খেতে পারব না।' কে একজন একটা কিছু বলতে গেছে 'একটু কিছু খান' বলে—জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সবকিছু উদরস্থ করতে পারি না।' আমি তখন রুমের মধ্যেই ছিলাম। পরবর্তী সময়ে যখন কলকাতায় যাই, তখন আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যত না এসেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি আমাকে প্রভাবান্বিত করেছে ওই মানুষটির আচার-ব্যবহার ও চালচলন।

২. ছাত্রজীবন

প্রশ্ন : আমরা আবার একটু পেছনে ফিরে যাই। নানাবাড়ি থেকে আপনি টাঙ্গাইলে এলেন। সেখানেই বড় হয়েছেন এবং পড়াশোনা করেছেন। আপনার শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে বলুন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমার শিক্ষাজীবনের কথা বলতে গেলে এককথায় বলতে হবে

অপূর্ব। অপূর্ব সেই জীবন। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলে পড়তে আসার আগে আমি গুরু ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে যে প্রাইমারি স্কুল ছিল, সেখানে বছর খানেক পড়ি। বিন্দুবাসিনী স্কুলে এসে আমি ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হলাম। এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন দেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। আমি ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত এই স্কুলেই পড়াশোনা করি। এই কয়েক বছরই প্রতিদিন—কি শীত, কি গ্রীষ্মে—তাঁকে যে পোশাক পরে আসতে দেখেছি, সেটা ওই বঙ্কিমচন্দ্র ধরনের পোশাক। অবশ্য ছবিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় যে টুপি দেখা যায়, তেমন কিছু তাঁকে পরতে দেখা যেত না। ওই এক চাপকান আর প্যান্ট পরে তিনি আসতেন। ঠিক নয়টায় ক্লাসে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়তেন। এদিক-ওদিকও তাকাতেন না। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এসডিও। তাঁদের প্রত্যেকেই ইংরেজ আইসিএস। কোনো দিন তিনি তাঁদের বাড়িতে যেতেন না এবং তাঁকে ডেকে পাঠান, এমন সাহসও কোনো ইংরেজ এসডিও কখনোই করেননি।

স্কুল কমিটির গভর্নিং বডির যে মিটিং হতো, সেটা হতো হেডমাস্টারের অফিসে। এসডিও সাহেব এখানে আসতেন হেডমাস্টারের প্রয়োজনে। অথচ তিনি কিন্তু বলে পাঠাতে পারতেন যে আমি আসছি কাগজপত্র নিয়ে। কিন্তু আমরা তাঁকে এসডিওর বাড়িতে কখনো যেতে দেখিনি।

প্রশ্ন : আপনি আপনার ছাত্রজীবনের কথা, কলকাতার কথা, কীভাবে আপনি সমাজের বিভিন্ন রকম সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা দেখেছেন বা এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া এবং আপনি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সে সম্পর্কে বলেছেন। ১৯৪৮ সালে আপনি ছাত্রজীবন শেষ করে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডনে যান। আমরা এখন সেখান থেকে শুরু করব?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমি কিছুটা বলেছি আমার শৈশবের কথা। আজকে আবার আমি সেই সময়ের আরও কিছু কথা বলছি। আমার শৈশব কেটেছে একেবারে একটি পাড়াগাঁয়ে—নাগবাড়ীতে। তখনকার দিনে টাঙ্গাইল মহকুমা, ময়মনসিংহ জেলা। ময়মনসিংহ এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা এবং এই গৌরব বহু দিন ধরে রাখতে পেরেছিল সে। এখন সেটা ভেঙে গেছে।

টাঙ্গাইলে আমি ক্লাস টু-থ্রি পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুলে অল্প কিছুদিন লেখাপড়া করেছিলাম। তারপর ক্লাস থ্রিতে বিন্দুবাসিনী স্কুলে এসে ভর্তি হই। এখন যখন পেছনের দিকে ফিরে তাকাই, তখনকার সমাজজীবনকে অত্যন্ত ভালো লাগে। কেননা, একটা শূন্যতার পরিবেশ আমি সব জায়গায় দেখে এসেছি। আমি জানি না, ব্যক্তিগতভাবে শুধু আমিই দেখেছি, না সবাই দেখেছেন। কিন্তু আমার নিজের ধারণা, আমি যে পরিবেশের কথা মনে করে আনন্দবোধ করি এবং এখনো অনেক সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আমার শিক্ষকদের কথা মনে করি, যাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আনন্দিত হতাম, তাঁদের অনেকেই বেঁচে নেই। এই যে একটা মধুর সম্বন্ধ, সেটা আমার জীবনে প্রথম থেকে গড়ে ওঠে। একদিক থেকে আমি অনেক সময় চিন্তা করি যে শিক্ষক-সৌভাগ্য বলে কোনো বিষয় যদি থাকে, তাহলে আমার জীবনে সেটা সীমাহীনভাবে এসেছে। কেননা, আমি যখনই যেখানে পড়েছি, শিক্ষকদের এমন আচার-ব্যবহার, আদর্শনিষ্ঠ জীবন দেখেছি যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

সেটা টাঙ্গাইলের গুরু ট্রেনিং স্কুলে, বিন্দুবাসিনী হাইস্কুলে, ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে পেয়েছি। তাঁরা সমাজজীবনেও খুব আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের কথা বলতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যি আপ্লুত হয়ে যাই। কেননা, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করেছেন, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য তাঁদের সে কী আগ্রহ! অনেক শিক্ষকের মুখেই আমি অনেকবার শুনেছি যে তাঁদের গৌরব ছাত্রের সাফল্যে। সেই ধারাটি ঠিক এভাবে এখন সব সময় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা দুঃখের কথা। আমাদের জমিদারি থেকে দুটি হাইস্কুল চালানো হতো এবং সম্প্রতি আমি সেগুলো দেখতে গিয়ে শিক্ষকদের অমনোযোগিতা লক্ষ করে এত বিভ্রান্ত হয়েছি যে কী বলব! এখন আমার ভাবনা, হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাকে সেখানে যেতে হবে। সে জন্য দেখুন, শফিপুর থানায় আব্দুল হামিদ চৌধুরী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি; আমার বাবার নামে। তো, ওটা আমি দেখার জন্য খুব শিগগির সেখানে যাচ্ছি। আর নাগবাড়ীতে আমি গিয়েছিলাম আমার মায়ের নামে যে স্কুলটা প্রতিষ্ঠা করেছি, যার নাম হাসিনা চৌধুরী হাইস্কুল, ওটার সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়ে এসেছি। ওটা চলছে খুবই ভালোভাবে। ওদের পরীক্ষাও অনেক ভালো হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ সম্পত্তি ওদের নামে দেওয়া হয়েছে, তাতে করে তাদের আরও ভালো চলা উচিত। সে যুগে হাইস্কুলের শিক্ষকেরা তাঁদের পরিবারের কথা চিন্তা করতেন না বলেই আমার মনে হয়। ব্যাপারটা অবশ্য আমি তলিয়ে দেখিনি। কেবল তাঁরা স্কুল আর ছাত্রদের নিয়ে চিন্তা করতেন। আপনারা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এটা একটা নিরেট সত্য কথা। আর এ যুগে এসে দেখছি যে শিক্ষকেরা কীভাবে অর্থ উপার্জন করবেন, সে চিন্তাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আমার নিজের স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি। এটা খুবই দুঃখজনক।

যাক, আমি যে কথা বলছিলাম, সেটা বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করার জন্য বলছি না। আমি অনেক সময় চিন্তা করি যে আমার যে শিক্ষক-ভাগ্য, এমনটা আর কজনের ভাগ্যে জুটেছে, আমি জানি না অথবা এ যুগেও সবাই যে ওই রকম ভাগ্যবান হবে, সেটা ভাবাও ভুল। আমার সহপাঠীদের যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে একই রকম মন্তব্য পাবেন। আমি যেমন দেখেছি যে প্রতিটি ছেলেকে গড়ে তোলাই ছিল তখনকার শিক্ষকদের জীবনের একমাত্র সাধনা ও আদর্শ। আমি তো এর আগে বিন্দুবাসিনী স্কুলের হেডমাস্টার যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা আপনাদের কাছে বলেছি। তাঁর জীবনে আর কিছু ছিল না। আর সে কারণেই তিনি ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে একটি স্কুলের শিক্ষকতা করতে পেরেছিলেন। আর আমি খুশি হয়েছি যে ওই স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসবে তাঁর পোর্ট্রেটটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়, যেটা তাঁরা তাঁদের সভায় রেখেছিলেন এবং প্রত্যেক বক্তাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন। এই যে আমার বিন্দুবাসিনী স্কুলের অভিজ্ঞতা, আমি তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আপনাদেরও বিরক্তি ঘটাতে চাই না। কিন্তু এ রকম একটি ইউনিফর্ম এক্সপেরিয়েন্স আমার জীবনে হয়েছিল। তাঁদের কোনো একটি দুর্বল মুহূর্তেও আমি কখনো কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো ধরনের অবহেলা পাইনি। এটা টাঙ্গাইলের কথা, এটা বিন্দুবাসিনী স্কুলের কথা। দেখুন, প্রেসিডেন্সি কলেজে কোনো দিন স্ট্রাইক হয়নি, এখন হয়ে থাকতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ১৯৪২ সালে

এমএ পাস করে বের হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে স্ট্রাইক হয়নি। কেবল একদিন হয়েছিল, ফজলুল হক তখন প্রধানমন্ত্রী।

প্রিন্সিপাল হিন্দু ছিলেন। আমি একটু এভাবে কথা বলছি, এই হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তাতে আপনারা মনে করবেন না যে উনি এই কথাগুলো বললে সরাসরি বোঝার সুবিধা হয়। প্রিন্সিপাল হিন্দু, তাঁকে সবাই বিএম সেন বলে জানেন, ব্রজমোহন সেন। তাঁর তো মনে মনে খুশি হওয়া উচিত ছিল যে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কলকাতার সব কলেজ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে হরতাল করল, তা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরাও করেছে। অবশ্য মুসলিম লীগ ডমিনেটেড মিনিস্ট্রিটি বাতিল হয়েছে, তাতে তাঁর খুশি হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তিনি যে কাজটি করলেন, তার বর্ণনা একটু শুনুন আমার কাছে। আমার মনে কথাগুলো দাগ কেটে আছে, এগুলো আমি ওই একদিন শুনেছি এবং আজকে আমি সেগুলো পুনরাবৃত্তি করব। কিন্তু তাঁর ওই মৌখিক বক্তৃতা আরেকজন লোকের মনে যখন লেখা হয়ে থাকে, এটাও কিন্তু সেই শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধার কারণেই। তিনি পরের দিন লেকচার থিয়েটারে সব ছাত্রকে সে কথা বলেন। উনি বিজ্ঞানের শিক্ষক। কথা খুব আস্তে আস্তে বলেন। উনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে একদিন বলেওছিলেন, 'আমি বক্তৃতা দিতে পারি না।' কোথাও বক্তৃতা দেওয়ার দরকার নেই। কেননা, তাঁর অন্তর থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে আসে। উনি পরের দিন লেকচার থিয়েটারে বললেন : 'আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য উইন্ডো অব মাই অফিস অ্যান্ড ওয়াচিং পিপল অন দ্য কলেজ স্ট্রিট। আই ফাউন্ড দ্যাট দ্য ডক্টরস ওয়্যার অ্যাটেন্ডিং দেয়ার পেসেন্টস, ল ইয়ারস অ্যাট দেয়ার কোর্ট, বিজনেসম্যান ওয়্যার অ্যাটেন্ডিং দেয়ার ঔন বিজনেস, ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, মাই স্টুডেন্টস ওয়্যার গ্যাদারিং নিয়ার মাই গেট। ইট শৌজ দ্যাট ইন দ্য সিটি অব ক্যালকাটা মাই স্টুডেন্টস হ্যাভ দ্য মোস্ট রিজার্ভড পিপল। ওয়েল, দিস ইজ নট দ্য ট্র্যাডিশন অব দ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ। ইফ ইউ হ্যাভ কাম ফর স্টাডিস হেয়ার, ইউ মাস্ট ডু ইট নাউ অ্যান্ড প্রিপেয়ার ইউরসেলফ ফর দ্য ফিউচার। প্লিজ, ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ প্রমিস। আই নো, মেনি অব ইউ পারসোনালি। আই নো, মেনি অব ইউর ফ্যামিলিজ অ্যান্ড আই হ্যাভ গিভেন দ্য সেম অ্যাডভাইস টু মণি সিংহ সেন অ্যাজ আই গিভিং ইউ। আই শ্যাল নট অ্যালাউ অ্যানি স্ট্রাইক ইন মাই কলেজ।' তারপর তিনি তাঁর ফেল্ট হ্যাটটি তুলে মাথায় চাপিয়ে আস্তে করে বেরিয়ে চলে গেলেন। ওই যে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন, একই কথা বলেছিলেন তিনি তাঁর ছেলেকেও। তিনি জোর দিয়েছিলেন 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ'। তাঁর একমাত্র পুত্র মণি সিংহ সেন পরে পরীক্ষা দিয়ে প্রতিযোগিতা করে আইসিএস পাস করেছিলেন এবং শেষের দিকে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব হয়েছিলেন। যা-ই হোক, এ রকম একটা পরিবেশ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে।

৩. হিন্দু-মুসলমান সামাজিক সম্পর্ক

প্রশ্ন : ময়মনসিংহে ওই সময়ের হিন্দু রাজনীতিবিদ যাঁরা, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবু সাঈদ চৌধুরী : ময়মনসিংহের তখনকার হিন্দু রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও আমার বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেটা এ কারণেই যে পিছিয়ে-পড়া এই মুসলমান জাতিকে সংগঠিত করতে হবে, তাদের উন্নতি করতে হবে, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করে নয়—মুসলিম লীগ যাঁরা করতেন, তাঁদের এ রকমেরই মনোভাব ছিল। আমার বাবার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তাঁর সমগ্র জীবনে কেউ কখনো লক্ষ করেনি। একটি লোকও এ দেশে পাওয়া যাবে না যে বলবে, কোনোরকম সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি মুসলিম লীগে থাকলেও ওভাবে ছিলেন না এবং সে কারণেই, লক্ষ করে দেখবেন যে বেশির ভাগ সময় তিনি ওখানে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট থাকা মানেই তাঁকেও বেশ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে চলতে হতো এবং কিছুটা দলগত স্বার্থের ওপরে থাকতে হতো সব সময়।

তিনি লেজিসলেটিভ এসেম্বলির উচ্চপরিষদে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট অব কাউন্সিল ছিলেন। প্রথমবারে তো তিনি তিন বছরের জন্য ইলেক্টেড হলেন। তার পরেরবার ছয় বছরের জন্য ইলেক্টেড হলেন। সেবার তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। অথচ এ রকমটা আর কখনো হয়নি, যা নিয়ে তখন *কৃষক* পত্রিকায় আবুল মনসুর আহমদ ওই নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর তাঁর চিরাচরিত প্রথায় একটা এডিটোরিয়াল লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল হামিদ চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় আইনসভার উচ্চপরিষদে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহাকে আমরা অভিনন্দন দিতে বাধ্য এবং ডবল অভিনন্দন দিতে বাধ্য।'

আমি আপনাদের সেই সম্পাদকীয়টা দেখাব, আমার কাছে আছে। কেননা, তিনি মুসলিম লীগের নমিনেশন পেয়েছিলেন। অতএব, মুসলমান হিসেবে আমরা তাঁকে অভিনন্দন দিতে বাধ্য এবং তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমর্থন পেয়েছিলেন। তার জন্যও আমরা কংগ্রেসের ভাড়াটে হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন দিতে বাধ্য। ব্যাপারটা হলো কি জানেন, শরৎ বোস এ রকম একটা নির্দেশ দিলেন যে মুসলিম লীগ যেখানে এমন একজন লোককে নমিনেশন দিয়েছে, যার ভেতরে, যাকে বলে দলগত বা সম্প্রদায়গত কোনো সংস্কার নেই এবং মুসলিম লীগ নির্বাচিত হবেই, সেখানে সেই জাতীয় লোকের সঙ্গে আমি কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব? বরং আমরা দেখাই, লীগের তরফ থেকে এ জাতীয় লোক মনোনয়ন দিলে তেমন প্রশ্ন উঠবে না। তার পরও হুমায়ুন কবিরকে কেন মনোনয়ন দেওয়া হলো না, তার উত্তরে এ বিবৃতিই তিনি দিয়েছিলেন। সে কারণে আমরা হুমায়ুন কবিরকে সমর্থন দিলাম না। কারণ, হুমায়ুন কবির যদি নির্বাচিত হতেন, তাহলে অন্য রকম কিছু হতো। কিন্তু না, আমরা জানতাম যে তিনি নির্বাচিত হতে পারবেন না। এবং সিদ্ধান্তটা ছিল এ রকমের যে যাঁকে আমরাও পছন্দ করি, নির্বাচনে তাঁর বিরোধিতা করা উচিত নয়। ওই যে আবুল মনসুর সাহেবের সম্পাদকীয়র কথা বললাম, উনি আরেকটু টেনে নিয়ে বললেন যে এই কি প্রথমবার কংগ্রেস পরাজিত হতে যাচ্ছিল, যেটা অ্যাভয়েড করার জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এ হলো এক নম্বর ব্যাপার। দুই নম্বর, ওই যে বললেন, 'এমন একজন ব্যক্তিকে দিয়েছে, যাঁকে আমরাও পছন্দ করি'—এ রকম মন্তব্য আব্দুল হামিদ চৌধুরীর কাজে লাগবে, না তার বিরুদ্ধে যাবে—সেটাও ভেবে দেখার কথা। যা-ই হোক, সেটা তো ছিল ন্যাচারালই কৃষক প্রজা পার্টির পেপার; তার পরও দেখুন, তাদের এই বিরোধিতার মধ্যে

বা ওই সম্পাদকীয়র মধ্যে রসিকতা ছিল, কিন্তু তিক্ততা ছিল না। সম্পাদকীয়টা দেখবেন, তাতে তাঁরা যখন তাঁদের কথাগুলো রেকর্ড করেছেন, একেবারেই তা তিক্ততাহীন। তখনকার দিনের রাজনীতি বুঝতে হলে এগুলো বুঝতে হবে।

প্রশ্ন : হিন্দু-মুসলমান কো-অপারেশন কী রকম ছিল?

আবু সাঈদ চৌধুরী : টাঙ্গাইল তো একেবারেই মুসলমানদের জায়গা; কিন্তু ছাত্র—আমার যতদূর মনে পড়ে, হিন্দুর সংখ্যা বোধ হয় বেশিই ছিল অথবা প্রায় সমান সমান। কিন্তু শিক্ষকদের প্রায় সবাই হিন্দু ছিলেন। এক-দুজন বাদে। ফারসি আর আরবি মৌলভি সাহেবেরা পড়াতেন। তাঁরা খুবই শ্রদ্ধাস্পদ মানুষ ছিলেন। তাঁদের সবাই খুব শ্রদ্ধা করত।

তারপর আমি ময়মনসিংহ চলে গেলাম। আমার বাবা তো—ওই যে বললাম আপনাকে, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এসে তিনি লোকাল বোর্ডে কাজ করতে শুরু করলেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি, সেই নাইনটিন থারটি বা থারটি ওয়ানের সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হন তিনি।

প্রশ্ন : তখনকার সামাজিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে মুসলমানদের, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের দীপ্ত অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, শহরে তাদের প্রাধান্য কী রকম ছিল বা ছিল না?

আবু সাঈদ চৌধুরী : আমার নিজের ধারণায় দেখুন, শহরগুলোতে তখন মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে, লোকাল বোর্ড হয়নি। কোথাও না। কেবল মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে মুসলমান হতেই হবে—এমন কোনো ব্যাপার ছিল না। ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার ব্যাপারটাই ছিল না, এখন যেমনটা হচ্ছে। এখন আর কোনো হিন্দু দাঁড়াচ্ছেই না। মোক্তার বলে এক ভদ্রলোক, আইনসভার সদস্য, একবার বোধ হয় টাঙ্গাইলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। আমার এ বিষয়টি খুব ক্ষীণভাবে স্মৃতিপটে আসছে। তখন সবাই এটা সহজভাবেই নিতেন যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান একজন হিন্দু হবেন। কোনো কোনো সময় মুসলমানও হয়েছেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি হিন্দু-মুসলমানের যেটা সাম্প্রদায়িকতা, টাঙ্গাইলে তেমন কিছুই দেখিনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা নেই, বার্তা নেই, লাগিয়ে দিলেন দাঙ্গা—এসব কিছু তখন দেখিনি। আপনিও দেখতে মানুষের মতো আর একজনও দেখতে মানুষেরই মতো। কিন্তু কে যেন বলে দিল তার হিন্দু নাম এবং তার মুসলমান নাম, অমনি তারা শুরু করে দিল মারপিট। এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা টাঙ্গাইল কেন, ময়মনসিংহেও চোখে পড়েনি, অন্য কোথাও পড়েনি। ১৯৪৬ সালে যখন এ রকম উন্মত্ত ব্যাপারস্যাপার কলকাতায় ঘটল, তখন ওই নারকীয় ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হয়নি। কারণ, আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। যা-ই হোক, মিউনিসিপ্যালিটিগুলোয় নেতৃত্ব করতেন তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। কিন্তু সেটাও মুসলমানরা এতটা সহজভাবে নিয়েছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নই উঠত না। তা ছাড়া ব্যাপারটা নির্ধারিত হতো ভোটাভুটিতে। শহরে সবকিছু হতো গণতান্ত্রিকভাবে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কোথায়? আর হিন্দুরা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে একজন মুসলমানকে নিলেও ভাইস চেয়ারম্যান কোনো কোনো সময় একজন হিন্দুও হতেন। যেমন ধরুন, ময়মনসিংহে পর্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁকে 'জ্ঞান দত্ত' বলেই জানত লোকজন; পেশায় উকিল ছিলেন, অনেক দিন তিনি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। অত্যন্ত

ভালো লোক ছিলেন রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র। দেখুন, সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে মাঝেমধ্যেই কলকাতা ও ঢাকার মতো জায়গায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আসলে আমি জানি না, কী করে এসব ঘটছে! আমি আসলে যেসব জায়গায় পড়াশোনা করেছি কিংবা থেকেছি, তার কোথাও আমি সাম্প্রদায়িকতা দেখিনি। আমাকে একজন ভদ্রলোক এক বিয়ের আসরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে কয় বছর পড়েছি? বলেছিলাম, ছয় বছর পড়েছি। পড়েছি আইএ থেকে এমএ পর্যন্ত।

সেটা নাইনটিন ফরটি সিক্সের কথা। ওই সময় আমি কখনো কোনো সাম্প্রদায়িকতা দেখিনি। এর অর্থ এই নয় যে আমি হিন্দুদের তোষামোদ করে বেড়াতাম। তাদের তোষামোদ না করার কারণেই হিন্দুরা আমাকে ভালোবাসত। বস্তুত, আমি সাম্প্রদায়িকতা দেখিনি। তাহলে তো ইতিহাসের বরখেলাপ করা হবে। আমি অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লিগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। প্রায় একই সময়ে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজেরও জেনারেল সেক্রেটারি হই। তার পরও আমি সাম্প্রদায়িক হতে পারিনি। ব্যাপারটা আমার বোধেই আসেনি। আমার বাবার চরিত্রের ধরনটা এ রকমের ছিল যে আমি আমার কর্তব্য করে যাব, অন্যের অশুভ কামনা করব না। এটা হিন্দুরাও বুঝেছিল, মুসলমানরাও বুঝেছিল এবং আমরা, মানে আমি যখন অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লিগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম, তখন আমি কেবলই চিন্তা করেছি যে আমাকে দিয়ে যেন হিন্দুদের কোনোরকম ক্ষতি না হয়। এই মনোভাব আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে।

আমরা যেটা করতাম, তার নাম অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন ছিল না। ওটার নাম ছিল অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লিগ। এটাই আসল সংগঠন ছিল। বোধ হয় ফজলুল কাদের চৌধুরীরা ফেডারেশন নামে একটা কিছু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওটা দানা বাঁধেনি। ওটা পরের ব্যাপার এবং হলওয়েল মনুমেন্ট যখন অপসারিত হয়, তখন আমি ছিলাম অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লিগের জেনারেল সেক্রেটারি, আর ওয়াসেক সাহেব ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট। তবে সেসব কথায় পরে আসা যাবে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কথা বলতে গেলে বলতে হবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার সংস্পর্শে কখনোই ছিলাম না। তবে সাম্প্রদায়িকতা কোনো কোনো জায়গা বা প্রদেশে ছিল। সেটা আমি দেখেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজে কেন সাম্প্রদায়িকতা থাকবে! বারো শ ছাত্র ছিল। তার মধ্যে ১৩৫ জন ছাত্র মুসলমান। প্রেসিডেন্সি কলেজে যেসব হিন্দু ছেলে আসতেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আসতেন বড় বড় সব গাড়িতে চড়ে; ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে, দামি স্যান্ডেল পায়ে গাড়ি থেকে নামতেন। ধরা যাক, পাইকপাড়ার মহারাজার ছেলের কথা। তাঁর সঙ্গে কোনো মুসলমান ছেলের স্বার্থের সংঘাত লাগলে তো! তার অবকাশই ছিল না। তাহলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধতে যাবে কেন? যদি সংঘর্ষ না লাগে তাহলে তো দ্বন্দ্বই সৃষ্টি হয় না। উড়িষ্যার এক নেটিভ প্রিন্সের ছেলের কথাই ধরা যাক। সবাই তো আর একরকমের নয়। সাধারণ লোকজনের মধ্যে আসত। আর যে চুপ করে এক কোনার আসনে বসে থাকত, যেমন সত্যজিৎ রায়ের কথাই ধরুন, তার কী প্রয়োজন পড়েছে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বসে বা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে?

প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায় কি আপনার ক্লাসমেট?

আবু সাঈদ চৌধুরী : সত্যজিৎ রায় আমার ক্লাসমেট। তারপর ভাবুন সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের কথা। তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে গল্প শুনেছেন যে তাঁর নানা, অর্থাৎ তাঁর মাতামহ এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। হঠাৎ ইংরেজরা তাঁকে কী জানি কী বিষ খাইয়েছিল আর তার প্রতিক্রিয়ায় উনি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে হতে দার্জিলিংয়ে মারা গেলেন। এখন ওই হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্থাপনের কাজের ভার তাঁর নানা তাঁর ওপরেই দিয়ে গেছেন। একটু রসিকতার সুরেই কথাটা আমি বলছি; কিন্তু কথাটা সত্যি। সিদ্ধার্থ শংকর রায়, আমার সামনে, আমাদের সামনেই আমাদের সহপাঠী করিমকে—পরে পুলিশ অফিসার হয়েছিলেন, কিছুকাল আগে মারা গেছেন—বলেছিলেন, 'এই দ্যাখ, প্রত্যেক ক্লাস থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিন্দু হবে নাকি রে? তুই দাঁড়া। আমি তোর হয়ে ক্যানভাস করব।' এসব কথা এ কারণেই বলা।

প্রশ্ন : ওই সময় টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এলাকায় আরও কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে বলুন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : নিশ্চয়, নিশ্চয়, যেমন পরেশ সান্যালের কথায় আসা যাক। ঠিক তাঁর সমবয়সী আরেকজন যুবক কীভাবে ওই একই সময়ে টাঙ্গাইলে আমাদের মতো কিশোর-তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁর কী রকম চরিত্র ছিল, সে কথা বলা যাক। তিনি রাজনীতি করতেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ননী সেন। তিনি আমাকে নিজে বলেছিলেন যে তাঁর আঙুলের নিচ দিয়ে, তাঁর নখের নিচ দিয়ে যখন সুঁই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি চুপ করে থাকার চেষ্টা করেছেন। চোখ থেকে যাতে পানি না পড়ে, সে চেষ্টা করেছেন। তো, সেই ধরনের লোক ছিলেন ননী সেন। তাঁর বাড়ি ছিল ঠিক কালিহাতী থানার কাছে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নির্ভীক সৈনিক ছিলেন। তা ছাড়া খুবই নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীও ছিলেন। তার চেয়েও একটা বড় জিনিস বলব আপনাদের, যেটা বলার জন্যই বিশেষ করে ননী সেনের কথা উল্লেখ করছি। সেটা হলো যে কালিহাতীতে আপনারা সবাই গেছেন, দেখেছেন একটা নদী আছে। সেই নদীর পাড়ের গ্রামে একবার কলেরা লাগে। তখন আমি সেই জায়গার লোকজনের কাছ থেকে শুনি যে ননী সেন সেই বাড়িগুলোয় সশরীরে উপস্থিত হয়ে কলেরা রোগীদের সেবা করেছেন, তাদের কাপড়চোপড় নিজের হাতে ধুয়েছেন। উনি অনেকবার জেলেও গেছেন। কিন্তু তাঁর জেলে যাওয়ার চেয়ে আমি তাঁর ওই যে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করাকেই অনেক বড় কিছু বলে মনে করি। একেই বলে বীর্য। একে আমি একেবারেই বিরল ব্যাপার বলে মনে করি। জেলে যাওয়া এর চেয়ে অনেক সহজ। এ ধরনের যুবক এবং যুবনেতা টাঙ্গাইলের মতো জায়গায় তখন ছিল।

প্রশ্ন : এঁরা আদর্শ ব্যক্তিত্ব?

আবু সাঈদ চৌধুরী : এখন এ ধরনের চরিত্রের অধিকারী না হলে যুব সম্প্রদায়ই গড়ে উঠবে না। আর বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়দের মধ্যে, একটু আগেই বলেছি, চাঁদ মিয়া সাহেব অত্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত-পালিত, সেই মানুষটি, জানেন তো যে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং জেলেও গিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য একটা সময় এল, যখন অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন। সেই সময় উনিও ছেড়েছিলেন; কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা কোনো সময় করেননি। আর তখন তিনি ওই গ্রামীণ শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারের মতো কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আমার একটা সুবিধা ছিল এই যে ওই সময় যত লোকের সঙ্গেই আমি পরিচিত হয়েছি, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং কলকাতায়, আমার বাবার মাধ্যমেই সেটা হয়েছি। আমার বাবার সুবাদেই আমি দেখা করতে গিয়েছি স্যার আব্দুল করিম গজনবীর শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে। তিনি ব্রিটিশ আমলে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। তো উনি দেলদুয়ারে এলেন। আমার বাবাও দেলদুয়ারে গেলেন। সঙ্গে আমি। দেখলাম অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই শ্রদ্ধাস্পদ মানুষটিকে। চাঁদ মিয়া সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। তাঁর ছেলে মাসুদ আলী খান পন্নী, যাঁর ডাকনাম নবাব মিয়া, তিনি ছিলেন গজনবী সাহেবের মেয়েজামাই। তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। চাঁদ মিয়া সাহেব আর গজনবী সাহেব, অর্থাৎ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ও স্যার আব্দুল করিম গজনবী—এঁরা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এবং দুজনই মুসলমানদের উপকার করতে চান, দেশের উপকার করতে চান। একজন চান, দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে তার ফল দেশের জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে, ইংরেজকে বিতাড়িত করে দেশের সার্বিক ক্ষমতা সাধারণ মানুষের আওতায় নিয়ে যেতে। আর দ্বিতীয়জন মনে করলেন যে এ তো অনেক দূরের পথ। ফলে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেই সমাজের উন্নতি করতে চেয়েছেন। স্যার আব্দুল করিম গজনবীকে আমি এভাবেই দেখেছি। নওয়াব আলী চৌধুরীর সঙ্গেও আমার বাবার অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি যখন ভালো করে সব বুঝতে আরম্ভ করেছি, তার আগেই অবশ্য তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

প্রশ্ন : তিনি ১৯২৯ সালে মারা গেছেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ও নিরহংকার মানুষ ছিলেন। 'শরিফ' শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। এ কথা কেবল তাঁর বংশের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে বলছি না, বলছি সামগ্রিক বিচারে। নওয়াবজাদা হাছান আলী চৌধুরীর সামাজিক আচার-ব্যবহারে আমরা নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রায় হুবহু প্রতিফলন বা রিফ্লেকশন দেখতে পেয়েছি। স্যার আব্দুল করিম গজনবীর সঙ্গে আমার কলকাতায় কীভাবে দেখা হয়েছিল, সে কথা একটুখানি বলি। আমার বাবাকে উনি খুব স্নেহ করতেন। সে কারণেই তাঁর ওখানে আমাদের যাতায়াত ছিল। তা ছাড়া কলকাতা শহরে একটা সংগঠন আমরা গড়ে তুলেছিলাম। কলকাতা মহানগরীতে ময়মনসিংহের যেসব মুসলমান থাকতেন, তাঁদের একত্রে মিলিত হওয়ার জন্যই এ সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে কোনোমতেই কোনো সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য থেকে নয়। ওটার নাম ছিল 'ময়মনসিংহ মুসলিম জেলা সমিতি'। সেই সংগঠনের সভাপতি করা হলো স্যার আব্দুল করিম গজনবীকে। সেক্রেটারি কে ছিলেন, এখন আর আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলাম। প্রথম দিকে আমি বছর দুয়েক বেকার হোস্টেলে ছিলাম। তারপর আমার বাবা ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলর হওয়ার পর থিয়েটার রোডে তিনি বাড়ি নিলে আমরা সেখানে থাকতে শুরু

করলাম। ওখানে আমাদের নিজেদেরও বাড়ি ছিল। কিন্তু আমি যখন ওই মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে যেতাম, তখন স্যার আব্দুল করিম গজনবী বেকার হোস্টেলে তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। আমি সেখানে যেতাম, তাঁর গাড়িতে চেপেই। ঘরোয়া আসরের মতো কিছু একটা হতো সেখানে মাঝেমধ্যেই। যেমন: নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী সবাই পালন করছে, আমরা ময়মনসিংহের লোকজন তার থেকে বাদ যাব কেন? শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরে নজরুল ইসলামকে ধরে নিয়ে এলাম। এ ধরনের কাজ ছিল। তারপর স্যার এফ রহমানকে ধরা হলো উনি একটা বক্তৃতা দেবেন বলে। 'ময়মনসিংহ মুসলিম জেলা সমিতি' ছিল একটা ক্লাবের মতোই। যদি এই কথা জিজ্ঞেস করেন যে মুসলমানদের পৃথকভাবে এমন কিছু করার দরকার ছিল কি না, সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। কেননা, পৃথকভাবে কিছু করতে গেলেই ময়মনসিংহের মহারাজা এসে যেতেন, স্যার আব্দুল করিম গজনবীকেও তাতে রাখতে হতো। সেদিকে আমরা যাইনি। আমরাই কয়েকজনে বসে একান্ত ঘরোয়াভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগঠনটা গড়ে তুলেছিলাম। বৃহত্তর কিছু করতে গেলে তো তার প্রেসিডেন্ট কে হবেন—ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, না অন্য কেউ, এসব কথাবার্তা চলে আসত।

প্রশ্ন: মুক্তাগাছার সূর্যকান্ত অথবা গৌরীপুরের আচার্য কিংবা সন্তোষের রাজা—এঁদের সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী: মুক্তাগাছার সূর্যকান্ত অথবা গৌরীপুরের আচার্য কিংবা সন্তোষের রাজার মতো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বসে দীর্ঘ সময় ধরে আমি আমার দাদাদের গল্প করতে দেখেছি। কেননা, তাঁদের সবাই বয়স্ক মানুষ ছিলেন। আমি তো তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে যেতে পারি না। আমি একমাত্র সন্তান হওয়ায় আমাকে আমার বাবা তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। তখনকার দিনে অনেক সময় ব্যাপারটা আমি ভালোও মনে করিনি। ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী তখন গৌরীপুরের জমিদার। ব্যক্তিত্ববান মানুষ। ছিলেন অতি ভদ্রলোক এবং দেশাত্মবোধও ছিল প্রখর। সেই দেশাত্মবোধ থেকেই তিনি টাকা দিতেন। এটা আমি তখনকার দিনের কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকেও শুনেছি। কম জমিদারই এটা করতেন। যেমন: ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, চাঁদ মিয়া সাহেব—এঁরা তো যোগদান করতেন; কিন্তু এই ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী এবং মুক্তাগাছার জমিদার পরিবার ছিলেন দেশবন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত। জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, যিনি এই দিন কয়েক আগেও আমার এখানে এসেছিলেন, *অ্যামি* বলে একটা বই লিখেছেন, সেটা সবারই পড়া উচিত। ওই বইতে তৎকালীন জমিদারদের কীর্তিকলাপ (ওর ভেতরে আর কিছু নেই, ওই কারণেই এ নাম তিনি দিয়েছেন) জীবন বাবু যা কিছু দেখেছেন, দিয়েছেন তাঁরই বর্ণনা এ বইয়ে। কীভাবে ময়মনসিংহের রাজপরিবার, মানে এই জমিদার পরিবারগুলো কেমন আচরণ করত, সেসব কিছু তুলে ধরেছেন তার অংশীদার হয়ে। সে কারণেই তিনি বইটার নাম দিয়েছেন *অ্যামি*। ওই *অ্যামি*তে উনি লিখেছেন যে এখানে উনি আসতেন। আমার এখানে থাকতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি প্রথম এসেছিলেন এখানে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের আমি তখন চেয়ারম্যান। তখন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, তিনি তখন বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডাইরেক্টর ছিলেন,

আমাকে একদিন বললেন যে এই বইগুলো তো পড়ে আছে মুক্তাগাছার জমিদারবাড়িতে। এভাবে থাকলে তো চুরি হয়ে যাবে। এগুলো কি আনা যায়? আমি আমার বাবাকে বললাম। তাঁর সঙ্গে ওই পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি চিঠি লিখলেন কুমার জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীকে। তিনি তখন বহররমপুরে, যেখানে এত বড় একটা কাছারি ছিল, সেখানে তিনি গিয়ে আবার একটা ছোট কাছারি করেছেন, একটা হাইস্কুল করেছেন। এসব নিয়ে তিনি পড়ে থাকেন। ওখানে আমার বাবা চিঠি লিখতেই তিনি ঠিক ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন এই বলে, 'আমি খুব খুশি হলাম যে আমার বইগুলো শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল। আপনি এটাকেই লেটার অব অথরিটি মনে করে বাংলা উন্নয়ন বোর্ডকে বইগুলো নিয়ে আসতে বলুন।'

তারপর ড. এনামুল হক তাঁর লোকজন নিয়ে গিয়ে বই দেখলেন। তারপর ট্রাক বোঝাই করে আনলেন। গভর্নিং বডি থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা মঞ্জুর করালেন। যেসব বই বাঁধানো দরকার, শেলফ তৈরি করা দরকার। সেসব কিছু করে খুব সুন্দর করে বইগুলো তিনি সাজিয়ে রাখলেন। তাঁদের একটি মাত্র অনুরোধ ছিল যে বইগুলো যেন আলাদাভাবে রাখা হয় এবং মুক্তাগাছার লাইব্রেরি হিসেবে যেন চিহ্নিত করা হয়। জীবেন্দ্রকিশোর আচার্যের পূর্বপুরুষ রাজা জগৎকিশোর লাইব্রেরিটা করেছিলেন। দেয়ালে টাঙানো ছবিটা দেখুন। তো, সেভাবেই ছিল বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে। তারপর বাংলা উন্নয়ন বোর্ড আর বাংলা একাডেমী যখন একসঙ্গে মার্জ হয়ে যায়, তখন এই বইগুলো বাংলা একাডেমীতে এসেছিল। এলে আমি মঞ্জুরে মওলাকে এ সম্পর্কে বললাম। তিনি বললেন যে আমি তো ঠিক এ সম্পর্কে কিছু জানি না, স্যার। গ্রহণ করা সিদ্ধান্তমতে যাতে বইগুলো আমাদের এখানেও থাকে, সে ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করব। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন যে আমি জীবেন্দ্রকিশোর আচার্যকে নিমন্ত্রণ করব লাইব্রেরি সাজিয়ে। তিনি একবার এসে দেখে যান তাঁর বইগুলো কীভাবে আছে। তাতে করে তিনিও তৃপ্তি পাবেন, আমরাও তৃপ্তি পাব।

তারপর মঞ্জুরে মওলা বাংলা একাডেমী থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। চলে গেলেন সচিবালয়ে। তখনকার দিনের রাজনীতি বুঝতে হলে এগুলো বুঝতে হবে।

একটু আগে মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের কথা বলছিলাম। তাঁদের কথা। ওই পরিবারের একজন জীবন বাবু। আমি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তখন তিনি এসে ওই কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হন। ভারত ভাগের সময় ওই পরিবারের সবাই ভারতে চলে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জীবন বাবু বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি মুক্তাগাছায় গিয়েছিলেন। তখন আমি শামসুল হুদাকে বললাম, 'শামসুল হুদা, তুমি জীবনবাবুকে মুক্তাগাছা নিয়ে যাচ্ছ। বাংলা একাডেমীতে ওর যে বইগুলো আছে, ওকে সেগুলো একটু দেখিয়ে নিয়ে যাও।' তখন সে বলল, 'আচ্ছা, আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।' তারপর সে আবার আমাকে ফোন করল, 'আমি ডিজিকে বলে দিয়েছি, সব ব্যবস্থা হবে।' তারপর তিনি মুক্তাগাছা থেকে যেদিন এলেন, সেদিন বিকেলবেলাতেই বাংলা একাডেমীতে গেলেন। তাঁর লেখা *অ্যামি* বইটি তিনি ওখানে গিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। তাতে আপনি মুক্তাগাছার রাজপরিবারের সব কথা পাবেন। আর ওই যে মহারাজা

শশীকান্তের কথা বললেন, সেই শশীকান্তকে আমি দেখেছি। দেখেছি শশীলজে। কুকুর-পরিবৃত হয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। এবং আমাদের দেখতে পেয়েই বলে উঠেছেন, 'চলো হাঁটি।' তা আমি যেই বলেছি, 'বাপরে বাপ, ওই কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে হাঁটব!' জবাবে তিনি বলেছেন, 'না, না, এসো।' তারপর হাঁটছেন, গল্প করছি। কলকাতার বাড়িতেও একই অবস্থা দেখেছি। আপনি এখন বলবেন যে আমি বুঝি জমিদারের প্রশংসা করছি। এ রকম কথা বললে আমি রীতিমতো মুশকিলে পড়ে যাব তাহলে। মনেই হতো না যে কোনোরকম জোতদার তিনি। সত্যি কথা বলতে কি, এতে কোনো অত্যুক্তি নেই। যাঁরা তাঁদের দেখেছেন, তাঁরা যদি বেঁচে থাকেন, তাঁরা আমার বক্তব্য সমর্থন করবেন। জীবন বাবু এখনো সেই বংশের ধারা বহন করে চলেছেন। সেবার জীবন বাবু গিয়েছিলেন বাংলা একাডেমীতে। আপনারা তো কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। যা-ই হোক, দেখা করলে আপনারা দেখতেন যে জীবন বাবু যে জমিদার, অর্থাৎ তাঁর জমিদারির আয় ১০ লাখ টাকা, সেটা তাঁর আচার-ব্যবহার, চালচলন থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। যাঁর বাড়িতে এক শটা হাতি ছিল, তার প্রতাপ তাঁর চেহারা কিংবা আচার-ব্যবহারে নেই। এখন জমিদারি চলে যাওয়াতেই যে এমন নম্র-ভদ্র হয়েছেন, তেমনটা ভাবারও অবকাশ নেই। আমি ঘনিষ্ঠভাবে মহারাজ শশীকান্তকে দেখেছি। দেখেছি, মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীকে। কেননা, আমার বাবা ছিলেন কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট। আর তিনিও তখন কাউন্সিলে। আগে তিনি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কনস্টিটিউশনালিজম সম্পর্কে ভালো জানতেন বলে একটা খ্যাতি হয়েছিল তখনকার ভারতবর্ষজুড়ে। স্পিকারের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগম্যি ছিল গভীর। আর আমার বাবাও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি খুবই ভালোবাসতেন এবং স্পিকারের যা ঐতিহ্য বা কর্তব্যকর্ম, সেটা তিনি এস্টাবলিশ করার জন্য খুবই চেষ্টা করেছেন। আমি ওঁর সম্পর্কে একটি মাত্র ঘটনার কথা বলছি। পাকিস্তান আমলে, একদিন তিনি হাউস অ্যাডজর্ন করে দিয়েছিলেন পরের দিন হাউসে কাজ ছিল না বলে। কে গভর্নরকে বুদ্ধি দিয়েছেন, 'দেখ, কাজ নেই আর গিয়ে কী হবে, এখন একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি গেজেট করে হাউস ফোল্ডআপ করে দাও।' সেই মতো রাতারাতি এক্সট্রা অর্ডিনারি গেজেট করে হাউস মুলতবি করে দিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালের কনস্টিটিউশনে ছিল যে গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট হাউস মুলতবি করলেও টু-থার্ড মেম্বার যদি হাউস সমর্থন করেন, তাহলে স্পিকার ইচ্ছে করলে হাউস চালিয়ে যেতে পারেন। মেম্বাররা যদি এটাকে হাউসের প্রতি, মানে সংসদের প্রতি গভর্নরের অন্যায় ব্যবহার হিসেবে নেন, তাহলে তাঁরা সংসদ রিকুইজিশন করতে পারবেন। করলেনও। রিকুইজিশন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা গভর্নরকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না, তিনি হাউস কল করে দিলেন। তারপর হাউস বসল। এই উপমহাদেশে হাউস স্পিকার শাসন করেছেন, এ রকম ঘটনা এ ছাড়া আর ঘটেনি। তো, এ কারণেই মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর সঙ্গে আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কেননা, তাঁরা পার্লামেন্টারি ট্র্যাডিশনস নিয়ে অনেক আলোচনা করতেন। মহারাজা শশীকান্ত ছিলেন একেবারে বাঙালি আর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী পাশ্চাত্য-ঘেঁষা কালচার্ড ম্যান বলতে যা বোঝায়, তা-ই ছিলেন।

গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী আর তাঁর ছেলে বীরেন্দ্রকিশোর পর্যন্ত সংগীতের খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁকে আমি নিজে দেখেছি, বাড়িতে গিয়ে তিনি বসে বসে বেহালা কিংবা সেতার বাজাচ্ছেন। তিনি যন্ত্রসংগীতে খুবই পারদর্শী ছিলেন। সারাক্ষণ সংগীত নিয়েই পড়ে থাকতেন। আবার উচ্চপরিষদের সদস্যও ছিলেন। ছিলেন আমার বাবার সহকর্মী। তো, সে হিসেবে বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

প্রশ্ন : এখানে একটা ভিন্ন প্রশ্ন করছি। ওস্তাদ এনায়েত খানকে গৌরীপুরে দেখেছেন?

আবু সাঈদ চৌধুরী : না, গৌরীপুরে ওস্তাদ এনায়েত খানকে আমি দেখিনি। আমি তাঁদের বাড়িতে, অর্থাৎ কলকাতার গৌরীপুর হাউসে, যেটা ওই বালিগঞ্জে, সেখানেও গেছি। গৌরীপুরেও গেছি তাঁদের বাড়িতে। কিন্তু তখন ওস্তাদ এনায়েত খাঁ সেখানে ছিলেন না।

প্রশ্ন : সাম্প্রদায়িকতার কোনো ব্যাপার ছিল কি?

আবু সাঈদ চৌধুরী : না, সাম্প্রদায়িকতার একেবারেই অস্তিত্ব ছিল না। আমার জানামতে, কোনো ছাত্রের মধ্যেও না। আরেকটি কথা, আপনাদের আমি সেদিন বলেছি, সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না, এটা আমার অভিজ্ঞতা এবং দু-একজনের কাছে এই কথা বলতেই তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে, এ-ও কি সম্ভব! বিশ্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ কি একটি দ্বীপের মতো কিছু ছিল? দেশে তো সাম্প্রদায়িকতা ছিল এবং আমিও কথাটা ঠিক বললাম কি না, সে জন্য ঢাকা শহরে আমার যে কয়েকজন মুসলমান সহপাঠী আছে, আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, অকপটে তোমরা বলো যে কোনো শিক্ষকের ব্যবহারে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল কি না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রায় সবাই হিন্দু শিক্ষক ছিলেন। কুদরাত-এ-খুদা ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। কেন, তসলিম উদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞেস করুন না। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রসচিব হয়েছিলেন। তিনি আমার সহপাঠী, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। কমান্ডার এরফান আহমদ, সত্যজিৎ রায়—তাঁরা এত গভীর উদার মনের মানুষ ছিলেন যে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। কমান্ডার আহমদ তো আমার সহপাঠী ছিলেন। উনি বেঁচে নেই, তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি তো কোনো দিন কোনো সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেননি। তারপর এখানে শাহ মোহাম্মদ ইসরাইল হক আছেন, সৈয়দ আহমদ আমার সহপাঠী। সৈয়দ আহমদকে চিনতে পেরেছেন? ইনফরমেশন সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। তাহলে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কীভাবে এল? ওই যে সেদিন বললাম, মুসলমানদের রাজত্ব চলে গেল। তারা ইংরেজদের পুরোপুরি বয়কট করল। হিন্দুরা করল না। এটা কিন্তু ঠিক, যারা চাকরি-টাকরির জন্য দরখাস্ত দিয়েছে, তারা বলেছে, 'আমার চাকরিটা হলো না।' কারণ, অবিভক্ত বাংলায় তখনকার দিনে সব অফিসেই চাকরি দেওয়ার মতো পদে সাধারণত হিন্দুরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুত, সেসব জায়গাতেই গোলমাল হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজ, জিলা স্কুল, বিন্দুবাসিনী স্কুলের পরিবেশ ছিল অন্য রকম।

তারপর আপনারা আমার পরিবার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। সে কথা বলতে গেলে আমাকে একটি কথা বলতে হবে যে আমি আমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাঁরা তাঁদের মনের মতো করে আমাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি কী

হয়েছি, সেটা একদম অবান্তর কথা। যেটা বাস্তব, সেটা হলো তাঁদের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল না। বিশেষ করে, আমার মাকে আমি দেখেছি কোন রূপে, সেটাই বোধ হয় বলা দরকার। আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির বর্ণনামতো আমার মাকে আমার জন্মের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্মী আর কল্যাণী—এই রূপে দেখেছি এবং এ কথা আমি তাঁকে বিলেত থেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ তো কল্পনায় দেখেছিলেন মায়ের এই রূপ; তো, আমি তোমাতে সেটা দেখছি। উনি আমার মনটিকে গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। উনি হিন্দু-মুসলমান—এ প্রশ্ন তো দূরের কথা, কোনো মানুষের মনে ব্যথা দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে আমাকে বারবার বলেছেন, মসজিদ ভেঙে দেওয়া আর মানুষের মনে ব্যথা দেওয়া একরকমের অপরাধ। আরেকটি কথা বলেছেন, জীবনে কখনো সত্য থেকে বিচ্যুত হতে নেই। তাঁর নিজের জীবনেও আমি সেটা দেখেছি। তিনি এলাচিপুরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত এ কারণে যে ওই গ্রামের প্রতিটি বাড়ির প্রত্যেকেই শিক্ষিত ছিলেন এবং সেই নবাব-বাদশাদের আমল থেকেই তাঁদের অনেকে চাকরি-বাকরিও করতেন। তাঁদের মধ্যে ছিল আরবি-ফারসির চর্চা। তা ছাড়া আমার মা বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল-টভেল পড়তেন। আমাকে তিনি গল্পচ্ছলে একবার বলছিলেন যে তাঁর মুরব্বিরা তাঁকে ওই সব বাংলা নভেল-টভেল পড়তে দেখলে অসন্তুষ্ট হতেন। তাই তিনি সেগুলো লুকিয়ে লুকিয়েই পড়তেন। তো, তাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যে আমার শৈশবকালে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বাংলা নভেল ইত্যাদি পড়া সহজ ছিল না।

আরেকটি কারণে আমার মনে কখনো হিন্দু-মুসলিম—এ প্রশ্নটা ওঠেনি। কেননা, আমাদের বাড়িতে সে সময় অন্তত কুড়ি-পঁচিশজন হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। কর্মচারীদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। আর ম্যানেজার তো হিন্দু ছিলেনই। কারণ, আমার পিতামহ একাদউদ্দিন সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে এঁদের সবাই জমিটমির কাজ ভালো বোঝেন। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি ধার্মিক লোক ছিলেন। প্রতিদিন শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জতের নামাজ পড়তেন; কিন্তু তাঁর ম্যানেজার ছিলেন হিন্দু। এবং এ রকমের পরিবেশেই আমার শৈশব কেটেছে। তা ছাড়া সবাইকে সমান চোখে দেখার ব্যাপারটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

অনুলিখন : **রীতা ভৌমিক**

অনুস্মৃতি

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা
চল্লিশ বছর ধরে : স্মৃতি ও ন্যায়বিচার

ইয়ান মার্টিন

[বাংলাদেশের সঙ্গে ইয়ান মার্টিনের সম্পর্ক বেশ পুরোনো। ১৯৭০ সালের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি বাংলাদেশে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) এসেছিলেন। আর ১৯৭১ সালে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হচ্ছে, তিনি তখন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের হয়ে কাজ করছেন ঢাকায়। ২৫ মার্চের কালরাত্রে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের গুলশান অফিসের ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছেন পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ, কারফিউ তুলে নেওয়ার পর ঢাকার নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সেই বিভীষিকা। কিছুদিনের মধ্যেই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ঢাকা ছাড়তে হয়। এরপর গণহত্যার তদন্ত করতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই আবার ফিরতে চেয়েছিলেন এ দেশে, কিন্তু অনুমতি পাননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরের মাসেই, ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে, আবার ঢাকায় আসেন তিনি।

পেশাগত জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় ছিলেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব। জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ দূত হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০১১ সালের ২২ মার্চ তিনি ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন। এখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়েও কথাবার্তা বলেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তি ও যুদ্ধাপরাধ নিয়ে দেওয়া তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে তাঁর ভাষণের অনুলিখন ছাপা হলো এখানে।]

এখানে আসার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিশেষত, কৃতজ্ঞ এ কারণে যে, এখানকার সবচেয়ে মহতীপূর্ণ ঘটনাবলির সাক্ষী হওয়ার ঠিক ৪০ বছর পর এ উপলক্ষ আমাকে আবার ঢাকায় নিয়ে এসেছে। একাত্তরের ২৩ মার্চ

প্রতিরোধ দিবসে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনের সামনে সমবেত মানুষের অভিবাদনের জবাব দিচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর বাসার আঙিনায়। সেদিন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা পাকিস্তান দিবসের নাম পাল্টে রেখেছিলেন প্রতিরোধ দিবস। সেই ২৫ মার্চে আমি সর্বশেষ যে মানুষটার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তিনি অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। তাঁর প্রতি আমার মুগ্ধতা তৈরি হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎ ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোয়ার্টারে। সেই সন্ধ্যায় গাড়ি চালিয়ে আমাদের থাকার জায়গা সেদিনের ছোট্ট শহর গুলশানে ফিরে আসতে আমার ও আমার সহকর্মীদের শেষ চেষ্টা বাধার মুখে পড়েছিল স্থানীয় মানুষের সড়ক অবরোধ করার কারণে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছেড়েছেন, আলোচনা ভেস্তে গেছে—এই খবরের প্রতিক্রিয়ায় এই অবরোধ। গাড়ি চালিয়ে গুলশানের দিকে যাওয়ার সময় আমরা দেখলাম, সেনানিবাস থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্যাংক বেরিয়ে আসছে। সেই রাতে আমরা গেস্ট হাউসের ছাদে উঠে অসহায় আতঙ্কে শুনছিলাম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি আর বিস্ফোরণের আওয়াজ। আক্রমণের সাক্ষ্য বহন করছিল আকাশ। আমরা বুঝতে পারছিলাম, এই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বিশ্ববিদ্যালয় আর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ লাইনস। আমাদের কাছাকাছি এলাকায় এক নির্বাচিত আওয়ামী লীগারকে গ্রেপ্তার করতে পাঠানো সেনারা যখন তাঁর ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পেল না, তখন বাসার এক কর্মচারীকে বিনা কারণে হত্যা করল। কাছেই এক জ্যেষ্ঠ সহকর্মী পালিয়ে যেতে সহায়তা করেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ বুদ্ধিজীবীকে। সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়ার পরপরই আমরা আবার গাড়ি নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরতে বের হই। সেটাই আমাদের শেষ ঘুরতে বের হওয়া। সেদিন ছিল ২৫ মার্চ। আগে বহুবার রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়েছি মাঝখানের কালীমন্দিরের দিকে। এবার দেখলাম, সেটা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা জানলাম, কী ধরনের হামলা চালানো হয়েছে: হামলার লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের কেন্দ্র ইকবাল হল শুধু নয়, বরং সুচিন্তিতভাবে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে হিন্দু শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের ওপরও। শহরের অন্যান্য জায়গায়ও একইভাবে হিন্দুদের ওপর হামলা চলেছে। দীর্ঘ নয় মাস পর ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আমি জানতে পারলাম, ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকার কাছে চলে আসার সময় যেসব বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়, তাঁদের মধ্যে মুনীর চৌধুরীও ছিলেন।

বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বহুবিস্তৃত কিংবা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হামলার অংশ হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সংজ্ঞায়নের এক উপাদান। এটা গণহত্যার সংজ্ঞায়নেরও এক উপাদান। কেননা, তাতে একটা জনগোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ ও ধর্মগোষ্ঠীকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য ছিল। আমি বিশ্বাস করি, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের অভিযান শুরুর একেবারে শুরু থেকেই এসব উপাদান বিরাজমান ছিল। প্রথম যাঁরা 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকায় মার্কিন কনসুলেটের কর্মকর্তারা: একাত্তরের ৬ আগস্ট ভিন্ন মত জানিয়ে প্রশংসনীয় এক পত্রে কনসাল আর্চার ব্লাড এটা লেখেন। পরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞরা সেই পথ অনুসরণ করেন। আমি তাঁদেরই দলে, যাঁরা বিশ্বাস করেন 'গণহত্যা' শব্দটিকে কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত টেনে নেওয়া ঠিক নয়। আর জেনোসাইড কনভেনশন থেকে সুস্পষ্টভাবে সেটাই বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যদিও এসব আদালতের ব্যাপার, তবু আমি মনে করি, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস ১৯৭২ সালের প্রতিবেদনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসররা শুধু যে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তা-ই নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে গণহত্যার ঘটনা ঘটানোরও জোরালো নজির আছে বলে যে উপসংহার টেনেছিল, তা যথাযথ।

একাত্তরের মার্চে ঢাকায় থাকার দিনগুলো নিয়ে আমার নোট পাকিস্তানি নিরাপত্তাকর্মীরা নিয়ে যায় ইসলামাবাদের ফিরতি বিমানে চড়ার আগমুহূর্তে। পরের কয়েক মাসে মাত্র একবারই আমি ঢাকায় যেতে পেরেছিলাম। আরেকবার গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন এবং মুজিবনগরে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তবু ছোট্ট একটা ভূমিকা পালন করি। মার্কিন ও ব্রিটিশ দূতাবাসের অভ্যন্তরে যখন তাদের সরকারি নীতির প্রশ্নে তীব্র বিতর্ক দেখা দিতে লাগল, তখন বিদেশি ও বাঙালি সূত্র থেকে আসা তথ্য কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে চালান করি। সেই গ্রীষ্মে লন্ডনে ব্রিটিশ সাংসদদের কাছে ধরনা দিই এবং *নিউ স্টেটসম্যান* ম্যাগাজিনে একটা নিবন্ধ প্রকাশ করি, লেখক পরিচয় আড়াল করে 'একজন পাকিস্তান প্রতিনিধি' হিসেবে। আমার নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান ফোর্ড ফাউন্ডেশন দ্রুতই উপসংহার টানে যে, পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে নিজস্ব কৃষি গবেষণা প্রকল্পগুলো অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যেসব বাঙালি পণ্ডিত শরণার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের মার্কিন ও ব্রিটিশ শিক্ষায়তনিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা ও সমর্থন পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। তখন আমি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তদন্ত কমিশনের সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করি। এই তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস (আইসিজে)। পাকিস্তান সরকার কমিশনকে ঢুকতে দেয়নি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, ভারতে গিয়ে শরণার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের ঘোষণা আসার সময়টাতে আমি ছিলাম নিউইয়র্কে; তদন্ত কমিশনের জন্য তহবিল উত্তোলনে সহায়তা করছিলাম। আর জুলফিকার আলী ভুট্টোর নাটকীয় বক্তৃতা চাক্ষুষ করতে আমি হাজির ছিলাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গণগ্যালারিতে। ভাবিনি, কয়েক দশক পর এই একই কক্ষে আমি নিরাপত্তা পরিষদের সামনে পূর্ব তিমুর ও নেপালের ঘটনাবলির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরব। আইসিজের তদন্ত যে গতিতে চলছিল, ঘটনা ঘটছিল তার চেয়ে দ্রুতগতিতে। আইনি বিশেষণের দায়িত্ব আমি অন্যদের ওপর ন্যস্ত করলাম। তাদের সেই বিশেষণ পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়। সেটার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আমাকে ঢাকা সফর করতে বলেছিল প্রতিষ্ঠানটির এই দেশের কর্মীদের ও প্রকল্পগুলোর ভাগ্যে কী ঘটল, তা দেখার জন্য। আমার আগ্রহ সেটাই ছিল সবচেয়ে বেশি—বাঙালি বন্ধুদের কী অবস্থা তা জানার জন্য। দুই মাস পর একজন জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর সফরসঙ্গী হয়ে এসেছিলাম; ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তা পুনরায় চালু

করাকে স্বাগত করার ব্যাপারে। সেবার আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর ১৯৭২ সালের বেশির ভাগ সময় আমার কাটে স্বাধীন বাংলাদেশে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অফিসগুলো চালু করে নতুন কাজ শুরুর জন্য প্রস্তুত করে তোলায়। সরকারের মনোযোগ তখন মানবিক ও পুনর্গঠনের বিপুল কাজের পরিধি ছাপিয়ে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের দিকে।

আমার কর্তব্য ছিল অতি সামান্য। শিরোনামে যে 'স্মৃতি' শব্দ ব্যবহার করলাম, আমার নিজের প্রসঙ্গে বলার উদ্দেশ্যে নয়। এটা আমাদের সবার জন্যও ভালো। কেননা, ১৯৭১ সালে সাহসী সাংবাদিকেরা বিশ্বের কাছে যেসব সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন আর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাঁদের পরিবারের কাজ থেকে যে রেকর্ড পাওয়া গেছে, যার অনেকটাই এখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে, সে তুলনায় আমার সেই সময়কার স্মৃতির তাৎপর্য নেই বললেই চলে অথবা থাকলেও অতি সামান্য। কিন্তু আজ এখানে সমবেতদের কয়েক দশকের হতাশায় আমিও কেন অংশীদার, তা স্পষ্ট করবে আমার সেই স্মৃতি। হতাশা এ জন্য যে, বাংলাদেশের বাইরের দুনিয়া একাত্তরে সংঘটিত অপরাধ বিচারের বিষয়টি এতই কম আমলে নিয়েছে অথবা সক্রিয় বিরোধিতা করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকার যখন আন্তর্জাতিক চাপে পড়ল, তখন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হলো। আর বিচারব্যবস্থার তখন যে হাল, তাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাজার হাজার অভিযুক্ত সহযোগীর বিচার করার জো ছিল না। অভিযুক্ত সহযোগীদের বিনা বিচারে অব্যাহতভাবে আটকে রাখায় সমালোচনার মুখে পড়ল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছ থেকে (পরে আমি এই সংস্থায় যোগ দিয়েছিলাম)। আর শিগগির মানবাধিকার লঙ্ঘনের নতুন ঘটনা মোকাবিলার প্রশ্ন সামনে এল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় সরকারের সমালোচক বিপুলসংখ্যক বামপন্থীকে বিনা বিচারে আটক করে রাখার বিষয়ে। আজও সেই বিশেষ ক্ষমতা আইন বলবৎ আছে। তারপর জরুরি অবস্থাকালেও একই দশা। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর মেজর জেনারেল ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অধীনে সামরিক আইন আদালত মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন এবং অনেককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেনও। গোপন বিচার শেষে কর্নেল আবু তাহের এবং আরও শত শত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাব অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১৫ হাজার। এসব ফাঁসিকে যদি আইনসংগত হত্যাকাণ্ড বলি, তাহলে আইনের শাসনকে ছোট করা হয়। আজ হাইকোর্ট কর্নেল তাহেরের বিচার ও ফাঁসিকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। এতে আমি আনন্দিত। এ ধরনের আরও অনেক ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর। আর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদের অধীনে সামরিক আইনের আরও সময় গেল। আবারও দেখা গেল সামরিক আদালত ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ব্যবহার করে গ্রেপ্তার করা বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীকে বিনা বিচারে আটকে রাখা। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড মানবাধিকার প্রশ্নে আরও উদ্বেগের জন্ম দিল।

সামরিক আইনের সময় লেবার পার্টির কর্মী হিসেবে আমি তখন অধিকার লঙ্ঘনের এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, অধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরতদের সঙ্গে সংহতির একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিলাম। এই বিষয়টি তুলে ধরায় আমার সামর্থ্য আরও স্পষ্ট হয় ১৯৮৫ সালে আমি যখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হয়ে কাজ করতে যাই। কিছুদিন পর বাংলাদেশ সফর করা তখন আমার দাপ্তরিক দায়িত্বের অংশ। সে বছরের শেষ দিকে আমি আর আমাদের বাংলাদেশবিষয়ক গবেষণার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকর্মী সামরিক সরকারের অধীনে সেনা হেফাজতে রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নির্যাতনের বেদনাদায়ক সাক্ষ্য গ্রহণ করি। সেই দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন মারাত্মক নির্যাতনের শিকার ছাত্রদের আমরা যে বাড়িতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছিলাম, সেখানে ডিজিএফআইয়ের (ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) কর্মকর্তারা ঢুকে পড়েছিল। নিশ্চিত করে বলতে পারব না, এতে কারা বেশি চমকে উঠেছিল—তাঁরা, না আমরা। তবে তাঁরা যে বিব্রত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৮৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম মানবাধিকার মিশন নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম আমার নেতৃত্বে। এ ছাড়া তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর সরকারের ব্যাপারে অ্যামনেস্টির অন্যান্য উদ্বেগের কথাও তুলে ধরেছিলাম।

অন্যান্য জায়গায় বহু ক্ষেত্রে মানবাধিকারগোষ্ঠী বর্তমানের অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ যেমন করেছে, একই সঙ্গে তেমনি অতীত অপরাধের জন্য ন্যায়বিচারও দাবি করেছে। আসলে আমাদের মূল বিশ্বাস হলো অব্যাহত দায়মুক্তির, মানে আজকের আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তি দুর্বল করা। তাই আমি ধাঁধায় পড়ে যাই, কেন মানবাধিকারগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বিষয়ে সম্পৃক্ততা এত কম। হয়তো এর আংশিক জবাব, আজ যেসব মানবাধিকার সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করছে, সেগুলোর অল্প কয়েকটি মাত্র ১৯৭১ সালে কর্মকাণ্ড চালাত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও তখন খুব ছোট সংস্থা। সে বছরই কেবল তারা প্রথম দক্ষিণ এশিয়া গবেষক নিয়োগ দেয়। সংস্থাটির ম্যান্ডেট মূলত ছিল কারাবন্দীদের ঘিরে। আশির দশকের শুরুতেই কেবল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও জাতিসংস্থার মানবাধিকার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক আইনবহির্ভূত হত্যা কিংবা রাজনৈতিক হত্যার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে। এভাবে বেসরকারি মানবাধিকার ও রূপান্তরকালীন ন্যায়বিচার সংস্থাগুলোর জগত অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাত্তরে সংঘটিত অপরাধের প্রতিবাদ ও গবেষণার স্মৃতি নিজেদের মধ্যে সঞ্চিত রাখেনি; সাম্প্রতিক কালে তাদের তদারকের ক্ষেত্রগুলোতে তারা যেমনটা করে। কিন্তু আমি বিহ্বল হই, মানবাধিকারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারসম্পন্ন সবচেয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিটিকে বিংশ শতকের গণহত্যা ও গণবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের নাম করতে বলা হলে তারা পূর্ব বাংলা ১৯৭১ উল্লেখ করার কথা ভাবে না। গণহত্যা বিষয়ে ব্যাপক পঠিত সাম্প্রতিক বই সামান্থা পাওয়ারের *এ প্রবলেম ফ্রম হেল*-এ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আছে মাত্র এক অনুচ্ছেদে, যদিও এমন নৃশংসতা ঠেকাতে মার্কিন সরকারের একের পর এক ব্যর্থতার মূলভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে এর পূর্ণ বিশেষণের যথেষ্ট দাবি রাখে।

তাই সব কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য, যাঁরা একাত্তরের স্মৃতি সজীব রাখতে শ্রম দিয়েছেন। আজকের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা এবং যাঁরা তাঁদের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ২০০৮ সালের শেষে নির্বাচনের সময় ঢাকায় অবস্থানকালে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম একাত্তরের স্মৃতি কতটা এবং ন্যায়বিচারের দাবি কতটা জোরালোভাবে নির্বাচনে ইস্যু হয়ে উঠেছিল, তা অবলোকন করে। অনেক অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; কারণ একাত্তরের ব্যক্তিগত স্মৃতি যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে যেমন, তেমনি তরুণ প্রজন্মের কাছেও অনুরণন তৈরি করতে পেরেছিল। এমনকি নির্বাচনের এই লক্ষণীয় দিক এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারে নির্বাচিত সরকারের অঙ্গীকারও বাংলাদেশের বাইরের দুনিয়াকে একাত্তরে কী ঘটেছিল, সেটা বিশেষ স্মরণ করাতে পারেনি। শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো লেখা প্রথম ছাপা হলো *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ, কেবল এই মাসের শুরুতে। তবে এটাতে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু বানানো কিংবা বুদ্ধিজীবীদের হত্যার উল্লেখ ছিল না।

সুতরাং আজ আমি প্রথম যে বার্তাটি দিতে চাই, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। আমরা ক্রমবর্ধিতভাবে দাবি করি যে, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ন্যায়বিচার হওয়া উচিত। সাবেক যুগোস্লাভিয়া, রুয়ান্ডা, পূর্ব তিমুর, সিয়েরা লিওন, কেম্বোডিয়ায় গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধের তদন্ত ও বিচার এবং এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারা তদন্ত ও বিচার সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রধান সম্পদ নিয়োজিত করা হয়েছে। আইসিসির অনুপূরকতার নীতিতে প্রতিফলিত অনুমোদিত লক্ষ্য হলো, বিচার সম্পাদন করা হবে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াবলির ভেতরে; কোনো রাষ্ট্র যেখানে এ ধরনের অপরাধ তদন্ত ও বিচার নিজে সম্পাদন করতে না চায়, কেবল সেখানে আন্তর্জাতিক বিচারের দিকে ধাবিত হবে। চর্চার জায়গায় আগামী বছরগুলোতে মাত্র অল্প কয়েকটা মামলার আইসিসিতে বিচার হবে। এবং আর কোনো এডহক-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল হবে না। বিচার নির্ভর করবে রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়াবলির ওপর। প্রায়ই দেখা যায়, জাতীয় সংকল্পের অস্তিত্ব নেই : নেপালে আমি কাজ করছিলাম জাতিসংঘের পক্ষ থেকে। সেখানে মাওবাদীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ১০ বছরব্যাপী সশস্ত্র সংঘাত শেষ হওয়ার পর কোনো পক্ষের একজনকেও বড় কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে বিচার করা হয়নি। আজকের বাংলাদেশে দৃঢ় জনসমর্থন নিয়ে শুরু করা হয়েছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া। একাত্তরে সংঘটিত অপরাধের যে ব্যাপকতা, তাতে এর গুরুত্ব ঐতিহাসিক; কেবল জাতীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রেও অগ্রণী হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। এ দেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ প্রণীত হয়েছিল। প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করে সেটা করা হয়েছিল।

আইনশাস্ত্র বিশারদ সুজান্নাহ লিনটন লিখেছেন, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ যে এমন আইন বেছে নিয়েছিল, সেটি আসলেই 'চমকপ্রদ ও প্রশংসনীয়'। সেই সময়ের সাপেক্ষে এটি ছিল প্রগতিশীল আইন। আন্তর্জাতিক বিচারে যৌন সহিংসতার অপরাধগুলো যতটা গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে, সেটা পেতে অনেক সময় লেগেছে; অথচ ১৯৭৩ সালের আইনের খসড়া প্রণেতারা সঠিকভাবেই ধর্ষণকে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিচারের তালিকাভুক্ত করেছিলেন। একাত্তরে নানা অপরাধের মধ্যে ধর্ষণের যে ব্যাপকতা ছিল, সেই দিক দেখলে একাজটি আসলেই অপরিহার্য ছিল। বাংলাদেশের আইনজীবীরা ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন সম্মেলনের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত গঠনের আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবদান রেখেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে রোম সংবিধির অংশীদার হয়েছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে গত ৩৭ বছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারব্যবস্থায় যে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে, তার সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক হওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমার দ্বিতীয় বার্তা বাংলাদেশের জন্য : যুদ্ধাপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে আইনি কাঠামোয় এবং আটক রাখা, তদন্ত ও বিচারকাজের অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে যথাযথ প্রক্রিয়া ও মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতিফলন যেন ঘটে। আমি আইনজীবী নই, তবে জানি, এবারের আইনের সংশোধনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা স্তরের উন্নতি করা হয়েছে। তার পরও রূপান্তরকালীন বিচার ও মানবাধিকার সংস্থার, যাঁরা একাত্তরে সংঘটিত গণ-অপরাধসমূহের ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে পুরোপুরি সঙ্গে আছেন—আইনজীবীদের অনেকগুলো গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। বিদ্যমান আইন এখন পর্যন্ত মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চিত নিরাপত্তা পুরোপুরিভাবে দিতে পারেনি, যা কিনা আন্তর্জাতিক আইনে ন্যায্য বিচারের জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড। এসব উদ্বেগ অপরাধ ও গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত এবং বিচারসংশ্লিষ্ট আইনি কার্যক্রমের যেকোনো দিকের বিচারিক পর্যালোচনা চাওয়ার অধিকারসম্পর্কিত। এসবের ভেতরে পড়ে, খেয়ালমাফিক আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা; ন্যায্য বিচারের নিশ্চয়তা, যেমন বিচার-পূর্ববর্তী ও বিচারকালীন পুরোটাব্যাপী কার্যকর আইনি পরামর্শ পাওয়ার অধিকার; সাক্ষ্যের প্রক্রিয়া ও মানের প্রশ্ন এবং যথাযথ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত সময়, সম্পদ ও কার্যপ্রণালিগত সুরক্ষা প্রদান। যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে মার্কিন দূত স্টিফেন র‍্যাপ, যিনি আইনজীবী এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারকাজে সম্পৃক্ত থাকার বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকারী, সম্প্রতি বাতলান যে, এসবের মধ্যে বেশ কয়েকটি ইস্যু মিটিয়ে ফেলা যাবে ট্রাইব্যুনালের কার্যপ্রণালিবিধির অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে। আমিও বুঝতে পারি, সাক্ষীর সুরক্ষা ও আদালতের কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্তদের, বিশেষত যৌন সহিংসতার শিকারদের, প্রতিনিধিত্ব কেমন করে জোরদার করা যায়, সেই বিবেচনা কাজ করেছে। অভিযোক্তা ও তদন্তকারীদের মধ্যে নারীরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে, এটা একটা সুসংবাদ।

যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও এর উন্নতিকল্পে সিভিল সমাজের প্রচেষ্টায় এই জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এ কথা আমি জানি। আমি খুব আশা করি, বিচার-প্রক্রিয়ার আরও উন্নতি ঘটানো হবে। যাঁরা ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা থেকে এই বিচারের সাফল্য কামনা করেন, তাঁরাই যদি বাধ্য হন এই বিচারের সমালোচক

হয়ে উঠতে এবং অব্যাহত জাতীয় বিতর্ক আরও উসকে দেয়, তাহলে তা আজ এখানে উপস্থিত সবার জন্য এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য হবে মর্মান্তিক। আর আমরা যারা মানবাধিকার গোষ্ঠীভুক্ত, তাদের অনেকের জন্য আরেকটি বাধা আছে, সেটা মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রশ্ন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব হিসেবে আমি শর্তহীনভাবে সব দেশে, ইরান থেকে যুক্তরাষ্ট্র অবধি, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছি, তা যে অপরাধের শাস্তিই হোক না কেন। আমি স্বীকার করি, নিকৃষ্টতম সাধারণ অপরাধের শাস্তি হিসেবে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড অব্যাহত আছে; বহু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও অন্যরা একাত্তরের জঘন্যতম অপরাধগুলোর জন্যও এই শাস্তির বিধান থাকা প্রয়োজন বোধ করবেন। তবে বিলক্ষণ, বাংলাদেশ অত্যন্ত বেশি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে এবং আমার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে উঠে আসা দেশটির দুঃখজনক মানবাধিকার ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়, অনেকগুলো মৃত্যুদণ্ড আসলে ছিল শুধুই রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকারীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। এমনকি যারা নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী নয়, তাদের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পর বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া কি সেই হত্যাকাণ্ডের বিশেষ গুরুত্বের ওপরই জোরারোপ করত না? আর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নতুন দিগন্ত খুলে দিত না?

যুদ্ধাপরাধ বিচারের বাতাবরণ নিয়ে একটা কথা আমি যোগ করতে চাই। অভিযোগ উঠবে, এটা একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া—এমন অভিযোগ উঠেছেও। এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে খণ্ডণ করা কেবল যুদ্ধাপরাধ বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে চলার ওপরই নির্ভর করবে না, বরং বাংলাদেশে বিদ্যমান সাধারণ পরিবেশ কতটা অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক পার্থক্যের প্রতি সহিষ্ণু, বহুত্ববাদিতার নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, বহুদলীয় গণতন্ত্র ও স্বাধীন সিভিল সমাজের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধাবান হিসেবে দেখা হচ্ছে, তার ওপরও। আর অতীত অপরাধের অব্যাহত দায়মুক্তি যেমন বর্তমানের আইনের শাসনের ভিত্তি দুর্বল করে, তেমনি আজকের মানবাধিকারের লঙ্ঘন অতীত অপরাধের বিচার-প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতাও দুর্বল করবে। আমি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ছাড়ার প্রায় দুই দশক পরও পড়তে হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নির্যাতন ও হত্যা অব্যাহত থাকার খবর, অথচ যা যথাযথ স্বাধীন তদন্ত এবং অধিকার হরণের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ দাবি করে। এই পরিস্থিতি আমাকে বিষাদগ্রস্ত করে। আর বাংলাদেশের জনগণকে অনেকগুলো সরকারের অধীনে বাস করতে হয়েছে, যাদের সমর্থকেরা আইনের ঊর্ধ্বে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে। আইনের শাসনের প্রতি কোনো সরকারের দায়বদ্ধতার পরীক্ষাক্ষেত্র হলো সমর্থক ও প্রতিপক্ষ-নির্বিশেষে সবার প্রতি যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বর্তমানের যুদ্ধাপরাধের বিচার একাত্তরের অপরাধের দায়মুক্তির অবসান ঘটাতে সত্যিই অসমর্থ। আর এর কারণ, যাদের সবচেয়ে বড় দায়, তারা নাগালের বাইরে। ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরের জাতিসংঘ কার্যালয় প্রাঙ্গণে ঘেরাও হয়ে ছিলাম। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী ও পূর্ব তিমুরীয় মিলিশিয়ারা আমাদের চারপাশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করেছে। সুতরাং, আমি এক অসুখকর সমান্তরাল

পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি। সেটা হলো: বহু আগে তিমুরবাসীকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল, স্বল্প সময়ের জন্য কারাবন্দী করা হয়েছিল, যাদের অপরাধ ছিল সামান্য; অথচ যেসব ইন্দোনেশীয় কর্মকর্তা সেসব অপরাধের নির্দেশনা দিয়েছিল কিংবা অপরাধ রোধ করতে চেষ্টা করেনি, তাদের ধরা হয়নি। অবশেষে তারা ইন্দোনেশিয়ায় মানবাধিকার আদালত থেকে খালাস পেয়ে যায়। সেই বিচার জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কমিশনের বর্ণনামতে 'স্পষ্টতই অপ্রতুল'। পাকিস্তানে তো সেটাও করা হয়নি। হামুদুর রহমান কমিশন অপরাধসমূহকে ছোট করে দেখিয়েছে; পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা হত্যার শিকার মানুষের সংখ্যা কমিয়ে উপস্থাপন করেছে। তবে এটি অন্তত সুপারিশ করেছিল যে, 'একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আদালত কিংবা তদন্ত কমিশন গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানে একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপারেশন চলাকালে তাদের যে নৃশংসতার অভিযোগ উঠেছে, তা তদন্ত করা হোক এবং যারা এমন নৃশংসতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাদের বিচার করা হোক। এসব ঘটনা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য দুর্নাম বয়ে এনেছে। আমাদের নিজস্ব মানুষের বিরুদ্ধে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত নিষ্ঠুরতা ও অনৈতিক আচরণ স্থানীয় জনগণের সহানুভূতি নষ্ট করেছে।' এটা ১৯৭৪ সালের কথা। এমন কোনো পদক্ষেপ যে নেওয়া হয়নি, সে তো সবারই জানা।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমার শেষ ভাবনাটি তুলে ধরছি। ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধাপরাধের সবচেয়ে সফল কতগুলো বিচার সম্পন্ন করা হলেও তা একাত্তরে কী ঘটেছিল, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হাজির করতে শুরু করা কষ্টসাধ্য। যেসব অপরাধী পাকিস্তানে থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে, তারা ছাড়াও অনেকেই আর বেঁচে নেই। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারীরা যখন বধ্যভূমির তালিকা আর কী ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই সাক্ষ্য সংকলন করছেন, তখন কারও অপরাধের ব্যক্তিগত দায় প্রতিষ্ঠা এবং তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণাদি থাকবে না। কার্যত গুটি কয়েক অপরাধীর বিচার করা যাবে। আদালতে যে প্রমাণ উপস্থাপিত হবে, তা অনেকাংশেই ব্যক্তির কর্মের মধ্যে আটকে থাকবে। যদিও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কিংবা গণহত্যার দায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৃহৎ প্রেক্ষিত অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। পূর্ণ চিত্র তুলে আনা সম্ভব হবে না। এ জন্য আমি মনে করি, বিস্তৃততর সত্যানুসন্ধান প্রক্রিয়ার দিকে যাওয়া উচিত।

আবারও আমি তিমুর-লেসতের প্রসঙ্গ টানব, যেখানে একটি ট্রুথ কমিশন ১৯৭৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণের আগের সময় পর্যন্ত মানবাধিকার-সংক্রান্ত অপরাধের অসাধারণ ইতিহাস খাড়া করতে পেরেছে। অপরাধ লঙ্ঘনের শিকার হয়ে কম মানুষ নিহত হয়েছে, তারও সবচেয়ে প্রামাণিক হিসাব হাজির করেছে। সেই ঘটনার কতগুলো বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও বিবেচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব আফ্রিকার মতোই সেখানেও প্রকাশ্য শুনানি ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত হয়েছে। বাইরের দেশগুলোর ভূমিকা নিয়ে তারা আলোচনা তুলেছে। এতে বিদেশে অবস্থানরত পূর্ব তিমুরিরা, ইন্দোনেশিয়া ও তাদের এককালের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পর্তুগাল শুধু নয়; জাতিসংঘ, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও উঠেছে। পূর্ব তিমুরের প্রক্রিয়াটির আকর্ষণীয় দিক হলো,

ইন্দোনেশীয় দখলদারির আগে তিমুরবাসীর নিজেদের ভেতর পারস্পরিক হত্যা ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্বীকৃতি। বাংলাদেশে একাত্তরের সত্যকে মানতে হলে তাতে থাকতে হবে নিরীহ বিহারি ও পাকিস্তানি বাহিনীর অভিযুক্ত সহযোগীদের হত্যাকাণ্ডের কথা। তবে কোনোভাবেই এগুলোকে সমতুল্য হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে। ট্রুথ কমিশনের সুপারিশগুলো অনুসরণের ক্ষেত্রে তিমুর-লেসত সরকার ও সংসদ দুঃখজনকভাবে ঢিলেমি করেছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকার এবং কমিশনের তদন্তেও ফলাফল শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের মতো বিষয়গুলোতেও সরকারের মন্থরগতি দেখা গেছে। তবে সিভিল সমাজ এ ব্যাপারে জনসাধারণের শিক্ষা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত করছে। আর কমিশন যে জায়গাটি কাজে লাগিয়েছিল, সেটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক কারাগার, যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের বন্দী করে রাখা হতো, তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হতো—সেটি একটি জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। নানা দিক থেকে এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে সেটির সাদৃশ্য আছে।

সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু করার আগে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করার আছে। প্রথমত, স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যেখানে যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা সম্ভব, সেখানে এটা বিচারের কোনো বিকল্প নয় এবং বিচারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। অবশ্য, যখন বিচারকাজ ও সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলে, সেখানে কতগুলো প্রায়োগিক বিষয় মোকাবিলা করতে হয়। যেসব দেশে এমন ঘটেছে, যেমন সিয়েরা লিওন ও তিমুর-লেসত, সেগুলোর অভিজ্ঞতা তাই বলে। ট্রুথ কমিশনের প্রচুর পরিমাণ সম্পদ লাগে। অব্যাহত, সর্বদলীয় অঙ্গীকারবিহীনভাবে এটা শুরু করার নয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো কমিশনারদের গ্রহণযোগ্যতা। তাঁরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হিসেবে গণ্য হতে হবে। আর শুধু সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক বলয় থেকে নিলে চলবে না। কমিশনার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া, যা কমিশনারদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারে, তার উপকারী অভিজ্ঞতাসুলভ। দুটি দেশের সরকার—হাইতি ও সিয়েরা লিওন, ট্রুথ কমিশন গঠন করার সময় আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিমুর-লেসত নিজের ট্রুথ কমিশনের গণ্ডি ছাপিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে কমিশন অব ট্রুথ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ প্রতিষ্ঠা করে। কেন এটা একটা ভালো দৃষ্টান্ত, সেই সব নানা কারণ এখানে তুলব না। তবে এটা অন্তত ঠিক যে, ইন্দোনেশিয়া সেনাবাহিনীর অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তাতে পাওয়া যায়। এরূপে কোনো এক সময় পাকিস্তান কিংবা অন্তত পাকিস্তানের কিছু নাগরিক সত্য স্বীকার করে নেওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে কি না, সেই প্রশ্নটিকে প্ররোচিত করে। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সেটা ট্রুথ কমিশন গঠিত হলে আরও ভালোভাবে পালন করা যাবে কি না, সেই বিতর্কে হয়তো নেতৃত্ব দিতে পারে।

যাই ঘটুক না কেন, বাংলাদেশে স্মৃতিকে জাগরুক রেখে এবং একাত্তরের অভিজ্ঞতা যে প্রজন্ম সরাসরি পায়নি, তাদের কাছে সত্য প্রকাশ ও ন্যায়বিচারের দাবি পৌঁছে দিয়ে আপনাদের যে অসাধারণ অর্জন, সেখান থেকে আপনারা আরও এগিয়ে যেতে পারেন। এটা আসলেই এমন এক অর্জন যে আমি আপনাদের কাছে আর্জি জানাই, বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্লেষণ তুলে ধরুন, তাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, এটা কেমন করে ঘটল। বাঙালি সংস্কৃতির শক্তি ও সমৃদ্ধির কারণে কতটা, আর কতটা শিল্প, নাটক, সাহিত্য ও সংগীতের ভূমিকার কারণে; কতটা পরিবারের ভেতরকার স্মৃতির কারণে আর কতটা একাত্তরের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার মাধ্যমে বৃহত্তর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেওয়া স্মৃতির কারণে; কতটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের (যা সত্যকে লুকিয়ে রাখা দিনে দিনে কঠিন করে তুলছে) কারণে, যা আজ রাজনৈতিক অভিজাতেরা আবিষ্কার করছেন সারা দুনিয়ায়।

জবাবের যে একাংশের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত সেটা হলো, এই অর্জনের পেছনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্মৃতি ও ন্যায়বিচারের প্রতি আপনারা নিবেদিত থাকার ১৫ বছরে আপনাদের জনসমক্ষে অভিনন্দিত করতে পেরে নিজেকে সত্যিকারের সৌভাগ্যবান মনে করছি।

অনুবাদ : **আহসান হাবীব**

বই আলোচনা

পাকিস্তান ও জিন্নাহ : গোড়ায় গলদ

হাসান ফেরদৌস

দি ইন্দাস সাগা অ্যান্ড দ্য মেকিং অব পাকিস্তান—আইতাজ আহসান ॥ সাউথ এশিয়া বুকস ॥ কলাম্বিয়া, ১৯৯৭
পাকিস্তান : বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি—হুসেইন হাক্কানি ॥ কার্নেগি এন্ডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস্ ॥ নিউ ইয়র্ক, ২০০৫
মেকিং সেন্স অব পাকিস্তান—ফারজানা শেখ ॥ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস ॥ নিউ ইয়র্ক ২০০৯

১.

পাকিস্তানের ইতিহাস নিয়ে সে দেশের পাঠ্যপুস্তকে বিস্তর মিথ্যাচার আছে, এ কোনো নতুন তথ্য নয়। একাধিক পাকিস্তানি গবেষক তথ্যপ্রমাণ হাতে নিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাসের নামে একটি সরকারি কল্পকাহিনি নির্মাণে সে দেশ তার জন্মের গোড়া থেকে কী বিপুল অর্থ, শ্রম ও কাষ্ঠখণ্ড ব্যয় করেছে। এই বিষয়ে সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থটি হলো অধ্যাপক কে কে আজিজের *দ্য মার্ডার অব হিস্টরি : আ ক্রিটিক অব হিস্টরি টেক্সটবুকস ইউজ্‌ড ইন পাকিস্তান* (২০০৪)। অধ্যাপক আয়েশা জালালেরও এ নিয়ে একাধিক বই রয়েছে। 'বানানো ইতিহাস' নামে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও স্মরণীয়। নিজের জন্য একটি সম্মানজনক আত্মপরিচয়—যার কেন্দ্রে রয়েছে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে একাত্মতা—নির্মাণে সে দেশের সরকার এবং কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর সন্দেহজনক তৎপরতার বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার জন্য লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তারিক রহমানও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন।

সরকার নিজে বা সরকারের প্রভাবাধীন লেখক-বুদ্ধিজীবীদের হাতে পাকিস্তানের ইতিহাস মুখ্যত একটি আদর্শগত প্রভাব-বলয় অনুসরণ করায় এর চরিত্র বহুলাংশে প্রচারণামূলক। এই প্রচারণানির্ভর ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ইসলাম ধর্মের ও জাতির জনক হিসেবে পরিচিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'মহান' ভূমিকার গুণকীর্তন। ভারতীয় 'হিন্দু' রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রায় একা লড়াই করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য জিন্নাহ পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছেন, এ ব্যাপারে অধিকাংশ পাকিস্তানিই সন্দেহশূন্য। তাদের চোখে জিন্নাহর পরিচয় 'নব্য সালাদিন' হিসেবে। আজকের পাকিস্তান যে এক জটিল সংকটাবর্তে নিক্ষিপ্ত, তার মুখ্য কারণ জিন্নাহ-প্রদর্শিত পথ থেকে পরবর্তী পাকিস্তানি নেতাদের বিচ্যুতি, এমন যুক্তিও তাঁরা হরহামেশা তুলে ধরেন। পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী আরদেশির কোয়াসজি এই সেদিনও আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আজকের পাকিস্তানের যে অবক্ষয়, তা রোধ এখনো সম্ভব যদি আমরা সেই মহান নেতা, যাঁর হাত দিয়ে আমাদের নির্মাণ, তাঁর দেখানো মতে ও পথে ফিরে যাই।' (*দ্য জিন্নাহ অ্যান্থলজি*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০)।

জিন্নাহর প্রতি এই স্তুতিবাদ গত কয়েক বছরে বদলাতে শুরু করেছে, শুরু হয়েছে তাঁর ভূমিকার বস্তুনিষ্ঠ ও নিরাবেগ মূল্যায়ন। একাধিক পাকিস্তানি লেখক দেশটির আজকের দুর্দশার কারণ খুঁজতে গিয়ে তার ইতিহাসের শিকড় ধরে টান দিয়েছেন, ফলে তার জনকের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তাঁরা এ কথাও বলছেন, গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতা নির্মাণে পাকিস্তানের ব্যর্থতা, বিশেষত একদিকে ধর্ম-ব্যবসায়ী ও অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর হাতে তার জিম্মিদশা, এর পেছনে রয়েছে জিন্নাহ ও তাঁর সহকর্মীদের অদূরদর্শী রাজনীতি। ধর্মকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে পাকিস্তান নামক দেশটিকে তাঁরা পেয়েছেন বটে, কিন্তু সে দেশ একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' এই সিলমোহর নিজের ভাগ্য-ললাট থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। অন্তত দুটি বই—হুসেইন হাক্কানির *পাকিস্তান : বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি* ও ফারজানা শেখের *মেকিং সেন্স অব পাকিস্তান* এ ব্যাপারে সবিশেষ উল্লেখের দাবিদার। এই দুই পাকিস্তানি লেখকের অন্যতম পূর্বসূরি আয়েশা জালাল তাঁর একাধিক গ্রন্থেও একই প্রশ্নের বিস্তারিত ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক প্রস্তাবনার জন্য পাঠকের নজর কেড়েছেন। শুধু তফাত এই যে নিয়মনিষ্ঠ গবেষকের গাম্ভীর্য অনুসরণ করে জালাল কোনো রাজনৈতিক কমেন্টারি থেকে সযত্ন দূরত্ব বজায় রেখেছেন। তাঁর পাশে হাক্কানি ও ফারজানা উভয়েই তাঁদের প্রস্তাবনার উপসংহারে নির্মম ও প্রত্যক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুসেইন হাক্কানি তাঁর বই *পাকিস্তান : বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি* লেখার অনেক আগে থেকেই সুপরিচিত ও বিতর্কিত। একসময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মওলানা মওদুদির ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, পরে অবশ্য সেনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে ভিন্ন ক্যাম্পে চলে আসেন। তাঁর কলমের জোর টের পেয়ে বেনজির ভুট্টো থেকে নওয়াজ শরিফ (এবং সাম্প্রতিক সময়ে আসিফ আলী জারদারি) তাঁকে উপদেষ্টা হিসেবে নিজেদের ছাতার তলায় টেনে এনেছেন। জেনারেল মোশাররফের ক্ষমতা দখলের পর রাজনৈতিক নিপীড়নের ভয়ে আরও অনেকের মতো তিনিও দেশ ছেড়েছিলেন। সে সময় কার্নেগি এন্ডাউমেন্টের ফেলো ও বোস্টন

ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে তিনি বেশ কয়েক বছর কাটান। আমেরিকায় থাকার সময়ই হাক্কানি পাকিস্তানে ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জার্নালে তাঁর সুপরিচিত থিসিসটি উত্থাপন করেন। *পাকিস্তান : বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি* গ্রন্থটি সে থিসিসেরই এক পূর্ণাঙ্গ রূপ।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সে দেশের সেনা-গোয়েন্দা দপ্তর আইএসআইয়ের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে মার্কিন হস্তক্ষেপ চেয়ে একটি চিঠি লেখার অভিযোগে হাক্কানি সম্প্রতি নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন। একই অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর চাকরিটিও খুইয়েছেন। একে তো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা, তার ওপর আজকের পাকিস্তানের সব অপকর্মের শুরু সেই জিন্নাহর আমল থেকে, এমন কথা বলায় তোপের মুখে পড়েছেন একসময়ের জামায়াতপন্থী এই আপাত উদারনৈতিক লেখক-সাংবাদিক।

তাঁর বইয়ে হাক্কানি খুব নতুন কিছু বলে ফেলেছেন তা মোটেই নয়। পাকিস্তানি রাজনীতির সামরিকীকরণ নিয়ে সমসাময়িক তাঁর স্বদেশি আরও অনেকেই—যেমন হাসান আব্বাস, আহমেদ রশিদ ও আয়েশা সিদ্দিকা—মিঠে-কড়া বিস্তর লিখেছেন। তবে হাক্কানির বেলায় সাধুবাদ যে কারণে প্রাপ্য তা হলো, গত ৬০ বছরের ইতিহাসকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতর রেখে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন তিনি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে কীভাবে ধর্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'লেজিটিমাইজিং এজেন্ট' হয়ে ওঠে এবং তাকে ব্যবহার করে কীভাবে সেনাবাহিনী দেশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 'স্টাবিলাইজিং এজেন্টে' পরিণত হয়, এই বই বস্তুত তারই বিশদ বিবরণ।

অঙ্কটা খুবই সোজা। ১৯৪৭-এ যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, ভাষাগত ও নৃতাত্ত্বিকভাবে বিভক্ত এই দেশের মানুষকে এক রাখে এমন একমাত্র প্রতীক ছিল ধর্ম—ইসলাম। বাঙালি, পাঞ্জাবি, বালুচ বা সিন্ধি, এরা প্রত্যেকে আলাদা জাতি। এরা দেখতে ভিন্ন, এদের ভাষা ভিন্ন, আচার-ব্যবহারেও এদের ভিন্নতা বিস্তর। এক পতাকার নিচে এক দেশের নাগরিক হিসেবে এদের একত্র করার জন্য দরকার ছিল যেকোনো এক বা একাধিক প্রতীক, যার প্রতি এরা প্রত্যেকে সমানভাবে অনুগত। খুঁজে পেতে দেখা গেল ওই এক ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কোনো কিছুতেই তাদের মধ্যে মিল নেই। তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের মোদ্দা কথাই ছিল, ধর্মের দিক থেকে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, অতএব ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের পুরো অধিকার তাদের আছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে জেনারেল মোশাররফ, প্রত্যেকেই ওই ধর্মকে ছাতা বানিয়ে পাকিস্তান নামক দেশটাকে এক রাখার চেষ্টা করেছেন।

ইসলাম যদি এই রাষ্ট্রের প্রধান খুঁটি হয়, তো ভারত-বিরোধিতা তার দুই নম্বর খুঁটি। প্রথম খুঁটিকে পোক্ত করার জন্যই প্রয়োজন পড়েছে দ্বিতীয় খুঁটিটির। যে যত ভারতবিরোধী (অর্থাৎ হিন্দুবিরোধী), মুসলমান হিসেবে তার ক্রেডেনশিয়াল তত পাক্কা হয়, এই যুক্তি মাথায় রেখে পাকিস্তানের সব রাজনীতিক কে কার চেয়ে অধিক ভারতবিরোধী, সে প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেছেন। ইসলাম বিপন্ন, এ স্লোগান পাকিস্তানি রাজনীতিকেরা আগাগোড়াই দিয়ে এসেছেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারত, সে যেকোনো সময় আক্রমণে প্রস্তুত। অতএব, ইসলামকে বাঁচাতে হলে ভারতকে রুখতে হবে। দেশের ভেতর যে এই যুক্তির বিরোধিতা করবে, তার কপালে তকমা জুটবে ভারতপন্থী। অতএব সে ইসলামবিরোধী এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরোধী। গোড়ার দিকে পাকিস্তানি রাজনীতিকেরা ধরে নিয়েছিলেন, এই ফর্মুলায় তাঁদের পক্ষে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা কঠিন হবে না। কিন্তু সমস্যা হলো 'বহির্গত হুমকি' যদি রাজনৈতিক পাশা খেলায় প্রধান ঘুঁটি হয়, তাহলে যাঁরা সে হুমকি মোকাবিলায় জান বাজি রাখছেন, সেই সেনাকর্তারা রাজা-উজির না হয়ে রাজা-উজির হবেন কিনা অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত রাজনীতিক?

পোপের চেয়ে অধিক ধার্মিক হওয়ার চেষ্টা করলে তাতে কল্কে পাওয়া সহজ নয়।

শেষমেশ যে সেনা কর্মকর্তারা মখমলের কুর্সিখানা দখল করে বসেন, তার পেছনে নিজেদের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল জাতীয় রাজনীতিকদের অদক্ষতা ও আপসকামিতা। এ ব্যাপারে যে দুজনকে হাক্কানি বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁরা হলেন লিয়াকত আলী খান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। ১৯৪৯ সালে লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তান আইন পরিষদে যে তথাকথিত 'অবজেকটিভ রেজল্যুশন' গৃহীত হয়, তারই ফলে পাকিস্তানে ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আসন গেড়ে বসে। এই ধারা অনুসারে এ কথা স্বীকৃত হয় যে, ইসলামবিরোধী কোনো আইন পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য হবে না। হুসেইন হাক্কানি ঠিকই বলেছেন, পাকিস্তানের ইসলামীকরণের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল এই অবজেকটিভ রেজল্যুশনের। কারণ এই রেজল্যুশনের মাধ্যমেই, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, তা নির্ধারণের দায়দায়িত্ব পাইকারি দরে ছেড়ে দেওয়া হয় অনির্বাচিত এমন একদল লোকের হাতে, যাদের গ্রহণযোগ্যতার প্রধান চিহ্ন ছিল কার দাড়ি কতটা দীর্ঘ।

এ ছাড়া অন্য আর যে তৃতীয় এবং সম্ভবত অধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রক্তচোষা জোঁকের মতো পাকিস্তানের পেছনে লেগে ছিল, তা হলো পশ্চিমা শক্তিসমূহের উসকানি। পশ্চিমা শক্তি মানে মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একদিকে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে নিকট প্রাচ্যে সদ্য গজিয়ে ওঠা গণচীন—এই দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে কাবু করতে পাকিস্তানকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেই নিয়ে ফেলে ওয়াশিংটন। স্বাধীনতার পরপর প্রথম কয়েক বছর কিঞ্চিৎ দোদুল্যমান থাকলেও এ কথা বুঝতে মার্কিন প্রশাসনের বেশি সময় লাগেনি যে ভারতের তথাকথিত জোটনিরপেক্ষ অবস্থানের পাশে পাকিস্তানই হবে তাদের তুরুপের তাস। এ কথা তারা খুব ভালো করেই জানত যে গণতন্ত্র ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। জনগণকে যদি তাদের পছন্দমতো সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়, তার ফল সব সময় মার্কিন স্বার্থের পক্ষে নাও যেতে পারে। অতএব সিদ্ধান্ত হলো, পাকিস্তানের মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য গণতন্ত্রের কথা মুখে বলা হবে বটে, সব চেষ্টা হবে প্রকৃত গণতন্ত্র যাতে আসন গেড়ে না বসতে পারে। আর এ কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে সেনাবাহিনী।

এতে পোয়াবারো হলো সেনাকর্তাদের। একদিকে তাঁরা মুখে ফেনা তুলে ফেললেন এ কথা বোঝাতে যে অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ বেসামরিক রাজনীতিকদের কাজ নয় ভারতকে রোখা ও ইসলাম বাঁচানো, অন্যদিকে ওয়াশিংটনের কাছে তাঁরা নিজেদের হাজির করলেন

সবচেয়ে অনুগত ও নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে। ইস্কান্দার মির্জা থেকে আইয়ুব খান, তারপর জিয়াউল হক এবং সবশেষে পারভেজ মোশাররফ, প্রত্যেকেই নিজেদের পাকিস্তানের একমাত্র ত্রাতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। সবাই ধর্মের টুপি-আচকান চাপালেও এই কাজটি অন্য সবার চেয়ে জেনারেল জিয়াই যে সবচেয়ে বেশি চতুরতার সঙ্গে পালন করেছেন, তাতেও কোনো ভুল নেই।

হাক্কানি কোনো রাখঢাক ছাড়াই এই বিশ্লেষণটি অনুসরণ করেছেন। তিনি লিখছেন:

> পাকিস্তানের জন্মের শুরু থেকেই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তানের আত্মপরিচয় সুদৃঢ় করতে ধর্মীয় অনুভূতির ওপর জোর দিয়ে এসেছে। পশ্চিমা সরকারসমূহের সমর্থনে ভারত-জুজুর বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতেও এই ধর্মকেই ব্যবহার করা হয়েছে। এই নেতারা সশস্ত্র ইসলামকে বাগে আনতে ধর্মকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে তা যেন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে।

ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান যে ভারতীয় আক্রমণের সম্মুখীন, এই বিশ্বাস সে দেশের মানুষের মনে একদম গোড়া থেকেই বদ্ধমূল। হাক্কানি তাঁর বইয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর করাচির ইংরেজি দৈনিক *ডন*-এর সম্পাদকীয় থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে *ডন* জিন্নাহর উদ্দেশে আবেদন রাখে, 'ভাত-কাপড় নয়, আমাদের জন্য বন্দুকের ব্যবস্থা করুন।' জিন্নাহ সেই বন্দুকের ব্যবস্থা করতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসছি। দেশের শাসনভার সামরিক কর্তাদের হাতে চলে যাক, জিন্নাহ তা কখনো চাননি। সারা জীবন তিনি ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন। কিন্তু ক্ষমতার সব উৎস যদি বন্দুক বলেই সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে বন্দুকের বাঁট যাঁর দখলে, ক্ষমতাও যে তাঁরই কবজায় থাকবে, এ তো স্বাভাবিক কথা।

২.

পাকিস্তানের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে চলতি বিতর্কের অন্যতম অনুষঙ্গ দেশ বিভাগের পেছনে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবি নিয়ে জিন্নাহর ভূমিকা। সাবেক বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিং *জিন্নাহ: ইন্ডিয়া, পার্টিশন, ইনডিপেনডেন্স* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০) নামে ঢাউস একখানি বই লিখে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন, ভারত বিভক্তির পেছনে জিন্নাহ ও তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব নয়, সে সময়ের কংগ্রেসি নেতৃত্বের ব্যর্থতাই অধিক দায়ী।

যশোবন্ত বিশেষভাবে অভিযুক্ত করেছেন নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেলকে। গান্ধীকেও তিনি সমালোচনার বাইরে রাখেননি। ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জিন্নাহকে আমরা অভিযুক্ত বা অভিষিক্ত করতে পারি, কিন্তু তিনি নিজে এভাবে দেশ ভাগ হোক তা চাননি, এই দাবি তুলে যশোবন্ত সিং ইঙ্গিত করেছেন, তৎকালীন কংগ্রেসি নেতৃত্বের অদক্ষতা ও অধৈর্য এবং নিজেদের বাইরে অন্য কারও সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে অস্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত জিন্নাহকে দেশ বিভাগের পথে ঠেলে দেয়। যশোবন্তের বক্তব্য অনুযায়ী, জিন্নাহ চেয়েছিলেন ভারতীয় কনফেডারেশনের ভেতর মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যসমূহে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসহ সরকার গঠনের অধিকার। ভারতীয় মুসলমানদের হয়ে একমাত্র তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ কথা বলতে পারে, এই দাবিরও স্বীকৃতি চেয়েছিলেন জিন্নাহ।

পাকিস্তানের দাবি রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য দর-কষাকষি ছাড়া আর কিছু নয়, এই যুক্তির সঙ্গে হাক্কানিও একমত। তিনি লিখেছেন, একটি দেশ কী করে চালাতে হয়, এ সম্বন্ধে মুসলিম লিগ নেতাদের কোনো ধারণাই ছিল না। বস্তুত তাঁরা নতুন দেশ নয়, নতুন দেশের দাবি তুলে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টির পাঁয়তারাতেই ছিলেন। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র দেশ গঠিত হওয়া উচিত, সে যুক্তি প্রথম তুলে ধরেন কবি ইকবাল, সে কথা উল্লেখ করে হাক্কানি যুক্তি দেখিয়েছেন, ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার পাশে মুসলমানরা তাদের 'ব্যতিক্রমী ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা'র কারণে ভিন্ন জাতি হিসেবে স্বীকৃতির দাবিদার। কিন্তু ইকবাল বা জিন্নাহ কেউই সেই দাবির ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাধীন দেশ গঠনের কথা বলেননি। মুসলমানদের জন্য আলাদা যে বাসভূমির কথা তাঁরা বলেছিলেন, তা ভারতের ভেতরই একটি ফেডারেল-ব্যবস্থায় সর্বভারতীয় 'কনফেডারেশন'-এর অঙ্গরাজ্য হিসেবে টিকে থাকতে পারত। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব কোনোভাবেই মুসলমানদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে ক্ষমতা ভাগাভাগির এই ফর্মুলা মানতে প্রস্তুত ছিল না। 'এই ব্যর্থতার ফলই হলো ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টি'। জিন্নাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিবরণ দিতে গিয়ে হাক্কানি লিখেছেন, '(কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যানের মুখে) যে কাজটা জিন্নাহ করতে সক্ষম হন তা হলো ভারতের মুসলিম নেতৃত্বকে তাদের অন্তর্বিভেদ সত্ত্বেও এক সূত্রে বাঁধা।'

তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য কী, তা কিছুটা ধোঁয়াটে থাকলেও জিন্নাহ পাকিস্তানের দাবি তুলেছিলেন মূলত মুসলমানদের জন্য সমতাপূর্ণ ক্ষমতা ভোগের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আদায় করতে, এই যুক্তিটি পাকিস্তানি ঐতিহাসিক আয়েশা জালাল বেশ কয়েক বছর আগেই দিয়েছেন। নথিপত্র এনে যে প্রমাণপত্র তিনি দাখিল করেছেন, তা অনেকের কাছেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে। বস্তুত, দেশভাগ প্রশ্নে জিন্নাহর ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি যেসব পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে, জালালের একাধিক গ্রন্থের মধ্য দিয়েই তার সূচনা ঘটেছে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।[১]

জালালের মোদ্দা যুক্তিটি এ রকম: জিন্নাহর লক্ষ্য ছিল অন্য কিছুর আগে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি। সে স্বীকৃতি আদায়ের পর এসব প্রদেশ কনফেডারেশনের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, না নিজেরা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে, সে প্রশ্নে দর-কষাকষি করা যাবে। মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলোয় মুসলিম লিগের প্রাধান্য প্রমাণ করা গেলেই জিন্নাহর পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে এই প্রশ্নে বাদানুবাদ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে যদি সে চূড়ান্ত লক্ষ্য আগেভাগে নির্ধারিত হয়ে যায়, তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জটিলতা দেখা দেবে, তাদের বাদ দিয়ে পাকিস্তান গঠিত হোক, তা তারা চাইবে না। এ অবস্থায় ভারতজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের একসঙ্গে সম্মিলিত করার

কোনো সুনির্দিষ্ট পথ তাঁর সামনে ছিল না। কোনো অভিন্ন আদর্শ বা আইডিওলজি ছিল না, যা তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। এই সংকট সম্যক উপলব্ধি করে জিন্নাহ ঠিক করলেন, ধর্মই হবে সেই সূত্র, যা তাঁদের গোষ্ঠীবদ্ধতার চেহারা দিতে সাহায্য করবে। জালালের কথায়, 'ধর্ম জিন্নাহর জন্য কোনো আইডিওলজি ছিল না, এমনকি তা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য কোনো অস্ত্রও ছিল না। এ ছিল শুধু মুসলমানদের একত্র করার একটা পথ।'

জালালের এই তত্ত্ব পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। পাকিস্তানে যারা ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের পক্ষে, তারা এ কথা বিশ্বাস করে যে জিন্নাহ ইসলামকে একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানি লেখক আকবর আহমদের কথায়, জিন্নাহ ইতিহাসের নব্য সালাদিন, ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রে একত্র করাই যাঁর লক্ষ্য। অন্যদিকে ভারতে যারা জিন্নাহকে একজন সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী, তাদের কাছে ভারত বিভক্তি ও দেশভাগের সময়ে যে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়, তার কারণ জিন্নাহ—শুধু ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবি তিনিই তুলেছিলেন। ধর্মকে তুলে ধরার জন্য পাকিস্তানে জিন্নাহ যদি হন মহান নেতা, তো ভারতে একই কারণে তিনি দুষ্টগ্রহ।

তাঁর তত্ত্ব নিয়ে এই বাদানুবাদে জালাল নিজে খুশি হননি। পরে করাচির *ডন* পত্রিকায় কলাম লিখে বলতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর মোদ্দা থিসিসটিই অনেকে ধরতে পারেননি। জাতি (নেশন) ও রাষ্ট্র (স্টেট), এই দুইয়ের মধ্যে যে তফাত রয়েছে, অনেকেই তা এড়িয়ে গেছেন। জালালের কথায়, ১৯৪০ সালের পর মুসলমানদের জাতি হিসেবে স্বীকৃতি নিয়ে আর কোনো বাদানুবাদে রাজি না হলেও জিন্নাহ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রশ্নে আলাপ-আলোচনায় প্রস্তুত ছিলেন ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। লাহোর প্রস্তাবের ঘনিষ্ঠ পাঠ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে জাতি হিসেবে স্বীকৃতির অর্থ ভারতের অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ নয়। '১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের এলাহাবাদ সম্মেলনে (কবি) ইকবালের ভাষণের পর থেকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে একের পর এক বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যার মোদ্দা কথা ছিল ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানরা কীভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে পারে।'

সমস্যা হলো, জালালের থিসিসটি এই ভ্রান্ত প্রস্তাবনায় নির্মিত যে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে কোনো একটি সম্প্রদায় নিজেদের জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। ভাষাগত ও অবস্থানগত নৈকট্য এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির অভিন্ন অন্তর্ভুক্তি ছাড়া জাতি এবং জাতিরাষ্ট্রের গঠন কার্যত অসম্ভব, ইতিহাসের এই শিক্ষা জিন্নাহ গ্রহণ করেননি। তার চেয়েও বড় ভুল, জাতি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জিত হলে তার অনিবার্য পরিণতি রাজনৈতিক বিভক্তি, এই সাধারণ সত্যটুকু অনুধাবনে তাঁর অনাগ্রহ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণের কমতি নেই, যেখানে বৃহৎ বা অধিক শক্তিশালী জাতি-গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বহুজাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই সে ব্যবস্থার পেছনে বর্ম হিসেবে কাজ করেছে ক্ষমতাশালী জাতিগোষ্ঠীর বাহুবল। যেই সেই বাহুবলে কমতি পড়েছে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো একে একে সেই বহুজাতিক কাঠামো থেকে খসে পড়েছে। উদাহরণ

হিসেবে খুব বেশি দূরে নয়, বিশ শতকের বলকান ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দিকে তাকালেই সে কথা স্পষ্ট হবে। বাংলাদেশের উদাহরণ না হয় না-ই দিলাম।

জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং ধর্মকে মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থ সমুন্নত করতে ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন, জালালের এই মোদ্দা থিসিসটিও কম গোলমেলে নয়। জালাল নিজেই কার্যত এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে জিন্নাহর অন্যতম লক্ষ্য ছিল সব ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি—তাদের 'সোল স্পোকসম্যান'—হিসেবে নিজের স্বীকৃতি আদায়। জালাল ও যশোবন্ত সিংহ উভয়েই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এই দাবিতে অটুট থাকার ফলে কীভাবে শেষ পর্যন্ত প্রথমে কংগ্রেস হাইকমান্ড এবং পরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর (অর্থাৎ জিন্নাহর) দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অথচ একমাত্র মুসলিম লিগ, এবং সে দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে, তিনি পারেন সব ভারতীয় মুসলমানের হয়ে কথা বলতে, এই দাবি কগ্রেসের পক্ষে কোনোভাবেই মানা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় মুসলমানদের ভেতর লিগের সমর্থন খুবই সামান্য—১৯৩৭-এর নির্বাচনের ফল দেখে তেমন দাবি করা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন ছিল না। তা ছাড়া কংগ্রেস হাইকমান্ডে একাধিক মুসলমানের উপস্থিতি (যেমন মওলানা আবুল কালাম আজাদ) জিন্নাহর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করতে সহায়তা করে।

জালালের (এবং হাক্কানির) ব্যাখ্যার অন্য আরেক সমস্যা, যে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের জন্য জিন্নাহ 'সোল স্পোকসম্যান' হিসেবে নিজের স্বীকৃতি চাইছিলেন, তাদের সঠিক পরিচয়টি কী? রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এমন মুসলমান সম্ভবত নিজেদের মধ্যে একটি অভিন্ন আত্মপরিচয় আবিষ্কারে সক্ষম ছিল। ভারতীয় হিন্দুদের অর্থনৈতিক উত্থানের বিপরীতে ক্রমেই পিছিয়ে পড়া মুসলমান নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একধরনের বিভক্তির দেয়াল তোলা তাদের জন্য লাভজনক হবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোট ভারতীয় মুসলমানের অতি সামান্য এক অংশ। ফারজানা শেখ তাঁর *মেকিং সেন্স অব পাকিস্তান* গ্রন্থে এই ভুলটি উল্লেখ করে লিখেছেন, ভারতীয় মুসলমানরা যাঁরা নিজেদের 'আশরাফ' বলে বিবেচনা করতেন, কেবল তাঁরাই নিজেদের অভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় কল্পনায় সক্ষম ছিলেন। জিন্নাহ নিজেকে যে মুসলমানদের মুখপাত্র বলে দাবি করছিলেন, তাঁরা মুখ্যত এই আশরাফ শ্রেণীভুক্ত। ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লিগ—অথবা লিগের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ এমন দল—প্রথমবারের মতো মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত আসনসমূহের অধিকাংশ দখলে সক্ষম হয়। ধরা যাক, এই বিজয়ের মাধ্যমে জিন্নাহ—তথা মুসলিম লিগ—ভারতীয় মুসলমানদের মুখপাত্র হিসেবে দাবির যোগ্যতা অর্জন করলেন। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে যে নির্বাচন হয়, তা ছিল সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত এক নির্বাচনী-ব্যবস্থা। এই 'সেপারেট ইলেক্টোরেট' ব্যবস্থায় কেবল যে সম্প্রদায়গত বিভাজন ছিল, তা-ই নয়, যাঁরা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, তাঁদের একাধিক পূর্বনির্ধারিত শর্তপূরণের পরেই ভোট প্রদানের যোগ্যতা স্বীকৃত হয়। ফলে মোট মুসলমান জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র এক অংশই সে নির্বাচনে অংশ নেয়। তাদের নির্বাচনী সিদ্ধান্তকে তাই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী বলে চালানোর চেষ্টা খুব যুক্তিযুক্ত নয়।

৩.

জিন্নাহকে নিয়ে আরেকটি বিতর্ক—তিনি কি খাঁটি মুসলমান, না ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক? পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, সে কথা দেশটির নামকরণে ও শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত আছে এবং এই রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তি ইসলাম, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসে এ কথার যেমন দ্বিধাহীন স্বীকৃতি আছে, তেমন স্বীকৃতি রয়েছে সে আদর্শের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র হিসেবে জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নাম। কিন্তু যাঁরা পাকিস্তানকে শুধু একটি আইডিওলজিক্যাল রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান না, অথবা একমাত্র ইসলামে তার রাষ্ট্রতান্ত্রিক যৌক্তিকতা নিহিত বলে মনে করেন না, তাঁরা জিন্নাহকে যতটা সম্ভব উদারনৈতিক এবং সেহেতু সেক্যুলার বলে প্রমাণে আত্মনিবেদিত।

এঁদেরই একজন পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান 'পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল' বলে পরিচিত আইতাজ আহসান। পাকিস্তান শুধু ধর্মভিত্তিক একটি দেশ নয়, এই রাষ্ট্র গঠনের পেছনে যেমন ভৌগোলিক সন্নিবিষ্টতা কাজ করে, তেমনি কাজ করে তার অভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, এই যুক্তি বগলে নিয়ে তিনি ২০০৫ সালে লিখেছিলেন *দি ইন্দাস সাগা অ্যান্ড দ্য মেকিং অব পাকিস্তান* নামে একটি বই। অধিকাংশ পাকিস্তানি লেখক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী যেখানে নিজেদের বৃহৎ ভারত থেকে সর্বতোভাবে বিযুক্ত করতে প্রাণান্ত, সেখানে আইতাজ এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে আজ যাকে আমরা পাকিস্তান বলে জানি, সে প্রকৃতপক্ষে একটি অতি প্রাচীন ও ধনী ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ। ভৌগোলিক অর্থে সে ভারতীয়, তবে তার প্রধান পরিচয় ভারতীয় নয়, সে 'সিন্ধুমানব', যা গড়ে উঠেছে সিন্ধু নদ ও তার শাখাসমূহের অববাহিকায়। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন এই সিন্ধুমানবের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরেরও পুরোনো। এই সিন্ধু সভ্যতার বিপরীত হলো গাঙ্গেয় বদ্বীপভুক্ত সভ্যতা, যা বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা বলে পরিচিত।

সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্গত মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী—হিন্দু, খ্রিষ্টান ও মুসলমান—হলেও সাংস্কৃতিকভাবে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী, আইতাজের অভিনব থিসিসের এটি কেন্দ্রীয় বক্তব্য। তার চেয়েও বড় কথা, আইতাজ তাঁর সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে কোনোভাবে আরব বা মুসলিম সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে গুলিয়ে ফেলতে চান না। মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় অবস্থিত এই সভ্যতা পারস্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে তার কোনো সরাসরি নির্ভরশীলতা ছিল না। এমনকি আরব সভ্যতা দ্বারাও সে প্রভাবিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে এই সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সভ্যতার ইতিহাসের নবায়ন করা হয় মাত্র। অর্জিত হয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের পুনঃস্বীকৃতি। আইতাজ আহসানের দাবি, এই যে সিন্ধুমানব, সে কেবল উদারনৈতিক, ভিন্নমতসহিষ্ণু ও একাধিক ধর্মীয় চেতনারই অঙ্গীভূত নয়, সে বৈদিক সভ্যতারও উত্তরাধিকারী। জিন্নাহ—পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা—তেমনই একজন সিন্ধুমানব। আইতাজ লিখছেন :

> সিন্ধুমানব যে সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তা আকবর বা অন্য কোনো রাজা-মহারাজার দান নয়, অথবা কোনো মৌলবাদী কূপমণ্ডূকতার প্রকাশ নয়। এ হচ্ছে এক গভীরভাবে কাব্যিক সভ্যতা, যা ধনী হয়েছে খসরু, হুসেইন, বাহু, বুল্লেহ, ওয়ারিস, লাতিফ, খুশাল, ইকবাল ও ফয়েজের হাতে। এই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে এমন সব মানুষের কার্যকলাপে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাসালু, জসরাত, সারাং, অর্জুন, দুললাহ, শাহ ইনায়েত, সাকার, খুশাল, আহমেদ খান খারাত, ভগৎ সিং এবং সর্বোপরি অতুলনীয় প্রগতিশীল ও আলোকিত মানুষ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

বলাই বাহুল্য, আইতাজ আহসানের এই সিন্ধু সাগা তাঁর নিজ দেশের খুব কম লোকের কাছেই আদৃত হয়েছে। পাকিস্তানি মাত্রই ইসলামি ঐতিহ্যের অন্তর্গত, এই নির্ধারিত ঐতিহাসিক ন্যারেটিভের বাইরে তার অন্য কোনো পরিচয় থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা উত্থাপন করায় কেউ কেউ আইতাজের শিরশ্ছেদের প্রস্তাব করেছিলেন। আইতাজের প্রস্তাবিত সিন্ধুমানবের বিবরণে একটা বড় সমস্যা হলো, তিনি শুধু পাঞ্জাব ও অংশত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত ভৌগোলিক সীমানা চিহ্ন নিয়ে তাঁর পছন্দের পাকিস্তান নির্মাণ করেছেন। এতে পূর্ববঙ্গের নাম সংযোজনের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি বেলুচিস্তানও তাঁর অঙ্কে নেই। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতাকে কীভাবে বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নিত করা যায়, সে ব্যাখ্যাও সীমান্তের এপার বা ওপারের কোনো ইতিহাসবিদ যুক্তিসম্মত বলে রায় দেননি।

আইতাজ তাঁর এই সিন্ধুমানবের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতেই জিন্নাহর রাজনৈতিক পরিচয় নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করেন। জিন্নাহ এবং তাঁর আদর্শগত পূর্বসূরি ইকবাল, একটি ধর্মভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র নয়, বরং ধর্মাচারী মুসলমান এমন মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক কিন্তু ভারত থেকে গঠনগতভাবে বিচ্ছিন্ন নয় এমন একটি বা একাধিক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন, আইতাজের এই মোদ্দা বক্তব্যে কোনো মৌলিকতা নেই। জিন্নাহকে 'সেক্যুলার' প্রমাণে তাঁর চেষ্টাও তেমন অভিনব নয়। এই প্রস্তাবনার পক্ষে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় চেষ্টাটি আমরা দেখি ১৯৯৮ সালে, ইসলামাবাদের ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ কর্তৃক আয়োজিত একটি বিতর্কে। 'পাকিস্তান : ধর্মনিরপেক্ষতা না ইসলাম' এই বিষয়ে সে বিতর্কে আইতাজ এ কথা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ইসলামীকরণ প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহর স্বপ্নে দেখা পাকিস্তানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ বক্তব্যের সপক্ষে তিনি জিন্নাহর কথার অসংখ্য উদ্ধৃতি দেন, যদিও তাঁর অধিকাংশই ১৯১৫ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে দেওয়া, যখন জিন্নাহ হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর দূত বলে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।[২]

তাঁর বক্তব্য প্রমাণে আইতাজ দেশভাগের ঠিক আগে, ১১ আগস্ট ১৯৪৭ সালে, পাকিস্তান আইন পরিষদে জিন্নাহর বহু পরিচিত ভাষণটি ব্যবহার করেছেন। সে ভাষণে জিন্নাহ বললেন, পাকিস্তানি—তা মুসলমান, হিন্দু বা খ্রিষ্টান যে-ই হোক, সে তার ধর্মপরিচয়ে পরিচিত হবে না। আজ থেকে সবাই পাকিস্তানি। আইতাজ দাবি করেছেন, জিন্নাহর সে ভাষণ থেকেই স্পষ্ট, রাজনৈতিক কারণে এর আগে তিনি যে কথাই বলে থাকুন না কেন, স্বাধীন পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনো চিন্তাই তাঁর মাথায় ছিল না। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ামাত্রই জিন্নাহ তাঁর ধর্মীয় বাগাড়ম্বর ছেড়ে সর্বধর্মসহিষ্ণু এক উদারনৈতিক পাকিস্তানের রূপরেখা তুলে ধরলেন।

আইতাজের এই বক্তব্য খণ্ডন করার দায়িত্ব পড়েছিল ড. ওয়াহিদ কুরেশির ওপর। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত জিন্নাহর সব ভাষণ তন্নতন্ন করে খুঁজে তিনি দেখান, জিন্নাহ কম করে হলেও ৯০ বার ইসলামের পক্ষে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর দাবি অনুসারে, ১১ আগস্টের যে ভাষণটি আইতাজ আহসান উদ্ধৃত করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া সে ভাষণ জিন্নাহ এমন এক সময় দিয়েছিলেন, যখন তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করা। দেশের হিন্দুদের আশ্বস্ত করতেই তিনি সে ভাষণ দিয়েছিলেন, এই মর্মে আবুল আলা মওদুদির একটি বিশ্লেষণ থেকেও উদ্ধৃতি দেন ড. কুরেশি। তিনি যুক্তি দেখান, জিন্নাহ ১১ আগস্ট কী বলেছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নবগঠিত রাষ্ট্রের নীতিগত ভিত্তির বিষয়ে তাঁর অভিমত। এ ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র মেলে ১১ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে এক ভাষণে। তাতে জিন্নাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, একমাত্র ইসলামের বিধান অনুসারেই পাকিস্তান পরিচালিত হবে।

স্মরণ করা ভালো যে ১১ আগস্ট ১৯৪৭-এ যে ভাষণ জিন্নাহ দেন, উচ্চপর্যায়ের সরকারি হস্তক্ষেপে শুধু সেন্সরকৃত অংশটুকু প্রকাশিত হয়। নিজ দলের ভেতরই জিন্নাহ তাঁর সে বক্তব্যের জন্য সমালোচনা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সম্ভবত নিজের ভুল শোধরানোর জন্যই তাঁকে দুই মাস পর একই বিষয়ে ভিন্ন সুরে কথা বলতে হয়েছিল।

১১ আগস্টের ভাষণটি আইতাজ যে চেতনার বশবর্তী হয়ে ব্যবহার করেছেন, হাক্কানির ব্যবহার তার থেকে অভিন্ন নয়। তাঁর গ্রন্থে হাক্কানি এই ভাষণ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে এই টিপ্পনী যুক্ত করেছেন, পাকিস্তানের প্রতিটি সেক্যুলারপন্থী মানুষ জিন্নাহর সে ভাষণ থেকে এই যুক্তি আহরণের চেষ্টা করে থাকে যে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা একটি 'সেক্যুলার স্টেট' গঠনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। অন্যত্র হাক্কানি অবশ্য কবুল করেছেন, দেশভাগের পর নিজের মত ও পথ পরিবর্তনের চেষ্টা করলেও যে ধর্মীয় উন্মাদনার ছত্রতলে পাকিস্তান আন্দোলন বাস্তবায়িত হয়, সে উন্মাদনায় সৃষ্ট সড়ক থেকে সরে আসা জিন্নাহ অথবা অন্য কোনো পাকিস্তানি নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। হাক্কানি লিখেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সমর্থন জোরদার করতে জিন্নাহ ও তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ কোনো রাখঢাক ছাড়াই ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতি আবেদন জানানো শুরু করেন। 'জিন্নাহ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হলেও ১৯৪৫-৪৬ সালে তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলন পুরোপুরি ইসলামিক বাগ্মিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল।' এই সময় মুসলিম লিগের বিরোধিতায় কংগ্রেসের তরফ থেকে উদারপন্থী জামিয়াত-এ-উলামাদের কাজে নামানো হয় পাকিস্তান দাবির অসারতা প্রমাণে। তার জবাবে মুসলিম লিগও নিজেদের ধর্মগুরুদের মাঠে নামাল। একদিকে রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি, অন্যদিকে ধর্মগুরুদের একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করার আহ্বান—এই দুই মিলে যা দাঁড়াল, তার ফলে পাকিস্তান ও ইসলাম একদম একার্থবোধক হয়ে পড়ল। সাধারণ ভারতীয় মুসলমান, যারা পাকিস্তানের পক্ষে আওয়াজ তুলেছিল, তারা যে ইসলামের পক্ষেই ঝান্ডা তুলে ধরেছে, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না।

ধর্ম ও রাজনীতির এই মিশ্রণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি জিন্নাহ। তিনি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রস্তুত, সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবে, তার প্রমাণ হিসেবে হাক্কানি দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন। প্রথমটি, মানকা শরিফের পীরের কাছে লেখা জিন্নাহর একটি চিঠি; অপরটি সে সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন পাকিস্তানি কূটনীতিকের ব্যক্তিগত সাক্ষ্যভাষ্য। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে লেখা সে চিঠিতে জিন্নাহ মানকা শরিফের পীর সাহেবের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, 'পাকিস্তানের আইন পরিষদ—যেখানে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের প্রাধান্য থাকবে—ইসলাম ও শরিয়াবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।'

প্রায় একই সময়ে পাঠান উপজাতি সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া একটি ভাষণে জিন্নাহ বলেন, 'পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানানো মুসলমানদের কর্তব্য। সে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে আপনারা শূদ্রে পরিণত হবেন, ভারতের মাটি থেকে ইসলাম চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হবে। মুসলমানরা হিন্দুদের দাসে পরিণত হবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

পাকিস্তানি কূটনীতিকের কথা উদ্ধৃত করে হাক্কানি জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রচারণায় যে ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনা ব্যবহৃত হচ্ছে, এ কথা জিন্নাহ খুব ভালো করেই জানতেন। এ কথায় কোনো ভুল নেই যে সে সময় পাকিস্তানের সমর্থকেরা ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষায় এ নতুন রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় সক্ষম ছিল না। পাকিস্তান তাদের কাছে ছিল 'ইসলামের সূতিকাগার, ইসলামের দুর্গ'।

দেশভাগের আগে পাকিস্তানের পক্ষে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা যে সম্পূর্ণ ধর্মীয় ছিল, হাক্কানির এই ব্যাখ্যায় আমাদের দ্বিমত পোষণের কোনো কারণ নেই। সমস্যা বাধল দেশভাগের পর। যারা পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করবে ভেবেছিল, তাদের পক্ষে সাধারণ নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী 'ইসলাম' সরবরাহ করা অসম্ভব ছিল। ফলে, এই কাজে যাঁরা অধিক দক্ষ ও পেশাদার, অর্থাৎ ধর্মব্যবসায়ী ওলামা, তাঁরা খুব সহজেই রাজনৈতিক হর্তা-কর্তাদের নিজেদের হাতের থাবার নিচে নিয়ে আসেন, অথবা নিজেরাই রাজনৈতিক নেতা বনে বসেন। উদাহরণ হিসেবে মওলানা মওদুদি ও তাঁর জামায়াতে ইসলামীর কথা বলা যায়। মওদুদি পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেন এবং জিন্নাহসহ অধিকাংশ মুসলিম লিগ নেতাকে কাফের বলে মুণ্ডুপাত করেন। দেশভাগের পর অবশ্য পরিস্থিতি বদলে যায়। রাজনৈতিক 'লেজিটিমেসি' আদায়ের লক্ষ্যে রাজনীতিকেরা যে ভাষায় কথা বলা শুরু করেন, তাতে ভোল পাল্টানো মওদুদির ভাষারই অনুরণন ছিল। মওদুদি জামায়াতের যে নতুন স্লোগান নির্বাচন করেন, তাঁর মোদ্দা কথা ছিল এই রকম : পাকিস্তান আল্লাহর দান। একমাত্র আল্লাহর আইন এই দেশে বলবৎ থাকবে। শুধু ধার্মিকভাবে যারা শুদ্ধ (অর্থাৎ ওলামারা) তারাই এ দেশের ক্ষমতা পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। মওদুদি বা জামায়াতকে ঘৃণা করলেও পাকিস্তানি নেতাদের পক্ষে তাঁর বাগ্মিতাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ফলে, নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের কারণে নিজেরাই ক্রমেই মওদুদির ভাষায় কথা বলা শুরু করেন।

এখানে আমরা এ কথা যুক্ত করতে পারি যে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত

হিসেবেই তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে একজন প্রথম সারির নেতা হয়ে ওঠেন। কিন্তু তা ছিল মহাত্মা গান্ধীর ভারত প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে। পরিণত গান্ধী ও নবীন নেহরু যেভাবে কংগ্রেসকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন, তাতে জিন্নাহ কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তা ছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনের যে নতুন মানচিত্র গান্ধী ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস অনুসরণ শুরু করে, জিন্নাহ তাকেও স্বাগত জানাতে পারেননি। তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে সলাপরামর্শের ভিত্তিতে আপসমূলক রাজনীতি, তাঁর ভাষায় 'শাসনতান্ত্রিক' আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। একদিকে গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন, অন্যদিকে ধর্মীয় চেতনাভিত্তিক খেলাফত আন্দোলনকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একটি প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহারে গান্ধীর চেষ্টা জিন্নাহকে সর্বভারতীয় রাজনীতির ভিন্ন বলয়ে ঠেলে দেয়। একই সময় মুসলিমপ্রধান রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমান্তরাল উত্থান মুসলিম লিগকে একটি সর্বভারতীয় দল হিসেবে কার্যত গুরুত্বহীন করে তোলে। ১৯১৯ সালের ভারত আইন সংস্কারের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে যে নয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়, তাতে কেন্দ্রীয় নয়, আঞ্চলিক নেতাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের অবস্থান পোক্ত করার লক্ষ্যে এসব প্রাদেশিক নেতার মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করার একটি প্রবণতাও গড়ে ওঠে। পাঞ্জাব ও বাংলায়, যেখানে সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলিম প্রাদেশিক নেতৃত্ব প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণের সুযোগ পায়, তাদের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল খুবই স্পষ্ট। জিন্নাহ যে ভারতীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে আইন ব্যবসায় পুরোমাত্রায় মনোনিবেশের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডে ফিরে যান, তার পেছনে এসব কার্যকারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সময়ের ইতিহাসের পাঠ আরেকটি সম্ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম লিগের নেতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনেকটা বাধ্য হয়েই ১৯৩৫ সালে যখন জিন্নাহ এই দলের কান্ডারি হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তত দিনে তিনি এই বিষয়ে সন্দেহশূন্য যে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সর্বভারতীয় মঞ্চে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করতে হলে তাঁকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে হবে। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছিল এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনে তাঁর টিকিট। এই উপলব্ধি থেকেই জিন্নাহ খুব পরিকল্পিতভাবে ধর্মকে তাঁর রাজনীতির অঙ্গীভূত করে ফেলেন। এই রাজনৈতিক রণকৌশলের পরিণতিই ছিল ১৯৪০ সালের পকিস্তান প্রস্তাব।

তাঁদের সমালোচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও আলোচ্য পাকিস্তানি লেখকেরা যুক্তি দেখিয়েছেন, জিন্নাহ সচেতনভাবেই হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতার সমান ভাগাভাগির দাবিটি তুলেছিলেন, কিন্তু সে দাবির পেছনে তাঁর কোনো গোপন চক্রান্ত বা দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁদের এই যুক্তি মেনে নিলেও এ কথায় কোনো ভুল থাকে না যে ভারতীয় হিসেবে হিন্দু-মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের অভিন্নতা নির্দেশের বদলে তাদের ভিন্নতা প্রমাণে জিন্নাহ ও মুসলিম লিগের একরোখা চেষ্টার ফল কেবল দেশ ভাগ নয়, হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ। ধর্মীয় অর্থে ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে, ভারতীয় নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উপাদানের অভাব ছিল না। হাজার বছর ধরে যারা প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করেছে, তাদের মধ্যে ভিন্নতার চেয়ে

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য খুঁজে পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভু ইংরেজদের দেখানো পথ ধরে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে নিকটবর্তী মুসলিম নেতারা হিন্দু-মুসলমানের নৈকট্য খোঁজার বদলে তাদের কীভাবে বিভক্ত রাখা যায়, তার অনুসন্ধানেই অধিক আগ্রহী ছিলেন।

ভারতীয় লেখক রফিক জাকারিয়া তাঁর *দ্য প্রাইস অব পার্টিশন* (ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৯৮) গ্রন্থে এই রাজনৈতিক পাঁয়তারার পরিণতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন—বস্তুত, বিভক্তির প্রতি অনড় থেকে, সব মুসলিমের পক্ষে তিনি একাই কথা বলবেন, এই দাবিতে অবিচল থেকে জিন্নাহই দেশভাগের প্রশ্নটি অনিবার্য করে তোলেন। নেহরুকে তিনি ধমকের সুরে বলেছিলেন, 'আপনি নিজের মানুষ (অর্থাৎ হিন্দুদের) নিয়ে কথা বলুন। আমি আমার মানুষের হয়ে কথা বলব।' বিভেদের রাজনীতির পরিণতি শুভ নয়, এ কথা জিন্নাহ জানতেন না, তা হতে পারে না। তবে তিনি হয়তো এই আশা পোষণ করে থাকবেন যে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটার আগে ইংরেজরাজ তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন। জাকারিয়া লিখেছেন, 'দাবার বোর্ডে বিপজ্জনক ঘুঁটি চালাতে জিন্নাহ অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দাবার বোর্ডটিই সরিয়ে ফেলা হচ্ছিল। সেই কারণে পাকিস্তান, তাঁর তুরুপের তাস, যা তিনি মোক্ষম দান হিসেবে চালার আশা করেছিলেন, উল্টো তাঁর গলায় ফাঁস হয়ে দেখা দিল।'

পাকিস্তানের সূচনাপর্বে ইসলামের ভূমিকা প্রশ্নে গুণগতভাবে ভিন্ন আরেকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ফারজানা শেখ। পাকিস্তান প্রস্তাবের ভেতর যে অন্তর্গত দ্বন্দ্ব নিহিত ছিল, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি লিখেছেন, 'ইসলামি সম্প্রদায়ভুক্তি' প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনো রকম মতদ্বৈধতা না থাকলেও 'পাকিস্তান' বলতে কী বোঝায়, সে বোধ তাঁদের সবার অভিন্ন ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ভিন্নতা হ্রাস পাওয়ার বদলে বরং বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও জাতিগত দূরত্ব এই মতদ্বৈধতার একমাত্র কারণ তা নয়, 'আসলে জাতি হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট বৈরিতা ছিল'। বাংলাদেশের সৃষ্টি সে-কথার একটি বড় প্রমাণ। আল্লামা ইকবাল থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলিম নেতা শুধু ধর্মীয় কারণে ভারতবর্ষের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে এক ধরনের 'স্থানগত জাতীয়তাবাদ' (টেরিটরিয়াল ন্যাশনালিজম) তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের এই চেষ্টার পেছনে যে বৈপরীত্য ও প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব লুকানো আছে, তা অনুধাবনে তাঁরা ব্যর্থ হন। সম্ভবত রাজনৈতিক সুবিধাবাদের লক্ষ্যে তাঁরা সেসব দ্বন্দ্ব ও জটিলতা আপাতত কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

ফারজানা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। পাকিস্তান যদি শুধু মুসলমানদের আবাসভূমি হবে, তাহলে ইসরায়েলে ইহুদিদের মতো সব ভারতীয় মুসলমানের 'প্রত্যাবর্তনের অধিকার' কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি? সে অধিকারের সুনিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থতা, ফারজানার কথায়, 'পাকিস্তান মুসলমানের বাসভূমি, এই দাবিকে ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করে তোলে।' তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ফারজানা নিজেই। জিন্নাহ ও তৎকালীন মুসলিম লিগের নেতাদের

আসল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের অধিকার সুনিশ্চিত করা নয়, তাঁদের সমশ্রেণীভুক্ত মুসলিম অধিকারভোগী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা। ফারজানা তাঁর গ্রন্থে এই শ্রেণীস্বার্থ-ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিস্তৃতকরণে সাহায্য গ্রহণ করেছেন মার্ক্সিস্ট বলে পরিচিত আরেক পাকিস্তানি লেখক হামজা আলভির রচনা থেকে। ফারজানা বা হাক্কানির অনেক আগে থেকেই *পাকিস্তান টুডে* নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার এককালীন সম্পাদক আলভি পাকিস্তানে মৌলবাদী রাজনীতির প্রভাব বিষয়ে সাবধান করে আসছেন। তাঁর বিশ্লেষণে, পাকিস্তান দাবির পেছনে 'ইসলাম মোটেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না'। তথাকথিত বেতনভোগী মুসলমান শ্রেণী—আলভির ভাষায় 'সালারিয়াত ক্লাস'—হিন্দুদের পাশে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি তোলে। একবার সে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এই 'সালারিয়াত শ্রেণীর' দ্বন্দ্ব বাধে আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর (যেমন : বাঙালি, সিন্ধি বা বালুচ) সঙ্গে। মুসলিম লিগ সৃষ্টির একদম গোড়ায় হাত দিয়ে আলভি লিখেছেন, ১৯০৫ সালে ঢাকায় যখন নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়, তার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একটাই : শ্রেণী হিসেবে আশরাফ মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করা। এই 'সালারিয়াত শ্রেণীর আসল রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল ইউপি (আজকের উত্তর প্রদেশ) ও বিহারে। পাঞ্জাব বা বাংলার মতো মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশে তাদের প্রভাব ছিল নামমাত্র।'[৩]

ধর্মকে নিজের রাজনৈতিক প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নিলেও পাকিস্তান যে অবশেষে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবে, জিন্নাহ এ রকম একটি বিপদের আশঙ্কা তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেননি, এ কথা হাক্কানি ও ফারজানা দুজনেই বলেছেন। আলভির রচনায়ও সে-কথার আভাস মেলে। কিন্তু, যা কেবল মুসলমানদের আবাসভূমি, সেটি 'ইসলামিক' না হয়ে অন্য আর কী হবে, এমন প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর অবশ্য এসব উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীর ভাষ্যে মেলে না। হিন্দু ভারতের পাশে মুসলমানদের পাকিস্তানে 'আল্লাহর আইন'—অর্থাৎ শরিয়া—কার্যকর হবে, মুসলমানদের এমন প্রতিশ্রুতি জিন্নাহ ও তাঁর সব ঘনিষ্ঠ সহচর নির্দ্বিধায় দিয়েছিলেন। জিন্নাহ যদি ইসলামের ব্যবহার শুধু কৌশলগত উদ্দেশ্যে করে থাকেন, দেশ ভাগের পর তাঁর সহকর্মীদের বুঝতে খুব একটা বিলম্ব হয়নি যে দেশের মানুষকে সেক্যুলার রাজনীতির বড়ি গেলানো সহজ হবে না। এ কথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিকভাবে এসব রাজনীতিকের জোরালো কোনো খুঁটি ছিল না। মোহাজের হওয়ায় নতুন পাকিস্তানে তাঁদের সুনির্দিষ্ট জনসমর্থনেরও অভাব ছিল। ১৯৫১ সালে, জিন্নাহর ডান হাত, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের উত্তরসূরি লিয়াকত আলী খান নিজেই আগ বাড়িয়ে তথাকথিত 'প্রিন্সিপাল রেজল্যুশন'-এ সম্মত হন, তা কেবল নীতিগত মতৈক্যের কারণে নয়, নিজেদের গায়ের চামড়া বাঁচানোর জন্যও বটে।

৪.

পাকিস্তান রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। তার ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ই সে হয় সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষ সামরিক শাসনে কাটাতে বাধ্য হয়েছে।

সামরিক শাসন আইনসিদ্ধ করতে সেনাকর্তারা তাঁদের ইচ্ছামতো শাসনতন্ত্র পাল্টেছেন, কাটাছেঁড়া করেছেন। সামরিক শাসনের বৈধতা অর্জনে বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারও সুপরিচিত ঘটনা।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রশাসনিক অস্থিরতা—নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হটিয়ে হয় কেন্দ্রীয় শাসন বা সেনা হস্তক্ষেপ—তা-ও জিন্নাহর হাত দিয়েই শুরু। এ কথা এখন খুব একটা শোনা যায় না কিন্তু এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর জিন্নাহর প্রথম কাজগুলোর একটি ছিল আইন পরিষদের সিদ্ধান্ত এককভাবে প্রত্যাখ্যান। আইন পরিষদের গৃহীত যেকোনো আইন বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে 'ভেটো' দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে, এই মর্মে একটি ডিক্রি তিনি নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভার কাছ থেকে আদায় করে নেন। খুব বেশি সময় পাননি জিন্নাহ দেশ পরিচালনার, কিন্তু সে সময়ের মধ্যে দু-দুটো নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পাকিস্তানের সরকারি ইতিহাসে উভয় ঘটনাকেই নানা কূটযুক্তিজালে গ্রহণযোগ্য হিসেবে হাজির করার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি প্রথমে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্‌ফার খানের ভাই ড. খানের নেতৃত্বাধীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারকে আগস্ট ১৯৪৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তখন পাকিস্তানের বয়স দুই সপ্তাহও হয়নি। জিন্নাহর সম্পূর্ণ একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আবদুল কাইয়ুম খানকে সে প্রদেশের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়। ভারত সরকার আইনবিধি বা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের ৫১(৫) ধারায় ক্ষমতাচ্যুত করার ঘোষণা দেওয়া হলেও আইনত সে ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল হিসেবে জিন্নাহর ছিল না। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত এই আইনে গভর্নর জেনারেল কোনো প্রাদেশিক গভর্নরের প্রতি নির্দেশনামা জারির অধিকার ভোগ করতেন, তার বেশি নয়। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক ডিক্রির মাধ্যমে একাধিক নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু সে জন্য একই আইনের ৯৩ ধারার প্রয়োগ হতো, যাতে গভর্নর জেনারেলের হাতে সুনির্দিষ্টভাবে সে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। দেশ বিভাগের আগেই ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ভারত সরকার আইনের ৯৩ ধারা বিলোপ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও জিন্নাহ যে সেই আইন প্রয়োগ করলেন, তা আইনবহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও কোনো মহলেই এ নিয়ে উচ্চবাচ্য হয়নি মুখ্যত 'জাতির জনকে'র প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের কারণে।

একইভাবে ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে জিন্নাহ সিন্ধু প্রদেশের ক্ষমতাসীন এম এ খুররো সরকারকেও বরখাস্ত করেন ওই একই ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই জিন্নাহ করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত করে তাকে ফেডারেল-শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেন। খুররো সরকার সে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় এবং এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে গুরুতর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী খুররোর এই অবস্থানের প্রতি তাঁর প্রাদেশিক আইন পরিষদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তা সত্ত্বেও জিন্নাহ প্রাদেশিক গভর্নর হিদায়েতুল্লাহর মাধ্যমে সিন্ধু সরকারকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দেন। তখন যুক্তি দেখানো হয়েছে, রাজ্য পরিচালনায় খুররো সরকার অকার্যকর ও অদক্ষ। কিন্তু কাজটি যে আইনসম্মত নয়, এ নিয়ে টুঁ-শব্দটিও ওঠেনি।

গত ৬০ বছরে শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করে ইচ্ছামতো সরকার গঠন ও সরকার বদলের যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি পাকিস্তানে আমরা দেখেছি, তার শিকড় যে জাতির জনক জিন্নাহর স্বৈরাচারী পদক্ষেপে প্রোথিত, সে-কথা এখন কেউ কেউ বলা শুরু করেছেন। আয়েশা জালাল তাঁর *দ্য স্টেট অব মার্শাল রুল: দি অরিজিন'স অব পাকিস্তান'স পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ডিফেন্স* (লাহোর, ১৯৯৯) গ্রন্থে খালিদ বি সায়ীদকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতার শিকড় পোঁতা রয়েছে জিন্নাহর 'একনায়কসুলভ' মনোভাবে। তিনি খান সরকার ও খুররো সরকারের উদাহরণ দিয়েই সে মন্তব্য সংযুক্ত করেন। জালাল অবশ্য এই স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা, যাকে তিনি বলেছেন, 'ভাইস-রিগাল সিস্টেম', তার সমর্থনে এই বলে মৃদু সাফাই গেয়েছেন যে সদ্য স্বাধীন দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী ক্ষমতার সংহতিকরণে এই জাতীয় পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

ফারজানা শেখের বিশ্লেষণে জিন্নাহর প্রতি অভিযোগ অবশ্য অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও নির্দয়। *ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স* পত্রিকায় পাকিস্তানবিষয়ক একাধিক গ্রন্থের আলোচনাকালে (আগস্ট ২০০০) ফারজানা দেশ বিভাগের আগেই মুসলিম লিগের ভেতর যে স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার প্রকাশ ঘটে, তার কারণ হিসেবে জিন্নাহর সব ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত রাখাটাকে অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার আগে এই প্রবণতা কূটযুক্তিজালে সমর্থন করা গেলেও স্বাধীনতার পর তা যায় না, এ কথা বলে ফারজানা মন্তব্য করেছেন, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারকে কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়া যেভাবে পদচ্যুত করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় জাতীয় ভাষার প্রশ্নে আঞ্চলিক দাবি তিনি যেভাবে বাতিল করে দেন, তা ছিল স্পষ্ট স্বৈরতান্ত্রিক। পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনৈতিক চর্চাতে তার জনকের এসব কর্মকাণ্ড যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, এ কথায় কোনো ভুল নেই। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানি লেখক-গবেষকেরা যেভাবে জিন্নাহর স্তুতিতে ব্যস্ত, ফারজানার ভাষায় তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ফারজানা লিখেছেন :

> স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার জন্য পরিচিত একটি দেশে তাঁর (অর্থাৎ জিন্নাহর) একনায়কবাদী ব্যবহার ও বাগ্মিতা দেখে এই নেতার গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের কোনো প্রমাণ মেলে না। (পাকিস্তানিরা গান্ধী ও নেহরুর বক্তৃতায় একই রকম সুন্দর সুন্দর শব্দের প্রয়োগকে 'ফালতু' বলে অনেক আগেই বাতিল করে দিয়েছে।) জিন্নাহ দেশ ভাগের পর যে হঠাৎ সংখ্যালঘুদের সম-অধিকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন, তা দেখেও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের কোনো প্রমাণ মেলে না। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু ও মুসলমানের প্রভেদকে ভিত্তি করে যে নেতা তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর 'আজ থেকে রাজনৈতিক অর্থে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না', তাঁর এমন কথা বলার মধ্যে একধরনের কপটতা আছে।

পাকিস্তান যে আজ একটি সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা পুলিশনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে, তারও শুরু জিন্নাহর সময়ে, তাঁরই নির্দেশে। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরই পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সশস্ত্র

অনুপ্রবেশকারীদের কাশ্মীর থেকে চুক্তি অনুযায়ী সরিয়ে না নেওয়ার ফলেই সামরিক সংঘর্ষের শুরু, এ নিয়ে এখন আর কোনো দ্বিমত নেই। এই আলোচনার শুরুতে *ডন* থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট, তার সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই একটি জঙ্গি ও ধর্মীয় 'জোশ' পাকিস্তানিদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। যোদ্ধা হিসেবে পাকিস্তানিদের নিজেদের সম্বন্ধে একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ ধারণা প্রচলিত আছে। ভারত তথা হিন্দুদের সঙ্গে যেকোনো যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ, এই যুক্তিতে পাকিস্তানিদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, এমন পাকিস্তানি ধর্মগুরুর অভাব কোনোকালেই ছিল না। ফলে তার রাজনৈতিক মোড়কের আড়ালে প্রতিটি যুদ্ধই ধর্মীয় অভিযান হয়ে দাঁড়ায়। এতে দেশের মানুষের কোনো লাভ হোক বা না হোক নিজেদের ফায়দা পুরো মাত্রায় ঘরে তুলতে সক্ষম হন দেশের সেনা অধিকর্তারা। এই ইতিহাসের শুরু পাকিস্তানের ইতিহাসের সূচনাপর্ব থেকে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম বছরের বাজেটের ৭০ শতাংশই নির্দিষ্ট হয় সামরিক খাতে। হাক্কানি জানিয়েছেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্র ধরে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকেও জোরদার করা হয়। রাজনীতিকদের ওপর নজরদারির জন্য দেশের প্রতিটি প্রদেশে স্থাপন করা হয় আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ) বিভাগ। হাক্কানি মন্তব্য করেছেন, আজকের আইএসআইয়ের (আন্তসামরিক গোয়েন্দা বিভাগ) বীজ সেই ১৯৪৭-৪৮ সালেই পোঁতা হয়।

পাকিস্তানি রাজনীতির আরেক উপাদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত ক্লায়েন্ট রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ, সে কাজটিও শুরু হয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সময়েই। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পূর্ণ হলেও মার্কিন সরকার নবগঠিত পাকিস্তানের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিল। আজ হোক বা কাল, দেশটি তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হবে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ ব্যাপারে প্রায় সন্দেহশূন্য ছিল। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রুম্যান প্রশাসন পাকিস্তানকে এড়িয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। নেহরু সরকার ওয়াশিংটন ও মস্কো এই দুই পরাশক্তি থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখার জোটনিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী, এ কথা ঠাহর করার পরই ওয়াশিংটন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে মনোনিবেশ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে আমেরিকার বন্ধুত্ব পাকিস্তান কেন কামনা করে, সে কথার তাত্ত্বিক ভিত্তিটি সরবরাহ করেন জিন্নাহ নিজে। ৭ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় জিন্নাহ যুক্তি দেখান, পাকিস্তান ইসলামিক দেশ হওয়ায় এই দেশে কমিউনিজমের কোনো স্থান নেই (ডেনিস কাক্সের *দি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড পাকিস্তান ১৯৪৭-২০০০*, জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১)। কিন্তু আসল কারণটি ছিল ভিন্ন। দেশ বিভাগের পরপর কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হলে সামরিক অস্ত্র ও যন্ত্রাংশ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই জিন্নাহ আমেরিকার বন্ধুত্ব কামনা করেছিলেন। অর্থনীতির নড়বড়ে অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য দ্রুত ঋণের ব্যবস্থা করা পাকিস্তানের বাঁচা-মরার প্রশ্ন হয়ে ওঠে। মস্কো নয়, আমেরিকার কাছ থেকেই মোটা অঙ্কের ঋণ বা অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে-কথা বুঝতে পেরে জিন্নাহ ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এম এ এইচ ইস্পাহানির মাধ্যমে দুই বিলিয়ন ডলারের ঋণ চেয়ে বসেন।

জিন্নাহ অবশ্য একটি লোক-দেখানো যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাঁর দেশের নয়, আমেরিকারই বেশি প্রয়োজন পাকিস্তানকে। হাক্কানি তাঁর গ্রন্থে দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে *লাইফ* ম্যাগাজিনের বিশেষ প্রতিনিধি মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইটের সঙ্গে জিন্নাহর এক কথোপকথন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তানের সামরিক রণকৌশলগত গুরুত্বের কারণেই আমেরিকার পাকিস্তানের প্রয়োজন আছে। 'পাকিস্তানের আমেরিকাকে যতটা প্রয়োজন, আমেরিকার পাকিস্তানকে প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি'। রাশিয়া পাকিস্তান থেকে খুব দূরে নয়। সে যদি এ দিকে পা বাড়ায়, তাহলে সারা বিশ্ব বিপদগ্রস্ত হবে, সে ইঙ্গিত দিয়ে জিন্নাহ বলেন, রুশদের ঠেকাতে আমেরিকার প্রয়োজন পড়বে পাকিস্তানকে। বুর্ক-হোয়াইট জানাচ্ছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে নিকট সামরিক সম্পর্ক নির্মাণ—তাকে আর্থিক ও সামরিকভাবে সাহায্য করা—ছাড়া আমেরিকার অন্য কোনো পথ খোলা নেই, জিন্নাহর এই যুক্তি পাকিস্তানি নেতারা তাঁকে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন। পাকিস্তানে রুশ আগ্রাসনের স্পষ্ট কোনো লক্ষণ রয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা অবশ্য তাঁকে কোনো সদুত্তর প্রদানে ব্যর্থ হন।

আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রশ্নটি জিন্নাহ ফের উত্থাপন করেন ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ, মন্ত্রিসভার নির্ধারিত বৈঠকে। পখতুন নেতা বাদশা খানের নেতৃত্বে তত দিনে স্বতন্ত্র পাখতুনিস্তানের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মস্কো পাকিস্তানের সংহতিতে আঘাত হানতে চায়, এমন ইঙ্গিত করে জিন্নাহ সে বৈঠকে বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাখতুনদের মধ্যে যে রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তার পেছনে রয়েছে মস্কো। জিন্নাহ দাবি করেন, সীমান্ত প্রদেশের নিরাপত্তা শুধু এক পাকিস্তানের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর জন্যই নিশ্চিত করতে হবে। একই বৈঠকে জিন্নাহ মনে করিয়ে দেন, অধিকাংশ দেশ নবগঠিত পাকিস্তানের জন্য তাঁকে অভিনন্দনবার্তা পাঠালেও মস্কো তখন পর্যন্ত নিশ্চুপ। ডেনিস কাক্স মস্কোকে জড়িয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানোর এই চেষ্টাকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ও জার রাশিয়ার মধ্যকার 'গ্রেট গেম'-এর সঙ্গে তুলনীয় বলে মন্তব্য করেছেন।

আমেরিকার কাছ থেকে প্রার্থিত ঋণ পেতে ব্যর্থ হলেও সে দেশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে জিন্নাহ তাঁর চেষ্টা ছাড়েননি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রদূত পল এলিং তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণে করাচি এসে পৌঁছালে জিন্নাহ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরব সাগরপারে জিন্নাহর অবকাশ নিবাসে দেখা করতে এলে পাকিস্তানি নেতা তাঁকে করাচিতে তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবন ভাড়া নেওয়ার আহ্বান জানান। এলিং অবশ্য সে অনুরোধ রাখতে পারেননি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এই উষ্ণ অভ্যর্থনার পটভূমিটি বর্ণনা শেষে হাক্কানি মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্র হিসেবে সংহতি অর্জন করা এবং হিন্দু-ভারতের বিরুদ্ধে ইসলামের ক্ষেত্রভূমি হিসেবে পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল আর্থিক ও সামরিক সাহায্য। সে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান নিজ উদ্যোগেই আমেরিকাকে তার রক্ষক হিসেবে মনোনীত করে। জিন্নাহর তৈরি যুক্তি ও প্রদর্শিত পথ ধরে আমেরিকার ওপর যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরনির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে, ইসলামিক পাকিস্তানের সে পথ থেকে সরে আসা আর কখনোই সম্ভব হয়নি।

নিজের ইতিহাসের ৬০ বছর অতিক্রমের পর নতুন করে তার জনকের ভূমিকার এই মূল্যায়ন পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচিত করেছে। সবচেয়ে আশার কথা, এই মূল্যায়ন হয়েছে পাকিস্তানি লেখকদের হাতেই। তা সে দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের পরিপক্কতার পরিচায়ক। আমরা এমন আশা করতে পারি, দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই পরিপক্কতার প্রতিফলন রাজনীতিবিদ ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও একসময় সংক্রমিত হবে।

টীকা

১. আয়েশা জালাল তাঁর *সোল স্পোকসম্যান : জিন্নাহ, দ্য মুসলিম লিগ অ্যান্ড দ্য ডিমান্ড ফর পাকিস্তান* (কেমব্রিজ, ১৯৮৫) গ্রন্থের মাধ্যমে এই তত্ত্বের দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পরে *সেলফ অ্যান্ড সভরেনিটি : ইনডিভিজুয়াল অ্যান্ড কমিউনিটি ইন সাউথ এশিয়ান ইসলাম সিন্স ১৮৫০* (রুটলেজ, ২০০০) গ্রন্থে সে তত্ত্ব তিনি আরও বিস্তৃত করেছেন।

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন : *পাকিস্তান : বিটুইন সেক্যুলারিজম অ্যান্ড ইসলাম : ইডিওলজি, ইস্যুজ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট*, তারিক জান সম্পাদিত, ইসলামাবাদ, ১৯৯৮

৩. হামজা আলভি, ইন্টারনেট আর্কাইভ, http://hamzaalavi.wordpress.com/2010/02/07/the-rise-of-religious-fundamentalism-in-pakistan

বই আলোচনা

আবেগ ও বিশ্বরাজনীতি

বদরুল আলম খান*

দ্য জিওপলিটিকস অব ইমোশনস : হাউ কালচারস অব ফিয়ার, হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড হোপ আর রিশেপিং দ্য ওয়ার্ল্ড—দমিনিক মোইসি ॥ দ্য বডলি হেড ॥ লন্ডন, ২০০৯

বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারকে বিধৌত করেছে, এমন মননের অন্যতম উৎপত্তিস্থল হিসেবে ফরাসি জাতিকে চিহ্নিত করায় কোনো অতিমাত্রিকতা নেই। কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব বা স্থাপত্যশিল্প—প্রতিটি অঙ্গনে ফরাসিদীপ্তির ছাপ অলঙ্ঘনীয়। তবে কেবল অবদানের অঙ্ক কষে একে মূল্যায়ন করা শ্রেয় নয়। ভিন্নধর্মী, অপ্রচলিত অবস্থান, নতুন দৃষ্টিকোণ ও নতুন প্যারাডাইম সৃষ্টি ফরাসি সৃজনশীলতার সঙ্গে অবিভাজ্য হয়ে আছে। ভিক্তর হুগো-ফ্লবারের ধ্রুপদি সাহিত্য, সার্ত্র-কামুর অস্তিত্ববাদী দর্শন, মিশেল ফুকোর আধুনিকোত্তর দর্শন (পোস্ট-মডার্ন), মনে-সেজানের অন্তমুদ্রণাশ্রয়ী (ইমপ্রেশনিস্ট) চিত্রশিল্প—তার সব না হলেও কয়েকটি উদাহরণ। তবে প্রজ্ঞার এ চিরপরিচিত ক্ষেত্র ছেড়ে ফরাসি পাণ্ডিত্য যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুয়ারে আঘাত হানবে, যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্য অতিমাত্রায় উচ্চারিত, সেটি ভাবা কঠিন ছিল এত দিন। সেটি উপলব্ধি করা গেল ঠান্ডাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভবের ক্রান্তিলগ্নে এসে। আমাদের স্মরণে আছে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিদায়ে কী ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্ম হবে, এর সম্ভাব্যতাকে ঘিরে জন্ম নেয় নানা ধরনের আলোচনা। সে সময় দুটি বিশ্লেষণ, এবং দুটিই মার্কিন ঐতিহ্য থেকে আসা, বিশেষভাবে অনুপ্লাবিত করে বিশ্ব ব্যুৎপত্তি জগৎকে। এর একটি ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার ইতিহাসের সমাপ্তি (The End of History and the Last Man) থিসিস, অন্যটি স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘর্ষ (The Clash of Civilisations) তত্ত্ব। আজ বলা চলে, তৃতীয় ধারার আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে ফরাসি পাণ্ডিত্যের ফসল 'Geopolitics of Emotions' নামের একটি লেখা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক দমিনিক মোইসির এ লেখাটি প্রথমে প্রকাশ পায় প্রবন্ধ আকারে, *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* জার্নালে, ২০০৭ সালে। প্রবন্ধটি যখন বিদগ্ধ পাঠকের হাতে পড়ে, তখন এটিকে পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশের দাবি আসে। ২০০৯ সালে আমরা হাতে পাই মোইসির উল্লিখিত গ্রন্থটি, যাকে ফরাসি ম্যাজিক বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন। মোইসি তাঁর গ্রন্থের আদি নাম দিয়েছিলেন *দ্য ক্ল্যাশ অব ইমোশনস*। এ শিরোনাম পরবর্তী সময়ে কেন তিনি পরিবর্তন করেন, এর কোনো উল্লেখ নেই। যদিও ধরে নেওয়া যায়, নামকে কেন্দ্র করে তিনি অযথা কোনো পলেমিক্সে জড়িয়ে পড়তে চাননি। এর চেয়ে পাঠকের কাছে নিজ বক্তব্যের সারবস্তু পেশ করা তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। নাম পরিবর্তন হলেও মোইসির রচনাটি হাতে নিয়ে ধরে নেওয়া যায় যে এটি উল্লিখিত ওই দুটি দৃষ্টিকোণকে আক্রমণ করেই কেবল লেখা নয়, এর বিকল্পও বটে। নিঃসন্দেহে লেখাটি সে লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে—ওই বিশ্লেষণের শক্ত বাঁধনকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে।

বাংলাদেশি বিদগ্ধ পাঠকের কাছে বইটি কতটুকু পরিচিত, সেটি পরিমাপ করা কঠিন। কিন্তু তাদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, তাদের কাছে মোইসির উদ্দেশ্য সহজ-সরল হিসেবে প্রতীয়মান হবে। বিশ্বায়ন (গ্লোবালাইজেশন) নামের যে প্রক্রিয়া বৈশ্বিক জীবনকে আজ প্রভাবিত করছে, এর একটি জুতসই ব্যাখ্যা দেওয়া তিনি অত্যন্ত জরুরি মনে করেছেন এবং যে যুক্তির ওপর তিনি তাঁর মতাদর্শের মূল গাঁথুনিটি নির্মাণ করেছেন সেটি হলো, এ বিশ্বরাজনীতিকে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার সময় এসেছে। এ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির স্থাপত্য নির্মাণে আবেগের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কি না, সেটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। পরখ করে দেখা আবেগ দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করা সম্ভব কি না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাবরি মসজিদ ও এর অবমাননা এক শক্তিশালী আবেগ হিসেবে কাজ করে। এ আবেগ নিয়ে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় বেঁচে আছে সংগ্রাম করে ও আশায় অনুপ্রাণিত হয়। একইভাবে ২০০৮ সালে মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসীদের মুম্বাই শহর আক্রমণ এবং তাদের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ আবেগাপ্লুত করে হিন্দু সম্প্রদায়কে। ইসলামি জঙ্গিবাদ মোকাবিলা সে কারণে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, স্থান করে নেয় তাদের সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের গভীরে। অন্যদিকে, আরব বিশ্বের জন্য ইসরায়েলের হাতে লাঞ্ছনা ও পরাজয় এক গভীর ক্ষত হিসেবে বিরাজমান। এ ক্ষত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, মানসিক ও আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করে। একে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক অঙ্ক কষা ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণ সম্ভব নয়। আবেগের প্রভাব থেকে পশ্চিমা বিশ্বও মুক্ত নয়। একদিকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা এর

* লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ : b.khan@uws.edu.au

জন্য এক অশনিসংকেত। যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পশ্চিমা বিশ্ব আজ নিমজ্জমান, তা থেকে একধরনের ভীতি আজ একে গ্রাস করে আছে। কিন্তু আবেগের এ চিত্র কতটুকু গ্রহণযোগ্য—যখন প্রচলিত বিচারে আবেগকে মনোবিজ্ঞানের প্রত্যয় হিসেবেই কেবল দেখা হয় এবং সে কারণে এর প্রয়োগমূল্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাইরে নগণ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এ সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হলেও মোইসির মনে এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। তিনি লিখেছেন :

> One cannot fully understand the world in which we live without trying to integrate and understand its emotions. Emotions are like cholesterol, both good and bad. The problem is to find the right balance (p. x)

উল্লেখ করা প্রয়োজন, আবেগকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের রেওয়াজ যে একেবারে আকস্মিক, তা কিন্তু নয়। অতীতে সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতির বিশ্লেষণে অনেকেই আবেগের প্রভাবে সম্মোহিত হয়েছেন। আবেগের তীব্র অনুভূতির সামাজিক ও শৈল্পিক মূল্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে প্লেটো থেকে হবস ও কান্ট থেকে হেগেলের ভাববাদী দর্শনে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব এবং প্রজ্ঞার বিজয় দিয়ে যে আধুনিক সমাজের জন্ম হয়, এর অতিমাত্রিকতায় ক্লান্ত হয়ে অনেক কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক আবেগভিত্তিক নতুন আন্দোলন গড়ে তোলেন প্রজ্ঞার রাহু থেকে মুক্তির আশায়। বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের হৃদয়হীনতা, অর্থনৈতিক একগুঁয়েমি, উপযোগবাদ ও বস্তুবাদ এবং ক্যাশ নেক্সাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জন্ম নেওয়া রোমান্টিকবাদী আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে আমরা জানি টমাস কার্লাইল, বেঞ্জামিন দিগ্রাইলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস, বায়রন, ব্লেক প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদকে। মানুষের প্রকৃতিকে অভিন্ন হিসেবে দেখার যে পরামর্শ প্রজ্ঞাকেন্দ্রিক চিন্তাকাঠামো দেয়, এ ধারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। কারণ, ব্যক্তির আবেগ ও সৃজনশীলতার মুক্তভ্রমণ এ প্রজ্ঞাকাঠামো বাধাগ্রস্ত করে। কেবল উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আবেগের প্রায়োগিক মূল্য বাণবিদ্ধ হয়েছিল মার্ক্সের বস্তুবাদী বিশ্লেষণে—তখন আবেগের বদলে শ্রেণীস্বার্থ স্থান করে নেয় বৌদ্ধিক জগতে।

যা-ই হোক, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল এবং কেন আবেগ বিশ্বরাজনীতি বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে, সে সম্পর্কে মোইসি দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, একটি হলো, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এক উত্তরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এ উত্তরণ সূচিত হয়েছে শীতলযুদ্ধের (কোল্ড ওয়ার) সমাপ্তির মুহূর্ত থেকে। ৪৫ বছরের শীতলযুদ্ধের আদর্শিক লড়াই সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ইউরোপ এবং পরে গোটা বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের এককালের মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আঁতাত গড়ে তোলে এবং শুরু হয় বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা। শীতলযুদ্ধের দীর্ঘসূত্রতা পৃথিবীকে একধরনের স্থিতিশীলতা উপহার দিয়েছিল বটে; কিন্তু এর মূল ভিত্তি ছিল আদর্শ (সমাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র)। আদর্শের দোহাই দিয়ে সেকালে সবকিছু বৈধ করার রেওয়াজ ছিল—কি আঞ্চলিক যুদ্ধ, কি সামরিক অভ্যুত্থান ও ভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ। এ আদর্শিক সংঘর্ষের সমাপ্তি ১৯৮৯ সালে বার্লিন দেয়ালের পতন, অধিকৃত আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ভাঙনের মধ্য দিয়ে ঘটে। সে সময় থেকেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি আদর্শকে সমভাবে নির্বাসিত করেছে ইতিহাসের গহ্বরে। এ আদর্শের সংকট দিয়ে শেষ হয়েছে এমন এক যুগের, যাকে ঐতিহাসিক হব্‌স্‌বম চরম সময়কাল (এজ অব এক্সট্রেমস) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু যে গুণগত পরিবর্তন শীতলযুদ্ধ সমাপ্তির পর লক্ষ করা গেল, তাতে ছিল এক বড় মাপের উত্তরণের ইঙ্গিত—আদর্শভিত্তিক মেরুকেন্দ্রিকতা থেকে আত্মপরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির। এর প্রভাবে বিশ্বরাজনীতিতে আজ দেখা দিয়েছে এক নতুন মেরুকরণের। ধীরে হলেও আদর্শের স্থান দখল করতে উদ্যত মানুষের আত্মপরিচয়। মোইসির দৃষ্টিতে :

> Today, as we shall see, quests for identity by peoples uncertain of who they are, their place in the world, and their prospects for a meaningful future have replaced ideology as the motor of history, with the consequence that emotions matter more than ever in a world where media is playing a role of a sounding board and a magnifying glass (p. 4).

আত্মপরিচয়ের সঙ্গে আবেগের সুগভীর সম্পর্ককে অস্বীকার করা কঠিন এবং সে কারণে মোইসির দৃষ্টিকোণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, আমার পূর্বসূরি কে, আমার বর্তমান অবস্থা কেন এমন হলো, ভিন্ন হতে পারত কি ইত্যাদি সব প্রশ্ন যেমন ব্যক্তিমানুষকে বিদ্ধ করে, তেমনি করে জাতিকে। ওই একই প্রশ্ন অবলীলাক্রমে বাংলাদেশের ৪০ বছরের স্বাধীনতা-উত্তরকালকে সামনে রেখে করা সংগত। কতটুকু পেলাম, বাকিটা কেন পেলাম না ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদের মনের গভীরে স্থান নিয়ে আছে। ব্যক্তিজীবন আজ সে কারণে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, যত না সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদযুদ্ধ। এর চেয়ে আমি কে, বাঙালি হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে আমার অবস্থান কোথায়, এ অবস্থান থেকে উত্তরণ সম্ভব কি না এবং কীভাবে ইত্যাদি প্রশ্ন। এ আত্মপরিচয়ের পরিমণ্ডল আজ যেভাবে স্ফীত হচ্ছে, তাতে করে একে এক প্রবল সুনামির স্রোতের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে। উদাহরণের জন্য বেশি দূরে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অতিসম্প্রতি আমরা লক্ষ করেছি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ জাতীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিমজ্জিত—বসনিয়া থেকে ইউক্রেন, ইউক্রেন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। আরব বিশ্বের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অন্তর্জ্বালার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আদর্শবর্জিত আবেগের জোয়ার লক্ষ করা গেছে। একে বিশ্লেষণ করা কঠিন হলেও মিসরের হোসনি মোবারক থেকে শুরু করে সিরিয়ার বাশার আল-আসাদের উৎখাত-সংগ্রামে সম্ভবত ওই একই অনুভূতি ইন্ধন জুগিয়েছে আংশিকভাবে হলেও। আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম আজ সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী। মোইসি এ অনুভূতির সারমর্মকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> Today's globalised world is the ideal fertile ground for the blossoming of or even the explosion of emotions. Globalization causes insecurity and raises the question of identity. In the cold war period there was never any reason to ask "who are we?". The answer was plainly visible

on every map that depicted the two adversarial systems dividing the globe between them. (p.12)

অবশ্য বিশ্বায়নের অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি কী এবং কেন আবেগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হলো, সে সম্পর্কে মোইসির কোনো দ্বিধা নেই। আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি আজ যে তীব্রতা অর্জন করেছে, সেটি প্রযুক্তির ভূমিকা ছাড়া কখনোই সম্ভব হতো না। মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবের জোয়ারকে বসন্তবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হলেও অনেকে একে টুইটারবিপ্লব নামেও অভিহিত করেন, যার গভীরে প্রোথিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার নতুন মাধ্যম হিসেবে প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রভাব। আমরা কোনো বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই আজ স্বচক্ষে দেখছি, বিশ্ব আজ কত বেশি খোলামেলা হয়েছে, প্রযুক্তি মানুষের মনের অন্তর্নিহিত গভীর আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা কত বেশি বাড়িয়েছে, সে কারণে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বিশ্ব আজ অনেক বেশি স্বচ্ছ। দূর প্রান্তে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে মানুষ অবগত হচ্ছে। গণমাধ্যম সৃষ্টি করছে বিশ্ব পরিমাপে নিজের অবস্থান অনুধাবন এবং নিজের প্রতিচ্ছবিকে দেখার সুযোগ। আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি সে কারণে আদর্শের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি। এ যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়তোবা আরও সম্ভব হতো না, যদি গণমাধ্যমের ওপর একচেটিয়া পশ্চিমা আধিপত্য খর্ব না হতো। আল-জাজিরা থেকে শুরু করে অন্যান্য মিডিয়ার আবির্ভাবে গণমাধ্যমে সূচিত হয় একধরনের বিপ্লব, যেটি এককালের পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করে। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব জনতা সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিকশ্রেণীর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় নিজের অবস্থানকে তুলনা করতে সক্ষম হচ্ছে মিডিয়াভিত্তিক তথ্যের আয়নায়, একে অন্যের প্রতিচ্ছবি দেখে। তারা আজ স্পষ্টত দেখছে শাসকের চরিত্র, জাতির স্খলনের কারণ খুঁজে নেওয়া সহজ হচ্ছে আনুপাতিকতানির্ভর বিচারের সহায়তায়। আদর্শিক ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষ, জাতি ও গোত্রের যে আবেগ জমাট বেঁধেছিল, বিশ্বের বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যাওয়ায় সেটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন পণ্য, আদর্শ, অর্থ, পুঁজি ও মানুষ মুক্তভাবে চলাফেরা করে, তেমনি আত্মপরিচয়ের আবেগও বাধাহীন গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিগামী। সীমান্তের বাধা এক অদৃশ্য শক্তির প্ররোচনায় উন্মুক্ত। আবেগের স্রোতধারায় মিলিত হচ্ছে বিশ্বের সব মানুষ, প্রভাবিত করছে একে অন্যের সংস্কৃতি ও আবেগকে।

বিশ্বায়ন-অনুসৃত এ পরিবর্তন অবশ্য একমাত্র পরিবর্তন নয়, পাশাপাশি চোখে পড়ে তার আরও এক রূপ, সেটি হলো নিরাপত্তাহীনতা। মোইসি লিখেছেন, 'বিশ্বায়নের প্রভাব সব জাতি ও রাষ্ট্রের মনে আশঙ্কা এবং আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এর সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই।' ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী আক্রমণ এর একটি উদাহরণ। এ নিরাপত্তাহীনতা উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের ঘাড়ে চাপল, কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই বলতে হয়। শীতলযুদ্ধ যখন শেষ হলো, তখন একে দেখা হয়েছিল স্বৈরশাসনের ওপর গণতন্ত্রের, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর ধনতান্ত্রিক, উদারনীতিক দর্শন ও রাষ্ট্রনীতির এবং সোভিয়েতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় হিসেবে। বিশ্ব বলতে বোঝানো হলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে, কিন্তু কে ধারণা

করেছিল যে অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। বহুকেন্দ্রিকতার এ ভিত—যেটি চীন, ভারত, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশের অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক সাফল্যে গড়ে ওঠা, সেটি আজও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত নয় বটে; কিন্তু এর গোড়াপত্তন যে ঘটেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। মোইসি লিখেছেন :

> If the twentieth century was both "the American century" and the "century of ideology," I think there is strong evidence that the twenty-first century will be "the Asian century" and the "century of identity." The parallel shifts from ideology to identity and from West to East mean that emotions have become more important than ever in the way we see the world (p. 14)

তবে এ বহুকেন্দ্রিকতা সত্য হলেও তার মধ্যে লক্ষ করা যায় একধরনের প্যারাডক্স, যেটি আজ এমনকি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকেও এড়ায় না। সারা বিশ্বের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমেরিকান সংস্কৃতির প্রভাবে—অপ্রতিরোধ্যভাবে। অথচ বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি আজ আমেরিকা বা ইউরোপের হাতে নেই—সেটি ধীরে হলেও স্থানান্তরিত হয়ে চলে এসেছে এশিয়ার হাতে। ২০০৮ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংকট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের চলমান অভ্যন্তরীণ সংকট এবং অনিশ্চয়তার কারণে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের আগের শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি চীন, ভারতের মতো এশীয় দেশে চলছে যুগান্তকারী উত্থান। মোইসির অপ্রতিসম বহুকেন্দ্রিকতার (অ্যাসিমেট্রিক মাল্টি-পোলারিটি) চিত্র পশ্চিমা বিশ্বের জন্য একেবারে নতুন, তাদের পক্ষে তাঁকে হজম করা আরও কঠিন। সে কারণে তাঁর মনে সঞ্চিত হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতার বীজ। অতীতের গৌরবময় কাল তাঁর দৃষ্টি থেকে দ্রুত অপস্রিয়মাণ—অতীতের স্মৃতির মধ্যে জন্ম নেওয়া নস্টালজিয়া তাঁর আবেগের মূল উৎস। ফলে এশিয়ার তুলনায় ভিন্ন চরিত্রের হলেও বিশ্বায়নসৃষ্ট আবেগের প্রভাব থেকে পশ্চিমা বিশ্ব মুক্ত নয়, তাঁর মনন ওই আবেগের স্রোতধারায় সিক্ত—অজানা এক ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁকে আবেগাপ্লুত করে অনেক বেশি—অন্যান্য যেকোনো অঞ্চল এবং সময়ের তুলনায়।

এদিক দিয়ে বিচার করলে তাহলে বলতে হয়, বিশ্বায়নের এ অসম বিকাশ জন্ম দিয়েছে দুই পৃথিবীর—এর একটি আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে নিমজ্জমান, অন্য জগৎটি ভীতি ও অনিশ্চয়তার ধূম্রজালে ম্রিয়মাণ। এ বিভ্রান্তিকর চিত্র মোইসির মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির চিরাচরিত ব্যুৎপত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। চিরাচরিত বিশ্লেষণ বলতে আমাদের বুঝতে হবে বাস্তববাদী (রিয়েলিস্ট) নামের পরিচিত এক তাত্ত্বিক স্রোতধারাকে, যেটি এতকাল প্রচণ্ড দাপট নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। বাস্তববাদী ধারায় গড়ে ওঠা তাত্ত্বিক কাঠামোর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো, এটি অতিমাত্রায় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, যেটি বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অপাঙ্‌ক্তেয়। কারণ, আন্তরাষ্ট্রীয় সংযোগ আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে একক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কোনো প্যারাডাইম কার্যকরী হওয়া কঠিন। ওই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশকে অত্যন্ত বৈরী হিসেবে

চিত্রায়িত করে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম—এমন আন্তর্জাতিক সংগঠনের অভাব রয়েছে এবং সে কারণে ওই দায়িত্বটি নিজের হাতে নেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোনো গত্যন্তর থাকে না। যেখানে নৈরাজ্য বিরাজ করে, সেখানে আত্মরক্ষার নীতিই একমাত্র কার্যকর—রাষ্ট্রের শক্তি বাড়ানো সে কারণে বাস্তববাদীদের কাছে বেদবাক্যের মতো। তারা নৈতিক মূল্যবোধতাড়িত কোনো নীতিমালার প্রতি সংবেদনশীল নয়—অন্য রাষ্ট্রের প্রতি সংযমশীলতা, দয়া ও বৃহত্তর মানবতার কল্যাণের ধ্রুপদি বাণী সে কারণে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। ওই রাষ্ট্রস্বার্থকেন্দ্রিক মানসিকতা প্রতিফলিত হয় তাদের তাত্ত্বিক কাঠামোয়, যার মধ্যে তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—(ক) রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নীতিমালা প্রণয়ন (খ) নিজের স্বার্থের লক্ষ্যে সব ধরনের পদক্ষেপকে নৈতিক হিসেবে দেখা এবং (গ) স্বনির্ভরতা। এ তিনটি প্রতিপাদ্য প্রাচীন গ্রিক বাস্তববাদী তাত্ত্বিক থুসিডাইডেস পেলপনেসিয়ান যুদ্ধবিশ্লেষণে প্রয়োগ করেছিলেন। আজও আধুনিক বাস্তববাদী তাত্ত্বিকেরা, যাঁদের পুরোধা হিসেবে আছেন কার, কেনেথ অয়ালজ ও মরগেন্থুরের মতো পণ্ডিতজন, বিশ্লেষণের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে দেখেন থুসিডাইডেস, ম্যাকিয়াভেলি, টমাস, হবস ও রুশোর মতবাদকে। এঁরা সবাই নৈতিকতাকে অর্থহীন এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। এ যুক্তির ওপর ভর করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রজ্ঞাভিত্তিক (বেসড অন রিজন) বিশ্লেষণের এক প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, যার মূলে আছে আজকের যুগে অনুসৃত ক্ষমতার ভারসাম্যতত্ত্ব, নিরসনমূলক হামলা (প্রিয়েমটিভ অ্যাটাক), পারমাণবিক নিরোধকতা (নিউক্লিয়ার ডিটারেন্স) ইত্যাদি নীতিমালা।

মোইসির মতে, ওই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে একবিংশ শতাব্দী সংগতিপূর্ণ নয় এবং ভিন্ন হওয়ার কারণে পুরোনো ওই বিশ্লেষণকাঠামো এর জন্য অনুপযোগী। এ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতির পোস্টারটি দুটি দার্শনিক বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়। উভয়ই প্রত্যক্ষবাদী দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় মোইসির বিশ্লেষণে এরা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা, আমাদের স্মরণে আছে, ইতিহাসের সমাপ্তি (The end of history and the last man) ঘোষণা করেছিলেন এ দাবিতে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের কারণে উদারনীতিবাদ ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় সাধিত হয়েছে এবং সে কারণে মানবজাতি আদর্শিক বিকাশের শেষ বিন্দুতে উপনীত হয়েছে—ফুরিয়ে গেছে আর কোনো আদর্শিক কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। ফুকুইয়ামা লিখেছিলেন :

> What we may be witnessing is not just the end of the cold war, or the passing of a particular period of post war history, but the end of history as such; that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalisation of Western liberal democracy as the final form of human government. (15)

দার্শনিক হেগেলের বিশ্ব ইতিহাস ধারণায় প্রভাবিত এ বিশ্লেষণ যে অতিমাত্রিক উন্নাসিক, পশ্চিমাঘেঁষা ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অসারত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে, আজ যখন উদারনীতির ঘূর্ণিবলয়ে নিমজ্জিত বিশ্ব

অর্থনীতি এবং গণতন্ত্র এক কঠিন সংকটের মধ্যে নিপতিত। উদারনীতিনির্ভর দর্শনশাসিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও উত্তর আমেরিকা বহুলাংশে চীনের অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। দাবি করা অযৌক্তিক নয়, পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে চীনের পুঁজি দিয়ে। চীনের অগ্রগতি কোনো উদারনীতি-আশ্রিত প্রজেক্ট নয়, সেটি সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। ওই অলৌকিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে ভিন্ন ধরনের আধুনিকতা, যাকে এশীয় আধুনিকতা নামে আখ্যায়িত করা চলে। এ আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য বলতে পুঁজিবাদের সঙ্গে কর্তৃত্ববাদের মিশ্রণকে বোঝায়, অনেকে যাকে পুঁজিবাদ ও এশীয় মূল্যবোধের মিশ্রণ হিসেবেও দেখেন। যদি দাবি করা হয় যে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদকেন্দ্রিক আদর্শের বিস্ফোরণপীড়িত বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি শেষ হয়েছে, যেটি ফুকুইয়ামার অন্যতম বিবৃতি, তাহলে একবিংশ শতাব্দীকে ইতিহাসের সমাপ্তির পরিবর্তে অ্যাংলো-সাক্সন নব্য-উদারনীতিবাদের পরাজয় এবং চীন-সিঙ্গাপুরীয় পুঁজিবাদের বিজয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করাই শ্রেয়। বলা বাহুল্য, ফুকুইয়ামার অতি সরলীকৃত বিশ্লেষণে তিক্ত হয়ে মোইসি উপহার দিয়েছেন তাঁর বিকল্প বিশ্লেষণটি।

মোইসির মডেল ও তাঁর আক্রমণের অন্য টার্গেট হলো স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘর্ষ তত্ত্ব, যেটি ফুকুইয়ামার তত্ত্বের মতোই সরলীকৃত। হান্টিংটনের দাবি, ফরাসি বিপ্লবের পর সংঘাতের যে চরিত্র আন্তরাষ্ট্রীয় ছিল, সেটি রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আদর্শের সংঘাতে পরিণত হয়। এ দাবির সঙ্গে মোইসির দ্বন্দ্ব নেই। শীতলযুদ্ধের অবসানের পর কমিউনিজম, ফ্যাসিবাদ ও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক প্রতিটি সংঘাত ইউরোপের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী—এ যুক্তি মেনে নিলেও ওই সংঘর্ষ যে ইউরোপ বনাম অইউরোপীয় সংঘর্ষে রূপ লাভ করেছে, সেটি মেনে নিতে রাজি নন। রাজি নন ইউরোপীয় সভ্যতা, আরব অথবা চীনা সভ্যতার ভিন্নতাকে পুঁজি করে সংঘর্ষের চিত্র আঁকতে। হান্টিংটন লিখেছিলেন :

> Differences among civilisations are not only real; they are basic. Civilisations are differentiated from each other by history, language, culture, tradition and most important, religion. (p.25)

হান্টিংটন অবশ্য অস্বীকার করছেন না যে পৃথিবী আজ এক বিবর্তের ধারায় আক্রান্ত, যে বিবর্তনের চরিত্র মোইসির বিশ্লেষণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'A West at the peak of its power confronts non-West's that increasingly have the desire, the will and the resources to shape the world in non-Western ways' (p.26)। কিন্তু তাঁর দাবি হলো, বিভিন্ন সভ্যতা যেহেতু পাশাপাশি অবস্থান করে, তাদের মধ্যে সুগভীর খাদ বিদ্যমান। বিশেষ করে, মুসলিম সভ্যতা ও পশ্চিমা জুডায়ে-খ্রিষ্ট সভ্যতায় এবং সভ্যতার মধ্যে পরিবর্তন যেহেতু অতি ধীরে ঘটে, সেহেতু ওই খাদ সহজে অতিক্রান্ত হয় না। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে ইসলামি বিশ্বের সংঘর্ষ এক হাজার ৩০০ বছরের পুরোনো হতে পারে, কিন্তু ইসলামি বিশ্বকে একক ও অভিন্ন সত্তা ভাবা এর অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে, সে বিচিত্রতা সাংস্কৃতিক, দেশীয়, জাতিগত ও ভৌগোলিক হতে পারে, উপেক্ষা করা নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ওই বিচিত্রতার মধ্যে যে প্রগতিশীলতার উপাদান নেই, সে দাবিও অযৌক্তিক, অপ্রমাণিত।

সংগত কারণেই মোইসি এ দুই চিত্রের পরিবর্তে এঁকেছেন আবেগভিত্তিক বিশ্ব মানচিত্রের নিজ রূপরেখা, যেটি এখানে বিচার করা যায়। মোইসির মতে, তিনটি আবেগের সাহায্যে বিশ্বের রাজনৈতিক চিত্র আঁকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো হলো আশা, অবমাননা ও ভীতি, এরাই আজকের বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রক। এ তিনটি আবেগ কেবল আবেগ নয়, এরা একাধারে একেকটি প্রতীক, যার সহায়তায় বিশ্বরাজনীতিকে তিনটি আবেগপ্রভাবিত অঞ্চলে বিভক্ত করা সম্ভব। তাঁর মতে, প্রথম অঞ্চলটি হলো এশিয়া, যে মহাদেশ আজ 'আশা' আবেগে আপ্লুত। এখানে আশা বলতে মোইসি আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, গত দুই শতকে এশিয়ার ভূমিকায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ম্রিয়মাণ এশিয়া আজ স্বাধীন এক রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। এ আশাবাদ প্রকাশিত হচ্ছে সংস্কৃতির উদারতায়। আজ চীন ও ভারতে 'ধনী হও এবং শান্ত থাকো'—এ নীতি মূলধারায় পরিণত হয়েছে। চীন অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার উত্তরসূরি হবে। ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র। জাগ্রত ভারতের বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইতিহাস নেই এবং পশ্চিমা গবেষণায় ভারতকে দীর্ঘকাল ধরে বিচার করা হতো আধ্যাত্মিক জগৎ হিসেবে। আজ সেখানে অদক্ষতা, দুর্নীতি, সম্পদ বিতরণে মেরুকরণ ও বর্ণপ্রথা থাকতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এক নতুন গৌরববোধ তার অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আজ তার পরিচয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ দ্বারা চিহ্নিত। মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামি বিশ্ব দ্বিতীয় এক অঞ্চল, যেখানে এশিয়ার আশাভিত্তিক ভবিষ্যতের তুলনায় 'অবমাননা'র আবেগ প্রাধান্য পায়। অবমাননার অর্থ হলো অক্ষমতা। এ অক্ষমতা তার গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বেমানান। এ অঞ্চল মানবসম্পদের দিক থেকে ঊর্ধ্বমুখী, অথচ রাজনৈতিকভাবে নিম্নগামী। ইসরায়েলি রাষ্ট্র গঠন এবং ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ এ অবমাননার অংশ, যদিও এর কারণ ইসলাম নয়, বরং একনায়কতন্ত্র ও মৌলবাদ। অন্যদিকে, পশ্চিমা বিশ্বে বিরাজ করছে 'ভীতি'র আবেগ। এককালের বিশ্ব চালিকাশক্তির ভূমিকা থেকে অপসারিত হয়ে এ অঞ্চল বিশ্বায়নের যুগে কি রাজনীতিতে, কি অর্থনীতিতে পরাভূতপ্রায়।

আবেগের সহায়তায় ইতিহাসের এ গতিপথ বিশ্লেষণ যদি আমরা গ্রহণও করি, এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়, এটি কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত। কেন বিজ্ঞানসম্মত, সে প্রশ্নের উত্তর ও যুক্তি যথেষ্ট ক্ষুরধার। প্রথমত, তিনি প্রমাণ করতে চান যেকোনো বাস্তবতা—সে প্রকৃতিজগৎ হোক অথবা রাষ্ট্র-রাজনীতিসংশ্লিষ্ট হোক—কখনোই মনঃকল্পনাবর্জিত নয়। এখানে পাঠক দেখবেন ফরাসি মননের দার্শনিক ভিন্নতাকে, যেটি জ্ঞানতত্ত্বের আপেক্ষিকতা দ্বারা প্রভাবিত। মোইসির দাবি, প্রকৃতিজগতের বিভিন্ন উপাদান, যেমন—জনসংখ্যা, সম্পদ ও জ্বালানির উৎসকে বিকৃতভাবে রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তে উপস্থাপন করা সম্ভব। একইভাবে যেকোনো দেশের মানচিত্রকেও অখণ্ড এবং স্থায়ী ভাবা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, আরব বিশ্বের কাছে ইসরায়েলের মানচিত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই। একইভাবে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলি মানচিত্রে জুডায়া ও সামারিয়া হিসেবে উল্লিখিত করা হয়। তুর্কিদের জন্য সাইপ্রাসের মানচিত্র ভিন্ন, গ্রিসের জন্য যেটি উপযোগী নয়। সৌদি আরবের জন্য আরব উপসাগর আরবীয়, অথচ ইরানের জন্য সেটি পার্সিয়ান। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক আঁতাত প্রতিনিয়ত ওই মানচিত্রকে বদলে দিচ্ছে। ভাঙন ও গঠনের মাধ্যমে জন্ম হচ্ছে নতুন রাষ্ট্র এবং জাতির। পোল্যান্ডের কথা ভাবা যায়, দেশটি প্রায় ১০০ বছর ধরে স্বাধীন দেশ হিসেবে হারিয়ে গিয়েছিল বিশ্বমানচিত্র থেকে (১৭৯৫-১৯১৮)। প্রতিবেশীরা পোল্যান্ডকে নানা ভাগে বিভক্ত করে শাসন করেছে ওই ১০০ বছর। লেবাননে ধর্মীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রকৃত সংখ্যা কখনো সত্যকে প্রতিফলিত করেনি রাজনৈতিক কারণে। ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে এ মানচিত্রের যৎসামান্য পরিবর্তন হয়েছে। আজ এর পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত, বিশেষ করে, মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে। ফলে যে ভূখণ্ডকে মানচিত্র প্রকাশ করে, তা তো অভিন্ন, অপরিবর্তনীয় কোনো ক্যাটাগরি নয়, বরং সেটি মানুষের গোত্র আবেগ ও ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে—এর আদলেই সেটি প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় কারণ হলো, দীর্ঘকাল ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে ভাবার অধিকার ছিল কেবল মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞের, যাঁরা সমাজের এলিট। এঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে দাবা খেলা হিসেবে দেখেছেন, যেখানে সরকার ও রাষ্ট্র সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত। তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে জটিল, বিস্তীর্ণ ও বহুমুখী প্রবণতায় ভরপুর একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখেন এবং সে কারণে এর অনুধাবন বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে দাবি করেন। রাষ্ট্র যেসব স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের সহায়তায় তার নীতিনির্ধারণ করে—যেমন: জনসংখ্যা, রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সীমানা, অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ, সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থ—এর প্রতিটি প্রত্যয়কে বস্তুনিষ্ঠ, আবেগবর্জিত হিসেবে দেখা হয়। ফলে তাঁদের বিশ্লেষণে আবেগের স্থান অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। আবেগকে নিতান্তই নরম, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিশ্লেষণের অনুপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সূত্রনির্ভর, প্রত্যক্ষবাদী ও ইন্দ্রিয়প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী মনন দ্বারা। এভাবে একাধারে আবেগকে সংযত রাখাও সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। মোইসির এ যুক্তিকে অবহেলা করা কঠিন। ধর্ম যদি অনুভূতি ও বিশ্বাসের আধার হয়ে থাকে, তাহলে এর ভিত্তিতে ইউরোপ তো যুদ্ধ করেছে ৩০ বছর ধরে। ধর্মীয় ক্রুসেডের কথা না হয় বাদই দেওয়া হলো। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্ট ফালেন চুক্তিই কেবল সেই ধর্মীয় আবেগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও এর পুনঃ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

তবে মোইসির সঙ্গে একমত হয়েও দুটি প্রশ্ন করা এখানে সংগত। প্রথমত, যে তিনটি আবেগ ব্যবহার করে মোইসি তাঁর বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন, এর বাইরেও অন্যান্য আবেগের অস্তিত্ব আছে, যেমন—ক্রোধ, ভালোবাসা ও সংহতি। এগুলো মোইসির বিশ্লেষণে অনুপস্থিত? দ্বিতীয়ত, আবেগ কি পরিমাপযোগ্য? যদি না হয়, তাহলে একে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনার যৌক্তিকতা কোথায়? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মোইসির যুক্তি হলো, নির্বাচিত তিনটি আবেগের প্রতিটি একটি অভিন্ন আবেগের সঙ্গে যুক্ত, অন্য কোনো আবেগকে এ ছকে স্থাপন সম্ভব নয়। উল্লিখিত তিনটি আবেগকে একক

বন্ধনে আবদ্ধ করে আত্মপ্রত্যয় তাদের একই বলয়ে অন্তরীণ রাখে। ভীতিকে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হিসেবে বিবেচনা করা শ্রেয়; আশা আত্মপ্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে; অবমাননা বলতে ক্ষতবিক্ষত আত্মপ্রত্যয়কে বোঝায়, যেখানে আশাহীনতার আধিপত্য নিশ্চিত।

মোইসি উল্লেখ করেছেন :

> The reason I have chosen these three emotions is that they are closely linked with the notion of confidence, which is the defining factor in how nations and people address the challenges they face as well as how they relate to one another (p. 5).

মোইসি আবেগকে শুধু আত্মকেন্দ্রিক হিসেবে ভাবতে রাজি নন। তাঁর মতে, এরা পরিমাপযোগ্য। যেকোনো দেশ কতটুকু আত্মপ্রত্যয়ী, সেটি বিচার করা যায় নির্দিষ্ট সময়কালে এর খরচের প্যাটার্ন দেখে—কী পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ ঘটছে, এর ওপর। জাতীয় আত্মপ্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কোনো দেশের স্থাপত্যশিল্পে, সংগীতে অথবা শিল্পকলায়। ইউরোপের রেনেসাঁকালে শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে উঠতি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রত্যয়। আজ ওই ধরনের আত্মপ্রত্যয়ের নিদর্শন মেলে চীনা জাতির কর্মকাণ্ডে। বিদেশি সভ্যতার ভীতি কাটিয়ে চীন তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গর্বের সঙ্গে বিশ্বজনতার সামনে তুলে ধরতে আজ কুণ্ঠিত নয়। চীনের জনপ্রিয় ধ্রুপদি রচনা আজ সে কারণে স্বাচ্ছন্দ্যে ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে। চীনের দেয়াল ভেঙে আজ বেরিয়ে আসছে নতুন আত্মপ্রত্যয়ী এক সমাজ। আজ চীনের রক্ষণাত্মক হওয়ার কোনো কারণ নেই। আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ আত্মপ্রত্যয় পরিমাপ করা সনাতনী প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেটি অপরিমাপযোগ্য।

সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মোইসির বিশ্লেষণ ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে আবেগের পুরোপুরি সামঞ্জস্য দেখাতে সমর্থ হয়নি। সংযুক্ত আরব আমিরাত মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত বটে; কিন্তু দেশটিকে অবমাননার কলঙ্ক দিয়ে অঙ্কন করা যায় না। সেখানে এশিয়ার মতো আশার আলো আছে। ফলে আশার দিক থেকে সেটি এশিয়ায়, যদিও ভৌগোলিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে। এ ছাড়া এশিয়ার সব দেশ যে এ আশাবাদের মধ্যে নিহিত, সেটি দাবি করা যুক্তিযুক্ত নয়। মোইসির আলোচনায় মধ্য এশিয়া, কোরিয়া অথবা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা আশাবাদী বলয়ের বাইরে, যদিও ভৌগোলিকভাবে তারা এশিয়ায়। জাপান ইউরোপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবু সে তার আগের ভূমিকা নিয়ে উদ্বিগ্ন। জাপান আজ নির্জীব। এশিয়া হওয়ার জন্য জাপান অতিমাত্রায় ইউরোপীয়, ইউরোপীয় হওয়ার ক্ষেত্রে জাপান অতিমাত্রায় এশীয়। তার পরও ইউরোপীয় ভীতি তার ভেতরে ঢুকেছে। জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বয়স্ক, অর্থনীতি অনগ্রসর। জাপানের পাশাপাশি আরও বেশকিছু জটিল দেশ আছে, যেখানে মোইসির কাঠামো কার্যকর নয়, যেমন রাশিয়া। ইরানের ক্ষেত্রেও মোইসির যুক্তি প্রযোজ্য নয়। ইরান এগিয়ে চলেছে অবমাননাকে পাশ কাটিয়ে। অন্যদিকে, ইসরায়েলকে অবমানিতের ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা চলে, যদি ধরা হয় ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার অবিচার ও

দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে। দক্ষিণ আমেরিকা মোইসির আলোচনায় সেভাবে উল্লিখিত নয়, যদিও ব্রাজিলের উন্নতি আকাশচুম্বী।

যা-ই হোক, সন্দেহ নেই মোইসির আলোচনা এক নতুন জগৎকে উন্মোচিত করে। প্রথাগত বিশ্লেষণের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের মনন এ ব্যুৎপত্তি জগতের সঙ্গে একমত না-ও হতে পারে। কিন্তু কে জানে, হয়তোবা মোইসির এ দৃষ্টিকোণ আগামী দিনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গৃহীত হবে। ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে প্রায় সব মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান তাদের প্যারাডাইমের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শীতলযুদ্ধের অবসান এবং বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উষালগ্নে রাজনৈতিক বিজ্ঞানে সম্ভবত সেটিই ঘটতে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Fukuyama, F. 'The End of History?', *Quadrant* (August 1989), pp.15-25
2. Huntington, S.P., 'The Clash of Civilisations?', *Foreign Affairs*, Vol. 72, No. 3, (1993), pp. 22-49.
3. Dominique Moisi (2009) *The Geopolitics of Emotions : How cultures of Fear, Humiliation and Hope are Reshaping the World*, London: The Bodley Head, pp. 174

লেখক পরিচিতি

আজিজুর রহমান খান

অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার প্রফেসর অব ইকোনমিকস ইমেরিটাস। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা—*ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড পোভার্টি ইন চায়না ইন দি এজ অব গ্লোবালাইজেশন* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১); *স্ট্র্যাটেজি অব ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (ম্যাকমিলান, ১৯৯০); *কালেকটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া* (ম্যাকমিলান, ১৯৭৯); *দি ইকোনমি অব বাংলাদেশ* (ম্যাকমিলান, ১৯৭২)। এ ছাড়া বিভিন্ন জার্নাল ও সম্পাদিত গ্রন্থে তাঁর ৮০টির বেশি রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক। ক্লেফিন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিঙ্কন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা—*রিলিজিওন অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া* (রুটলেজ, ২০১০); *ফেইথফুল এডুকেশন: মাদ্রাসা ইন সাউথ এশিয়া* (রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮); *ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ: আ কমপ্লেক্স ওয়েব* (রুটলেজ, ২০০৮)।

নজরুল ইসলাম

অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক। সাবেক অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এমরি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*আগামী দিনের বাংলাদেশ* (প্রথমা, ২০১২); *বাংলাদেশের গ্রাম* (প্রথমা, ২০১০); [সম্পা] *রিসারজেন্ট চায়না: ইস্যুজ ফর দ্য ফিউচার* (প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০৯); *জাসদের রাজনীতি: একটি নিকট বিশ্লেষণ* (১৯৮১)।

ইয়ান মার্টিন

মানবাধিকারকর্মী ও বাংলাদেশের সুহৃদ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব। জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ দূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কর্মী হিসেবে কিছুকাল বাংলাদেশে ছিলেন। এরপর নানা উপলক্ষে বাংলাদেশে বারবার ফিরে এসেছেন।

হাসান ফেরদৌস

লেখক ও প্রাবন্ধিক। জাতিসংঘের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনস ডিভিশনের কমিটি লিয়াজোঁ ইউনিটের প্রধান। সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিচিত্র বিষয়ে লিখেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা—*রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি ও দুই হ্যারিয়েট* (প্রথমা, ২০১১); *১৯৭১: বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া* (প্রথমা, ২০০৯); *'গুলিস্তাঁ' থেকে 'মিরজাফরের নাতি'* (সময় প্রকাশন, ২০০৮)।

বদরুল আলম খান

সমাজবিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনির অধ্যাপক। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা—*পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (নভেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪); *সমাজবিজ্ঞান: সংকট ও সম্ভাবনার দেড় শ বছর* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩); *দর্শনের সংকট* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০)।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক-কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮